৩য় বর্ষ।] বৈশাখ ১৩২২ ১ম সংখ্যা।

নিখিল ভারতবর্ষীয় "আয়ুর্ব্বেদ-মহামণ্ডলের" বঙ্গপ্রান্তীয় মুখপত্র।



AYURVED-BIKASH.

Editor Vaidyaraj Pandit Sudhanshu Bhushan Sen Kabyatirtha.
Aryya Vaishajya Niketan, Dacca.

বৈদ্যরাজ পণ্ডিত শ্রীসুধাংশুভূষণ সেন কাব্যতীর্থ, বাচস্পতি
সম্পাদিত।

প্রকাশক—শ্রীকামিনীকুমার সেন, এম, এ, বি, এল।
"আর্য্য ভৈষজ্য নিকেতন" ঢাকা।

বিষয় সূচী।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲] আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ কার্য্যালয়, ঢাকা, [প্রতিসংখ্যা ।০ আনা।

"প্রাণো বা অমৃতম্ ।" (শ্রুতিঃ)

আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ।

(স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন ও চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র)

"আয়ুঃকামযমানেন ধর্ম্মার্থ সুখসাধনম্ ।
আয়ুর্ব্বেদোপদেশেষু বিধেয়ঃ পরমাদরঃ ॥ বাগ্‌ভট।

৩য় বর্ষ | বৈশাখ ১৩২২ | ১ম সংখ্যা।

নিখিল ভারতবর্ষীয় ষষ্ঠবৈদ্যসম্মেলনাভ্যাগতানাম্

আবাহনম্ ।

জ্ঞানপ্রভাক্ষপিত হৃন্নিখিলান্ধকারাঃ !
বিজ্ঞানসূক্ষ্মবিষয়াকলন প্রসক্তাঃ !
কিং স্বাগতং ? বিধিচিকিৎসিতসম্প্রচার
প্রাণার্পণপ্রণয়িনঃ সুধিয় ! সমেত ॥

যেষাং যশোনবসুধা পরিতর্পিতায়ৈ
শ্রুত্যৈ দৃশাবভজতাং নিতরামসূয়াম্ ।
সন্দর্শনং বিধিবশাৎ সমবাপ্য তেষাং
তে মে দৃশৌ জননসার্থকতামুপাতে ॥

যুষ্মৎসমাগম সুখৈর্ম্মুদিতান্তরস্য
নো মে পরিস্ফুরতি বাগ্‌জড়তাং গতৈষা।
কালোদিতান্ নিবিড়নীলরুচীন্ বিলোক্য
গম্ভীরনাদজলদানিব কর্ষকস্য ॥

আয়ুঃশ্রুতে প্রচলনায় ভুবো হিতার্থং
বঙ্গে শুভেঽদ্য মিলিতান্ ভবতো বিলোক্য।
তান্ জীবদুঃখ পরিপীড়িতচেতসোঽহম্
প্রস্থং গতান্ হিমবতো যমিনঃ স্মরামি ॥

আয়ুঃশ্রুতে সকল ভাগত উদ্দিবীর্ষা
হে সুশ্রুতাঃ! শ্রুতি বিদো ভবতাং হি যুক্তা।
মার্ত্তণ্ডবর্ম পরিপীড়িতবিশ্বমুৎকঃ
সংরক্ষিতুং ন কিময়ে! স্বতএব বায়ুঃ ? ॥

যুষ্মৎ সমাগমনতো মুদিতোঽহমেষ
সম্ভাবিনীং সফলতামবলোক্য যাচে।
বেদোদ্ধৃতিপ্রতিগৃহীতবরাহযোনিং
বদ্ধাঞ্জলির্নতশিরা পরমেশমেতৎ ॥

শ্রীলায়ুর্ব্বেদ এষ শিশিরকরসমো জীবসৌখ্যপ্রদাতা
দাতাস্মস্য প্রকামং ত্রিভুবন পবিতা মঙ্গলঃ স্বপ্রকাশঃ।
অত্যর্থং ম্লান কান্তির্ব্ব্যপগত মহিমো বিপ্লবৈস্তামসৈস্তৈঃ
ভূয়োভূয়াদিদানীমমলতনুরুচিঃ স্বীয়হৈমাসনস্থঃ ॥

শ্রীশ্যামাদাস কবিরাজস্য।

—:—

আয়ুর্ব্বেদীয় শল্যতন্ত্র ও পাশ্চাত্য সার্জ্জারি।*

প্রস্তাবনা।

পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে যাহাকে সার্জ্জারি (Surgery) বলে আয়ুর্ব্বেদে তাহার নাম "শল্যতন্ত্র"। বোধহয় অতি প্রাচীনকালে যুদ্ধে আহত সৈন্য গণের শরীর হইতে বাণ, বর্শার ফলক প্রভৃতি "শল্য" নিষ্কাসন করিবার নিমিত্ত এই শাস্ত্র সর্ব্বপ্রথমে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, এই জন্য এই শাস্ত্রের নাম শল্য তন্ত্র হইয়াছে।

বর্ত্তমান কালে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা বলিলে, কেবল কবিরাজী ঔষধ দ্বারা যে চিকিৎসা করা হয়, সাধারণে তাহাই বুঝিয়া থাকেন। "শল্য তন্ত্র" বা যন্ত্র শস্ত্র দ্বারা চিকিৎসা করাও যে আয়ুর্ব্বেদের একটী প্রধান অঙ্গ, অর্দ্ধাঙ্গ বলিলেও চলে তাহা শিক্ষিত সাধারণের ধারণাতেই আসে না। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক গণের চর্চ্চার ও শিক্ষার অভাবেই অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে। "সার্জ্জারি" যে আদৌ আমাদের শাস্ত্র, বুঝাইয়া বলিলেও লোকে তাহা বিশ্বাস করিতে চাহে না।

সুশ্রুত বলিয়াছেন——"দ্বিবিধা ব্যাধয়ঃ, শস্ত্রসাধ্যা ভেষজসাধ্যাশ্চ অর্থাৎ রোগ দুই প্রকার শস্ত্রসাধ্য ও ঔষধসাধ্য। রোগ সমূহের এইরূপ দুই প্রধান বিভাগ করিয়া চিকিৎসা উপদিষ্ট হইয়াছে। এই দুই প্রধান বিভাগ অনুসারে সে কালে চিকিৎসারও দুইটী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। এক সম্প্রদায় চিকিৎসকের নাম শল্যতান্ত্রিক বা ধন্বন্তরি সম্প্রদায়; অপর সম্প্রদায়ের নাম কায়চিকিৎসা বা আত্রেয় সম্প্রদায়। শল্যতন্ত্রের আদি প্রবর্ত্তক ধন্বন্তরির নামানুসারে "ধন্বন্তরি সম্প্রদায়" এই নামের সৃষ্টি হইয়াছে——বর্ত্তমান সময়ে Surgeon বলিলে যাহা বুঝায় আয়ুর্ব্বেদে শল্যতান্ত্রিক বা ধান্বন্তরীয়বৈদ্য বলিলে তাহাই বুঝাইয়া থাকে। কায়চিকিৎসাতন্ত্রের আদি প্রবর্ত্তক মহর্ষি আত্রেয়, এই জন্য কায়চিকিৎসক-গণের নাম "আত্রেয়সম্প্রদায়"; বর্ত্তমান সময়ে Physician বলিলে যাহা বুঝায়, আয়ুর্ব্বেদে "কায়চিকিৎসক" শব্দের তাহাই অর্থ। এই ধন্বন্তরি

* নিখিলভারতবর্ষীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ বৈদ্যসম্মেলনে পঠিত সপ্রয়োগ ব্যাখ্যানের সারাংশ।

সম্প্রদায়ের আর এক নাম ধন্বন্তরিশিষ্য সুশ্রুতের নামানুসারে "সুশ্রুত-সম্প্রদায়" এবং আত্রেয় সম্প্রদায়ের আর এক নাম আত্রের শিষ্য অগ্নিবেশের নামানুসারে "অগ্নিবেশ সম্প্রদায়"।

প্রসূতিতন্ত্র (বা Midwifery) ও শল্যতন্ত্রের অন্তর্গত। গর্ভরূপ শল্য মধ্য পথে রুদ্ধ হইলে উদর নিষ্কাশন করিবার জন্য যে চিকিৎসা আবশ্যক হয়, উহাও শল্যতান্ত্রিকগণের অধিকারভুক্ত। এই জন্যই সুশ্রুতসংহিতায় "মূঢ়গর্ভ চিকিৎসা" চিকিৎসাস্থানের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। "কৌমার-ভৃত্য" বলিলে আয়ুর্ব্বেদের যে অঙ্গ বুঝায় উহার বর্ণনীয় বিষয় শিশু চিকিৎসা ও শিশুর ধাত্রীর স্তন্যাদি শোধন। কোন কোন স্ত্রীরোগও এই অঙ্গের অধিকার ভুক্ত। অতএব শল্যতন্ত্র বলিলে কেবল Surgery বুঝায় এরূপ না বলিয়া Surgery ও Midwifery শস্ত্রচিকিৎসা ও প্রসূতিতন্ত্র উভয়ই বুঝায় এইরূপ বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রধান দুইটী বিভাগ শল্যতন্ত্র ও কায়চিকিৎসা হইলেও আয়ুর্ব্বেদের মধ্যাহ্ন বা সর্ব্বোচ্চ উন্নতির সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের বিশেষ উন্নতি হওয়ায় আরও কার্য্য বিভাগ হইয়াছিল। সে সময়ে এইরূপ কার্য্যবিভাগে আয়ুর্ব্বেদের আটটী অঙ্গ পরিপুষ্ট হইয়া আটপ্রকার চিকিৎসক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। এই সকল সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গের পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থরাশি বা তন্ত্রসমূহ রচনা করেন। সেই সকল তন্ত্র এখন বিলুপ্ত। কিন্তু তাহাদের পরিচয় এখনও বর্ত্তমান। সেকালের অষ্টাঙ্গ সম্পূর্ণ আয়ুর্ব্বেদের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। শল্যতন্ত্র——এই সম্প্রদায়ে আচার্য্যগণের মধ্যে ঔপধেনব, ঔরভ্র সুশ্রুত, পুষ্কলাবত, বৈতরণ ও গোপুররক্ষিতাচার্য্যের নাম সুপ্রসিদ্ধ।

ইহাঁদের অতিরিক্ত ভোজ, করবীর্য্য, ভালুকি প্রভৃতি আচার্য্যগণের নাম শল্যতন্ত্র প্রকরণে দেখা যায়। এই সকল আচার্য্য প্রণীত বড় বড় শল্যতন্ত্রের সংহিতাগ্রন্থগুলি আমাদের দুর্ভাগ্য বশে এখন পাওয়া যায় না। কিন্তু ৫।৭ শত বৎসর পূর্ব্বেও ইহাদের মধ্যে অনেক গুলি বর্ত্তমান ছিল, তাহার রাশি রাশি প্রমাণ আছে। সে সকল প্রমাণ মৎপ্রণীত সংস্কৃত শারীর-শাস্ত্র "প্রত্যক্ষশারীর" গ্রন্থের ভূমিকায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সুশ্রুত সংহিতা প্রাচীন "সৌশ্রুত তন্ত্র" বা "বৃদ্ধ সুশ্রুত" গ্রন্থের নাগার্জ্জুন বা অন্য কোন ব্যক্তি কৃত সংক্ষিপ্তসার। ইহা যে আদি সংহিতা নহে তাহার প্রমাণ এই গ্রন্থেই অনেক বর্ত্তমান। সে সকল প্রমাণও পূর্ব্বোক্ত ভূমিকায় দেখাইয়াছি। এই স্থলে দুই একটী মাত্র আবশ্যক বোধে দেখাইতেছি। বর্ত্তমান সুশ্রুতের উত্তরতন্ত্রের প্রারম্ভে নিম্নলিখিত শ্লোক গুলি দেখা যায়——

"শালাক্য শাস্ত্রাভিহিতা বিদেহাধিপ কীর্ত্তিতাঃ।
যে চ বিস্তরতো দৃষ্টাঃ কুমারাবাধহেতবঃ॥
ষট্‌সু কায় চিকিৎসাসু যে চোক্তাঃ পরমর্ষিভিঃ।"

—ইত্যাদি—এই শ্লোক গুলির মর্ম্মার্থ এই যে বিদেহকৃত শালাক্যতন্ত্র এবং অগ্নিবেশাদি ছয়জন ঋষির কায়চিকিৎসাতন্ত্র প্রভৃতি হইতে এই উত্তরতন্ত্র সংগৃহীত হইয়াছে। সূত্র স্থানের চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে আর একটী শ্লোক আছে—

ঔপধেনবমৌরভ্রং সৌশ্রুতং পৌষ্কলাবতম্।
শেষাণাং শল্যতন্ত্রানাং মূলান্যেতানি নির্দ্দিশেৎ॥

অর্থাৎ এই গ্রন্থে শল্যতন্ত্রের যত খানি বর্ণনা করা হইল তাহার অতিরিক্ত অংশের মূলভূত গ্রন্থ ঔপধেনব সংহিতা ঔরভ্র সংহিতা, সৌশ্রুত সংহিতা ও পৌষ্কলাবত সংহিতা। এই শ্লোকটীর কেহ কেহ অন্যরূপেও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। এজন্য যাঁহাদের এবিষয়ে সন্দেহ হইবে, তাঁহাদিগকে আমার ভূমিকায় উদ্ধৃত বৃদ্ধসুশ্রুতের প্রমাণ গুলি দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। সে সকল প্রমাণ প্রাচীন টীকাকারেরা উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমান সুশ্রুত সংহিতায় সে গুলি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

"ভোজ সংহিতা"——শল্যতন্ত্রে আর একখানি অতি বৃহৎ প্রাচীন বিলুপ্ত গ্রন্থ। এই গ্রন্থের শত শত প্রমাণ চক্রপাণি, ডল্লন, বিজয়রক্ষিত শ্রীকণ্ঠদত্ত প্রভৃতি প্রাচীন টীকাকারগণ সুশ্রুত, চরক ও নিদানের টীকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। যে প্রমাণ গুলি একত্র সঙ্কলিত করিলে এখনও একখানি গ্রন্থ হইতে পারে।

২। শল্যতন্ত্র (Treatment of Disease of Eye Ear Nose And Throat) নাসিকা চক্ষুঃ কর্ণ মুখ ও কণ্ঠ সম্বন্ধীয় যাবতীয় রোগের চিকিৎসা

শালাক্যতন্ত্রের বর্ণনীয়। এই অঙ্গের যে সকল আর্ষতন্ত্রের নাম আমরা পাইয়াছি সে গুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি।

বিদেহতন্ত্র——শালাক্যতন্ত্রের অতি বিশালগ্রন্থ বর্ত্তমান সুশ্রুত সংহিতার সঙ্কলয়িতা এই গ্রন্থের নিকট ঋণী তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি।

কাঙ্কায়ণতন্ত্র, গার্গ্যতন্ত্র, গালবতন্ত্র, সাত্যকিতন্ত্র, শৌনকতন্ত্র, করালতন্ত্র চাক্ষুষ্যতন্ত্র, কৃষ্ণাত্রেয়তন্ত্র, নামে কয়েকখানি বৃহৎ সংহিতাগ্রন্থ ছিল সে গুলির আলোচনা মদীয় প্রত্যক্ষ শারীর গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

৩। কায় চিকিৎসা তন্ত্র—— (Practice of Medicine) এই আয়ুর্ব্বেদাঙ্গে প্রধান আর্ষ গ্রন্থ——

অগ্নিবেশ সংহিতা——বর্ত্তমান চরক সংহিতার বিলুপ্ত মূলগ্রন্থ। বর্ত্তমান চরক অগ্নিবেশ তন্ত্রের চরক কৃত জীর্ণোদ্ধার ; তন্মধ্যে শেষের ৪১ অধ্যায় দৃঢ়বল আর একজন কাশ্মীরী পণ্ডিতের রচনা।

ভেল সংহিতা——ইহা অগ্নিবেশ সতীর্থ ভেলমুনি প্রণীত তন্ত্র। এই গ্রন্থ বিলুপ্ত বলিয়াই বৈদ্যগণের ধারণা ছিল, কিন্তু সম্প্রতি তাঞ্জোর রাজকীয় লাইব্রেরীতে উহার একখণ্ড পাওয়া গিয়াছে।

হারীত সংহিতা——এই গ্রন্থও এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে। মুদ্রিত সংহিতা যে আদৌ প্রাচীন সংহিতা নহে। প্রত্যুত একখানি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ অর্ব্বাচীন সংহিতাগ্রন্থ তাহা বনৌষধিদর্পণকার সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ মহাশয় নিঃসন্দেহ ভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন——

জতুকর্ণ সংহিতা,——পরাশর সংহিতা, ক্ষারপাণিসংহিতা নামে অগ্নিবেশ সতীর্থ ঋষিত্রয়ের আরও তিন খানি সংহিতা ছিল। অপর মহর্ষিগণের সংহিতা গুলির মধ্যে খরনাদসংহিতা, বিশ্বামিত্র সংহিতা ও অত্রিসংহিতার আলোচনা আমি ভূমিকায় করিয়াছি। কপিলতন্ত্র ও গৌতমতন্ত্র নামে আরও দুইখানি আর্ষগ্রন্থ বোধহয় কায়চিকিৎসার অন্তর্গতছিল।

৪। ভূত বিদ্যা—— (Mental disease) মানস রোগের চিকিৎসা বিষয়ক। শুনাযায় এবিষয়ে অথর্ব্বা মহর্ষির প্রণীত বৃহৎ গ্রন্থ ছিল।

৫। কৌমার ভৃত্য——শিশু ও ধাত্রীর চিকিৎসা বিষয়ক আয়ুর্ব্বেদাঙ্গ।

এবিষয়ে জীবকতন্ত্র, পার্ব্বতকতন্ত্র ও বন্ধকতন্ত্র প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থছিল।

৬। অগদতন্ত্র বা বিষ চিকিৎসা। (Toxicolojy) ইহা যাবতীয় স্থাবর ও জঙ্গম বিষের চিকিৎসা বিষয়ক আয়ুর্ব্বেদাঙ্গ। গ্রীক ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে আলেকজন্দর ভারতাক্রমণ কালে সর্প বিষে মৃতপ্রায় রোগিগণের চিকিৎসার জন্য ভারতীয় অগদতান্ত্রিক বা বিষবৈদ্য গণের সাহায্য লইয়া তাহাদের আশ্চর্য্য নৈপুণ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। সে আজ ২২৪০ বৎসরের কথা।

অগদতন্ত্রের প্রাচীন গ্রন্থ সমূহের মধ্যে এক্ষণে——————

কাশ্যপ সংহিতা—— অলম্বায়নসংহিতা প্রভৃতি ২।৩ খানি সংহিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

৭। ৮। রসায়ন ও বাজীকরণতন্ত্র। এই দুইটি আয়ুর্ব্বেদাঙ্গ কেবল ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের নিজস্ব বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রসায়নাঙ্গের ভারতে এতদূর উন্নতি হইয়াছিল যে ক্রমে বনৌষধি সমূহের ও পারদাদি ধাতুর জরা ও রোগ সমূহের নিবারণ শক্তির অন্বেষণ করিতে করিতে আচার্য্য-গণ পারদাদি ধাতুর আশ্চর্য্য প্রভাব দেখিয়া "রসশাস্ত্র" নামে একটী বৃহৎ শাস্ত্রের সৃষ্টি করেন। "রস" শব্দের অর্থ পারদ। পারদের অদ্ভুত রোগ নাশকতা শক্তিতে বিস্মিত যোগিগণ শেষে "রসেশ্বর দর্শন" নামক এক দর্শন শাস্ত্রের সৃষ্টি করেন। ইহার পরিচয় মাধবাচার্য্য কৃত সর্ব্ব দর্শন সংগ্রহে পাওয়া যায়। রস শাস্ত্রের আচার্য্যগণেরও গ্রন্থ সমূহের নাম অসংখ্য। প্রাচীন গ্রন্থ সমূহের মধ্যে ব্যাড়িতন্ত্র, নাগার্জ্জুনতন্ত্র, মাণ্ডব্যতন্ত্র "পাতঞ্জলতন্ত্র" "আদিম-তন্ত্র" প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

"বাজীকরণতন্ত্র" সমূহের মধ্যে প্রাচীন গ্রন্থকারদের পরিচয় অতি অল্পই পাওয়া যায়। তবে ঔদ্দালকি, বাভ্রব্য ও বাৎস্যায়ন কৃত প্রাচীন তন্ত্রকারগণের নাম কচিৎ শুনা যায়। বাৎস্যায়ন কৃত "কামসূত্রে" ও এই সকল গ্রন্থকার-দের উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ ইহাঁরা কামসূত্র ও বাজীকরণ তন্ত্র উভয় প্রকার গ্রন্থই রচনা করিয়া ছিলেন। "কুচুমারতন্ত্র" একখানি প্রাচীন বাজীকর তন্ত্র, ইহার পরিচয় উক্ত বাৎস্যায়নীয় কামসূত্রে।

আয়ুর্ব্বেদের মধ্যাহ্ন গৌরবের এইরূপ সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া অতঃপর

আমরা আলোচ্য বিষয়ের অনুসরণ করিব। আয়ুর্ব্বেদের এই মধ্যাহ্ন সময়ের ও বর্ত্তমান সময়ের ডাক্তারী শাস্ত্রের উন্নত অবস্থা যে প্রায় একরূপ তাহা সহজেই বুঝা যায়। আয়ুর্ব্বেদের এই উন্নতির যুগ প্রায় ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল। ইহা আমি অন্যত্র নানাবিধ যুক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছি। বৌদ্ধ যুগকে আয়ুর্ব্বেদের অপরাহ্ন কাল বলা যাইতে পারে। সে সময়ে আয়ুর্ব্বেদের নূতন গবেষণা প্রভৃতি অতি অল্প হইলেও আয়ুর্ব্বেদের জ্যোতিঃ একবারে বিলীন প্রায় হয় নাই। জীবকাদি আচার্য্য এবং অনেক রস গ্রন্থকার এই বৌদ্ধযুগেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পরে মুসলমান রাজত্বের সময় আয়ুর্ব্বেদের বিশেষ ভাবে ধ্বংস হইতে আরম্ভ হয়। এই সময়ে শত শত রাজ্য বিপ্লবে আয়ুর্ব্বেদের অসংখ্য গ্রন্থরত্ন নষ্ট ও দগ্ধ হইয়াছিল। এখন, আয়ুর্ব্বেদের এই সন্ধ্যাকালে, যাহা বর্ত্তমান আছে তাহা প্রাচীন গৌরবের ক্ষীণ সাক্ষ্যমাত্র। কিন্তু মহর্ষিগণের প্রতিভার জ্যোতিঃ এককালে এতই প্রখর ছিল যে, তাহার হীনপ্রভ প্রতিবিম্ব অবলম্বন করিয়া ও এই দুর্দ্দিনে অনেক সময়েই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ সমুন্নত ডাক্তারী চিকিৎসার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ। আয়ুর্ব্বেদের বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা বুঝিয়া যদি আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ পুনরায় হস্তচ্যুত রত্নের অন্বেষণ ও ত্রুটি পূরণে যত্নবান্ হন, তাহা হইলে ভারতবাসীর যে কত উপকার হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই।

আয়ুর্ব্বেদের ও অন্যান্য ভারতীয় জ্ঞানের চরম উন্নতির সময়ে, যখন পৃথিবীর অন্য সমস্তদেশ অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল তখন ভারতের জ্ঞান বিজ্ঞানের উজ্জ্বল প্রভাতেই সমস্ত জগৎ আলোকিত হইয়াছিল। এবিষয়ে সমস্ত জগৎ ভারতের নিকট কতদূর ঋণী তাহা ঐতিহাসিকগণ বিশেষ ভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বঙ্গভাষায় এবিষয়ের বিস্তৃত চর্চ্চা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় তদীয় "পৃথিবীর ইতিহাসে" করিয়াছেন। উহা বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। ভারতবর্ষ হইতে মিসরদেশে গ্রীক, রোম, জর্ম্মনী প্রভৃতি দেশে ভারতীয় জ্ঞান কিরূপে প্রসারিত হইয়াছিল, তাহার সবিস্তর আলোচনা আমার অদ্যকার প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য নহে। তবে আয়ুর্ব্বেদোক্ত যন্ত্র শস্ত্রাদি ও শল্য তন্ত্রের উপদেশ গুলি দুই সহস্র বৎসর বিদেশে পর্য্যটনের পর আজ

কিরূপ নূতন আকারে পুনরায় স্বদেশে উপস্থিত হইয়া স্বদেশ বাসীকে বিস্মিত করিতেছে, যাহা পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রের নূতন আবিষ্কার বলিয়া এতদিন পর্য্যন্ত লোকে পাশ্চাত্য জগৎকে ধন্যবাদ দিতেছে তাহা যে আমাদের প্রাচীন আচার্য্যগণেরই আবিষ্কার, তাহাই প্রতিপন্ন করিবার পূর্ব্বে প্রাচীন গৌরবের কিঞ্চিন্মাত্র পরিচয় প্রদত্ত হইল। (ক্রমশঃ)

শ্রীগণনাথ সেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রবন্ধ।

৪। নবাবিষ্কৃত দেশীয় ভেষজ ও তাহার প্রয়োগ—ইহাও একটি অতি প্রয়োজনীয় কথা। আয়ুর্ব্বেদোক্ত ভিন্নও ভূরি ২ ভেষজ সর্ব্বদা বিবিধ রোগে ব্যবহৃত ও ফলোপধায়ক হইয়া আসিতেছে। ইহাদের দোষগুণ পর্য্যালোচনা করিয়া ইহাদের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অন্তর্গত করিয়া লওয়া যায় কিনা সে চেষ্টাও আমাদের অতি কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। রীতিটি যে কেবল অধুনাতন এমন নহে। বহু প্রাচীন কাল হইতেই এই নিয়মে আয়ুর্ব্বেদের অঙ্গে ভূরি ২ ঔষধ সমাবিষ্ট হইয়াছে। প্রচলিত আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিলে তাহা স্পষ্টই অনুমিত হয়। এমন কতকগুলি ঔষধ আছে যাহার আয়ুর্ব্বেদে গুণ দোষাদি উল্লিখিত রহিয়াছে অথচ কতকাল যে শাস্ত্রীয় চিকিৎসকগণ তাহার ব্যবহার ছাড়িয়াছেন তাহার প্রমাণ নাই। যেমন বৃশ্চিকালী নামক ভেষজ, ইহার বাঙ্গালা নাম বিছুটি ইহা নিতান্ত উপেক্ষিত গুল্ম ইহার পত্র শাখাদি শরীরে স্পর্শমাত্র কণ্ডু ও দাহ উপস্থিত হয়, এমন জিনিষও কি আবার উপকারী ভেষজ হয়? আমার মনে হয় ছেলে বেলায় একদিন এক পাড়াগেঁয়ে ফকির শ্রেণীর একজন মুসলমান চিকিৎসককে এই গাছ যত্নের সহিত সংগ্রহ করিতে দেখিয়া কৌতূহল পরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করি-লাম, এই বিছুটি গাছ দিয়া কা'র সর্ব্বনাশ করিবে? ফকির তখন হাসিয়া উত্তর করিল "বাবু জানেন না এ বড় মস্ত দাওয়াই ইহা দ্বারা কাসের ব্যারামের পাচন দিব তাই সংগ্রহ করিতেছি" ঔষধের অন্য উপাদান গুলি ও সে আমাকে

বলিয়া দিয়াছিল। সমুদয় পদ স্মরণ নাই তন্মধ্যে গোলমরিচ একটি পদ আছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্রতী হইয়া দেখিলাম সত্য সত্যই বিছুটী কাসরোগ প্রতি-ষেধক। স্বপ্নপ্রাপ্ত, সন্ন্যাসী প্রদত্ত দৈবলব্ধ যত ঔষধ আমরা দেখিতে পাই এবং তাহাদের মধ্যে যে সকল বস্তুতই কার্য্যকরী এমন অনেক ঔষধই যে আয়ুর্ব্বেদ সম্মত, তাহাও নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। এজন্য আমরা এ কথা ও বলিতে চাইনা যে আয়ুর্ব্বেদ ছাড়া ঔষধ হইতে পারে না। তবে কথা এই, ঔষধ সংগ্রহের সঙ্গে ২ বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে, কোন্‌টি আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বা বহির্ভূত। একদিকে আয়ুর্ব্বেদোক্ত অথচ অব্যবহৃত অজ্ঞাত ভেষজ সমূহের যেমন উদ্ধার করিতে হইবে তেমনি অভিনব ভেষজা-বলীর তত্ত্বানুসন্ধানে বিশেষভাবে ব্রতী হইতে হইবে। নূতন ঔষধ সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ভেষজটি কোন্ জাতীয়, কোন্ দেশে সুলভ জাত এবং কোন্ ঋতুজ, ইহার স্থায়িত্ব ও অবয়বাদি সবিস্তর সংগ্রহ করিতে হইবে। তৎপর ইহার কোন্ ২ অংশ উপযোগী হইবে ইত্যাদি পরী-ক্ষা ও আলোচনার জন্য উপযুক্ত অবসর লইতে হইবে। নূতন ঔষধ গুলির কোন্ দেশে কি নাম, কোন্ রোগে কি ভাবে ব্যবহার হয় ইহাদেরও অনু-সন্ধান আবশ্যক হইবে। এমন অনেক দেশীয় গাছ গাছড়ার নাম করা যায় যাহাদের ভিন্ন ২ স্থানে ভিন্ন ২ প্রয়োগরূপ বিদ্যমান। আমাদের এদিকে এক প্রকার জঙ্গলা গাছ আছে, যাহার ঠিক নাম আমি অবগত নহি, সে গাছের ডাল নির্দ্দিষ্ট দিনে উত্তোলন ও অভিমন্ত্রিত করিয়া ধারণ করিলে কোমর বেদনা দূর হয়। আমি নানা স্থানে বন্ধুবান্ধবগণের নিকট বিবিধ দুষ্প্রাপ্য ভেষজের বর্ণনা দিয়া রাখিয়াছি। একসময় একজন আমাকে সংবাদ দিলেন যে, আমার বাগানের একটি জঙ্গলা বৃক্ষ বাসার পশ্চিম দেশীয় একটি চাকরকে কাটিয়া ফেলিবার আদেশ করিলে সে বলিল বাবু এমন ভাল দাওয়াইর গাছ কাটিয়া ফেলিবেন, এগাছ বড় দেখা যায় না। ইহা মেদা গাছ, ইহার ছাল বাটিয়া প্রলেপ দিলে ভয়ানক বেদনাও সহজে সারিয়া যায় ইত্যাদি, বন্ধুবর 'মেদা' গাছের নাম শুনিয়াই মৎপ্রদত্ত মেদার লক্ষণ মিলাইতে যাইয়া দেখেন যে এ সে গাছ নহে। কিন্তু তিনি উহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন না করিয়াই ঐ গাছের কতক ত্বক, পত্র ও শাখা পার্শ্বেল করিয়া আমার নিকট পাঠাইয়া

দিলেন। আমি দেখিলাম, আমার সেই পূর্ব্ব পরিচিত গাছ বই আর কিছু নহে। এরূপ অনুসন্ধান পাইলে পরীক্ষার পক্ষে যে বিশেষ সুবিধা হয় তাহা বলাই বাহুল্য। অনুসন্ধান করিলে যে কত ঔষধি আবিষ্কার হইতে পারে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই সকল নূতন ২ ঔষধ সংগ্রহ করিতে হইলে প্রথমতঃ বনেচর ও গ্রাম্য নিম্ন শ্রেণীর লোকেরই শরণাপন্ন হইতে হইবে। ঔষধি পরিজ্ঞানের ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা। অনেকে লজ্জা ও আলস্য বশতঃ এই কর্ম্মটি হইতে সর্ব্বদাই দূরে ২ থাকেন কাযেই ঔষধি জ্ঞান লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। অনেক শাস্ত্রজ্ঞ চিকিৎসকই যে এখন আর ঔষধ পরিচয় অবগত নহেন তাহা অনেকেই বিদিত আছেন। নিম্ন শ্রেণীর লোক হইতে যে ঔষধ চিনিয়া লইতে হইবে, তাহাও বহু প্রাচীন কালের পদ্ধতি। শাস্ত্রকার স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেনঃ——

"গোপাল তাপস ব্যাধ মালাকার বনেচরান্।
পৃষ্ট্বা নামানি জানীয়াৎ————ইত্যাদি॥

ইতরজীব পশু পক্ষীর মধ্যে পর্য্যন্ত ঔষধ পরিজ্ঞান ও ব্যবহার দেখা যায় তাহাও অনেকে বিদিত আছেন। বিড়াল বমি করিবার আবশ্যক হইলে ঘাস খায়। এইরূপ ব্যাঘ্র, সর্প, মৃগ, প্রভৃতিও আপন ২ ঔষধ চিনিয়া আবশ্যক মত ব্যবহার করিয়া থাকে শুনা গিয়াছে। তারপর পার্ব্বত্য অসভ্য অনক্ষর যত লোক যেখানে দেহ জীবন লইয়া বাস করিয়া থাকে, তাহারাও উৎকট ব্যাধি বিপাকের সময় প্রকৃতি সুলভ ঔষধ বলে নিজেদের রোগ দুঃখ অপনোদন করিয়া থাকে। আমরা মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবিনা যে ঐ অসভ্য জানোয়ার জন্তুদের নিকট ও আমাদের কত শিক্ষনীয় রহিয়াছে। কে জানে যে ঐ সকল ইতর জীব হইতেই প্রথম এই ঔষধ চিকিৎসার আবিষ্কার না হইয়াছে? আজ তোমাদের ঘরে ২ যে বিরাট গ্রন্থরাশি শোভমান, জান ইহার মূল কোথায়? আবার যদি তোমরা লুপ্ত গৌরব ফিরিয়া পাইতে চাও, তবে যাও সেই পাহাড়ে জঙ্গলে, খোঁজ সেই গোপাল, তাপস, ব্যাধ মালাকার, বনচরেদিগকে। এক এক জন বনপর্ব্বতাদিবাসীর অদ্ভুত রোগ দুরীকরণের ক্ষমতা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাহারাই জানেন উহা কত আশ্চর্য্য। এই সকল দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতে গেলে প্রবন্ধ অতি বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তাই বিরত রহিলাম। অনন্ত প্রাণী, অনন্ত

ব্যাধি, ঔষধও তাহার অনন্ত। আমি সব জানি, আমার শাস্ত্র পূর্ণ ইহা অতি মারাত্মক ভ্রম! ভ্রম-অহঙ্কার আমাদিগকে পদদলিত করে তাই আমরা অমৃতের সন্ধান পাইতেছিনা।

তেজ ও পিত্ত।

তেজ কি? শাস্ত্রকারগণ বলেন,

তৈজসাস্তুরূপং রূপেন্দ্রিয়ং বর্ণঃ সন্তাপো
ভ্রাজিষ্ণুতা পক্তিরমর্ষ স্তৈক্ষ্ণ্যং শৌর্য্যঞ্চ।

রূপ, বর্ণ, তাপ, দীপ্তিমানতা, পরিপাকশক্তি, ক্রোধ, তীক্ষ্ণতা, শূরত্ব এবং রূপেন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষু ইহারা তৈজস। তেজ পঞ্চভূতের অন্যতম, সূর্য্য তেজের আধার, রূপ, বর্ণ তাপ, প্রকাশমানতা পরিপাকশক্তি, ক্রোধ, তীক্ষ্ণতা ও শৌর্য্য এই কয়েকটি তেজেরই অবস্থান্তর। তাপের ঘনীভূত অবস্থা আলোক। দেখাযায় দুইটি কঠিন দ্রব্যের পরস্পর সংঘর্ষণে তাপ এবং সংঘর্ষণের আতিশয্যে আলোক উৎপন্ন হয়। দীপালোক বা অগ্নির আলোক সূর্য্যোত্তাপের ঘনীভূত বা রূপান্তরিত অবস্থা। সূর্য্যোত্তাপে বস্ত্রদগ্ধ হয় না, কিন্তু একখানি সূর্য্যকান্ত-মণি (আতসীপাথর) সূর্য্যোত্তাপে ধারয়া তাহার নিম্নে একটুকরা কাপড় রাখিলে সূর্য্যোত্তাপ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া কাপড় খানিকে দগ্ধ করে। ইহাতে স্পষ্টই উপলব্ধি হয়, অগ্নি, দীপালোক বা গ্যাসের আলোক প্রভৃতি পার্থিব বস্তু নহে। ইহারা সূর্য্যের তেজ। পৃথিবী অপ দ্বারা আবৃত, অপ তেজ দ্বারা আবৃত, তেজ মরুৎ দ্বারা আবৃত, মরুৎ আকাশ দ্বারা আবৃত। ক্ষিতি হইতে লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে চন্দ্র মণ্ডল। ক্ষিতি হইতে চন্দ্র মণ্ডল পর্য্যন্ত অপ। চন্দ্র মণ্ডল হইতে লক্ষ যোজন ঊর্দ্ধে সূর্য্য মণ্ডল। চন্দ্র মণ্ডল হইতে সূর্য্য মণ্ডল পর্য্যন্ত তেজ। চন্দ্র সোমগুণ বিশিষ্ট, সলিলময় পদার্থ (সলিল ময়োহি চন্দ্রলোকঃ) চন্দ্র মণ্ডল হইতেই বৃষ্টি নিপতিত হয়। বিষ্ণু পুরাণে দেখিতে পাই—

বিবস্বানষ্টভির্মাসৈরাদায়াপো রসাত্মিকাঃ।
বর্ষত্যম্বু ততশ্চান্ন মন্নাদপ্যখিলং জগৎ॥

বিবস্বানংশুভি স্তীক্ষ্ণৈরাদায় জগতো জলম্।
সোমং পুষ্যত্যথেন্দুশ্চ বায়ুনাড়ীময়ৈর্দিবি ॥
নালৈর্বিক্ষিপতেহভ্রেষু ধূমাগ্ন্যনিল মূর্ত্তিষু।
ন ভ্রশ্যন্তি যত স্তেভ্যো জনান্যভ্রাণি তান্যতঃ ॥
অভ্রস্থাঃ প্রপতন্ত্যাপো বায়ুনা সমুদীরিতাঃ।
সংস্কারং কালজনিতং মৈত্রেয়াসাদ্য নির্ম্মলাঃ।
সরিৎ সমুদ্র ভৌমাস্তু তথাপঃ প্রাণিসম্ভবাঃ।
চতুঃপ্রকারা ভগবানাদত্তে সবিতা মুনে ॥

সূর্য্য স্বকীয়, কিরণ দ্বারা আটমাস ক্রমান্বয়ে ষড্‌রসাত্মক জল গ্রহণ করিয়া, পুনর্ব্বার চারিমাসে তাহা বর্ষণ করেন। সেই বৃষ্টি দ্বারা অন্ন উৎপন্ন হয় এবং অন্নদ্বারা এই জগৎ রক্ষিত হয়। সূর্য্য প্রখর কিরণ দ্বারা জগতের জল সকল গ্রহণ করিয়া চন্দ্রকে পোষণ করেন, চন্দ্রও অন্তরীক্ষে বায়ুনাড়ীময় নাল দ্বারা সূর্য্য হইতে প্রাপ্ত সেইজল সমূহ মেঘে নিক্ষেপ করেন। এই মেঘ ধূম, অগ্নিও বায়ুময়। ঐ চন্দ্রনিক্ষিপ্ত জল সমূহ তৎকালে মেঘ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়েনা বলিয়া মেঘের নাম অভ্র। সেই সকল মেঘস্থিত জল কালবশে সংস্কার প্রাপ্ত ও নির্ম্মল হয়। তখন, সেই জল বায়ুবেগে উদীরিত হইয়া ভূমিতে নিপতিত হয়। সরিৎ, সমুদ্র, ভূমিও প্রাণিগণের দেহ হইতে চারি প্রকার জল ভগবান্ সূর্য্য গ্রহণ করেন। বস্তুতঃ আর্য্য দিগের এই সিদ্ধান্তই সমীচান এবং অভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়। সূর্য্যমণ্ডল এবং পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী স্তরে অপের আবরণ থাকিলে প্রখর সূর্য্যোত্তাপ নিয়মিত হইতে পারে না। অপের আপ্যায়নী শক্তির প্রভাবে সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ মন্দীভূত হয় বলিয়াই পৃথিবীর যাবতীয় কার্য্য সুশৃঙ্খল রূপে নির্ব্বাহ হয়। সাগর, সমুদ্র ক্ষিতি, প্রাণী ও উদ্ভিজ্জের শরীর হইতে সূর্য্যদেব যে রস গ্রহণ করেন, অপের আপ্যায়নী শক্তির প্রভাবে তাহার সমতা রক্ষিত হয়। অন্যথা সাগর, সমুদ্রের জল ও ক্ষিতির রস এক মুহূর্ত্তে শোষিত হইতে পারে এবং প্রাণীও উদ্ভিদ জগৎ এক মুহূর্ত্তে দগ্ধ হইতে পারে। ক্ষিতি পদার্থের কাঠিন্য, অপ্ পদার্থের তরলতা এবং তেজ পদার্থের উষ্ণতা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে অগ্নি পৃথক্ নহে, সূর্য্যের ঘনীভূত উত্তাপ। তদ্রূপ বর্ণও পৃথক্ পদার্থ নহে, সূর্য্যের

তেজ। আকাশে নীল পীতাদি যে সকল বর্ণ দৃষ্টহয়, তাহা আকাশে সূর্য্য কিরণ সম্পাতের ফল। ইহাই আদিবর্ণ। এই বর্ণ দৃষ্টে নানাবর্ণ কল্পিত হইয়াছে, রূপ শব্দে পদার্থের আকৃতি। যে ইন্দ্রিয়ের প্রভাবে পদার্থের সেই আকার দৃষ্ট হয়, তাহাই রূপেন্দ্রিয়। চক্ষু দ্বারা রূপদর্শন হয়। সুতরাং রূপও সূর্য্যমণ্ডলের তেজ। ভ্রাজিষ্ণুতা শব্দে প্রকাশমানতা, প্রকাশমানতা তেজের ধর্ম্ম, তেজ ব্যতীত কোন পদার্থ প্রকাশমান হইতে পারে না। পক্তি শব্দে পরিপাক শক্তি, পরিপাক ক্রিয়াও তেজের প্রভাবেই সম্পন্ন হয়। অমর্ষ শব্দে ক্রোধ, ক্রোধ তেজেরই প্রভাব। তীক্ষ্ণতা এবং শৌর্য্য বা শূরত্ব তেজের অন্যতম গুণ। এক্ষণে দেখা গেল রূপ, রূপেন্দ্রিয়, বর্ণ, তাপ, ভ্রাজিষ্ণুতা, পক্তি, অমর্ষ, তীক্ষ্ণতা ও শৌর্য্য ইহারা এক তেজেরই বিকৃতি বা বিভিন্ন অবস্থা মাত্র এবং তেজ সূর্য্য-মণ্ডলেরই শক্তি বিশেষ। আমরা ক্ষুদ্র জীব, এক মহাশক্তির অধীনে সর্ব্বদা কাল যাপন করিতেছি। ক্ষুদ্র শক্তিতে কুলায়না বলিয়া সর্ব্বদা মহাশক্তির সহায়তা গ্রহণ করিতেছি। বহির্ব্বায়ু ব্যতীত জীব এক মুহূর্ত্ত জীবনধারণ করিতে পারেনা। রাত্রিকালে দীপালোক ও দিনে সূর্য্যালোক ব্যতীত পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয় না। সেই মহাশক্তিধর ভগবান্ "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" তিনি সূক্ষ্মরূপে অণুর অণু ও স্থূল রূপে মহতের মহৎ। তিনি সমস্ত পদার্থে সূক্ষ্ম রূপে বিরাজমান। আমরা ক্ষুদ্র জীব অণুব্রহ্ম, সর্ব্বদা সেই মহৎ ব্রহ্মের কৃপা ভিখারী। তিনি বায়ুমণ্ডলের বায়ু ও সূর্য্যমণ্ডলের তেজ অণুরূপে আমাদিগের দেহে রাখিয়াছেন, সুতরাং বহির্ব্বায়ু ব্যতীত শ্বাস প্রশ্বাস ও সূর্য্যালোকের সাহায্য ব্যতীত আমাদিগের দর্শন ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয় না। সূর্য্যের একনাম জগচ্চক্ষু। যিনি তেজের ভাণ্ডার, যাঁহাতে সমস্ত তেজ নিহিত, তাঁহার চক্ষু নাই অথচ তিনি নিজে জগতের চক্ষু। যে শক্তির প্রভাবে দর্শনাদি ইন্দ্রিয় জ্ঞান সম্পন্ন হয়, সে শক্তি তাহারই, সুতরাং তাঁহার চক্ষু না থাকিলেও দর্শন শক্তি, অবশ্যই আছে। সূর্য্য স্বপ্রকাশ, আমরা সূর্য্যের সাহায্যে প্রকাশমান। সূর্য্য জগৎ আলোকিত করেন, আমরা চক্ষু দ্বারা সেই আলোকের সাহায্যে বস্তুর রূপ দর্শন করি। তবে ঐতেজ আমা-দিগের চক্ষে বড় কম, তজ্জন্য আমাদিগের ভাগ্যে দূরদর্শন ঘটেনা। এই তেজ বৃদ্ধি করিতে পারিলে, আমরাও সূর্য্যের ন্যায় স্বতন্ত্র ভাবে জগৎ আলোকিত

করিতে পারি। এই তেজের প্রভাবেই মহর্ষি কপিল ষষ্টিসহস্র সগর সন্তানকে ভস্মীভূত করিয়া ছিলেন। ইহাকেই প্রজ্ঞা চক্ষু, জ্ঞান চক্ষু বা যোগ চক্ষু বলে। ঋষিরা কিরূপে জ্ঞান-চক্ষু লাভ করিতেন, একটু ধীর চিত্তে আলোচনা করিলেই তাহা বুঝা যায়। মহাশক্তির সহিত ক্ষুদ্র শক্তির ঘাত প্রতিঘাতে আমাদিগের দর্শনাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়। ইহাতে সমধর্ম্মীর পরস্পর আকর্ষণ স্পষ্টই সূচিত হইতেছে। এই আকর্ষণের বিষয় চিন্তা করিলে দুইটি তার বিহীন টেলীগ্রাফের যন্ত্র কিরূপে পরস্পর শব্দ আদান প্রদান করে, তাহা বুঝাযায়। মনেহয় শব্দগুণ বহুল পদার্থ দ্বারা শব্দ আদান প্রদান করা যায়। অবশ্য মনে রাখিতে হইবে, আমরা যেমন সসীম ও ক্ষুদ্র, আমাদিগের জ্ঞান ও তদ্রূপ সসীম ও ক্ষুদ্র, সুতরাং জ্ঞানের সীমায় পৌছাইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে, কর্ম্মের সংযোগ ব্যতীত কেবল কথায় ক্রিয়া নিষ্পত্তি হয় না।

সত্যবটে, আমরা ক্ষুদ্রজীব, আমাদিগের দেহ ক্ষুদ্র, মন ক্ষুদ্র, বুদ্ধিক্ষুদ্র এবং জ্ঞানও ক্ষুদ্র কিন্তু আবার ইহাও সত্য যে আমরা ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছু নহি। “জীবো ব্রহ্মৈব না পরঃ।” সুতরাং আমরা চেষ্টা করিলে কর্ম্ম বলে বলীয়ান হইয়া মহাশক্তি লাভ করিতে পারি। সূর্য্য যেমন স্বপ্রকাশ, আমরা ও তদ্রূপ স্বপ্রকাশ হইতে পারি। তখন আর দর্শনাদি ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন থাকিবেনা। আমরা নিরাকারের ধারণা করিতে পারিনা। যাঁহার আকার নাই, কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় নাই, আহার নিদ্রা নাই, সে কেমন পদার্থ বুঝিতে পারিনা, কেবল এইমাত্র বুঝিতে পারি, যিনি পূর্ণ, সর্ব্বপ্রকার আশক্তিশূন্য, তাঁহার কোন ইন্দ্রিয়ের বা কর্ম্মের প্রয়োজন নাই, কিন্তু সাকার ব্রহ্মের প্রতিরূপ দৃষ্টে আমরা ইহা বুঝিতে পারি যে তিনি কিরূপে মহাশক্তিধর, তিনি কিরূপে স্বপ্রকাশ। সূর্য্যদেব ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত। তাঁহার হস্তপদাদি ইন্দ্রিয় নাই অথচ গ্রহণ ও গতি শক্তি আছে, চক্ষু নাই অথচ দর্শন শক্তি আছে। এই খানেই স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীন ভাব। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅমৃত লাল গুপ্ত কবিভূষণ।
১৭নং কাশীদত্তষ্ট্রীট্, নিমতলা. কলিকাতা।

দেশীয় পথ্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জীবন ধারণ বিষয়ে জল আহার্য্য দ্রব্য অপেক্ষাও অধিকতর প্রয়োজনীয় জিনিষ। শরীরের সহিত জলের এত অধিক ঘনিষ্ট সম্বন্ধ যে চিকিৎসা ক্ষেত্রেও ভোজ্য এবং পানীয় এত দুভয়ের মধ্যে পানীয় দ্রব্যের সর্ব্বতোভাবে প্রাধান্য রক্ষা করা আবশ্যক হয়। অর্থাৎ রুগ্নাবস্থায় অন্নলালসা একান্ত বলবতী হইলেও যদি অন্ন রোগ বা উপসর্গ বর্দ্ধক বলিয়া সন্দেহ হয়, তবে অন্নের পরিবর্ত্তে রুটি খৈ কিম্বা সুজি প্রভৃতি অন্নের সমগুণ বিশিষ্ট দ্রব্যাদি ব্যবহার করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলে শরীরের কোন গুরুতর ক্ষতি সম্ভবপর হয় না। কিন্তু তৃষ্ণার্ত্ত রোগীর জল পান একান্ত রোগানুকূল হইলেও অবিধেয় নহে। কারণ তৃষ্ণার বেগ ধারণ করিলে ভ্রম মোহ প্রভৃতি আশু প্রাণহানীকর উপদ্রব উপস্থিত হইয়া প্রাণান্ত বিচিত্র নহে। এমতাবস্থায় রোগীর অবস্থানুযায়ী দোষপ্রত্যনীক ও ব্যাধি প্রশমক দ্রব্যাদি যোগে জলের সংস্কার করিয়া দেওয়া আবশ্যক। যথাঃ——

জীবানাং জীবনং জীবো জগৎ সর্ব্বন্তু তন্ময়ং।
অতোঽত্যন্ত নিষেধেন কদাচিদ্বারিবার্য্যতে॥
তৃষ্ণা গরীয়সী ঘোরা সদ্যঃ প্রাণবিনাশিনী।
তস্মাদ্দেয়ং তৃষার্ত্তায় পানীয়ং প্রাণধারণং॥
তৃষিতো মোহমায়াতি মোহাৎ প্রাণান্ বিমুঞ্চতি।
তস্মাৎ সর্ব্বাস্ববস্থাসু বারি দেয়ং পিপাসবে॥

জল জীবগণের জীবন-স্বরূপ। সমস্ত জগৎই জলময়। সুতরাং কেবল মাত্র অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থায় জল দেওয়া নিষিদ্ধ হইতে পারে। অতি প্রবল তৃষ্ণা আশু প্রাণ বিনাশিনী, সুতরাং তৃষ্ণাতুরকে প্রাণধারণোপযোগী পানীয় প্রদান করিবে। তৃষিত ব্যক্তি মোহ প্রাপ্ত হয় এবং মোহ হইতে প্রাণ নাশ হয়, সুতরাং সকল অবস্থায়ই পিপাসিত ব্যক্তিকে জল প্রদান করিবে।

নদী পুষ্করিণি প্রভৃতি আধার ভেদে জল বিভিন্ন গুণ সম্পন্ন হয়, কাযেই আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ দেশ কাল পাত্রানুযায়ী পৃথক্ পৃথক্ পীড়াতে ভিন্ন ভিন্ন বিধানানুযায়ী সংস্কৃত জলপানের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন রোগীর জলপান পদ্ধতি আলোচনা করাই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য বিধায় জলের স্থানগত গুণ ও কালোচিত পানের নিয়মাদি উল্লেখ আবশ্যক মনে করিলাম না। 'চরক

সুশ্রুত প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থ পর্য্যালোচনায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকমণ্ডলী সর্ব্বদাই ঈষদুষ্ণ বা শৃত-শীত (অর্থাৎ উষ্ণজল শীতল করিয়া) জলপানের পক্ষপাতী ছিলেন। কোন অবস্থাতেই পুষ্করিণী নদী বা নির্ঝরাদির জল উষ্ণ না করিয়া পান করার উপদেশ পাওয়া যায় না। অধিকন্তু একান্ত দূষিত জলও উষ্ণ করিলে পানের উপযুক্ত হয়, এমন কি উষ্ণতা ভিন্ন জল শোধনের অন্য কোন উপায় নাই। যথা—

নিন্দিতঞ্চাপি পানীয়ং ক্বথিতং সূর্য্য তাপিতং।
তাম্রং সুবর্ণ রজতং পাষাণ সীকতা মৃদং॥
ভৃশং সন্তাপ্য নির্ব্বাপ্য সপ্তধা সাধিতং তথা॥

জল সংশোধক দ্রব্যাদি যোগে জল জ্বাল দিলে অথবা উক্ত দ্রব্যাদি সহ জল রৌদ্রে রাখিয়া দিলে জল বিশুদ্ধ হয়। কিংবা সুবর্ণ, রজত, তাম্রাদি ধাতব পদার্থ, প্রস্তর, ইষ্টক বা বালুকা প্রভৃতি কোনও দ্রব্য পুনঃ পুনঃ উত্তপ্ত করিয়া জলে নিমজ্জিত করিয়া শীতল করিবে এইরূপে সাতবার উষ্ণ সাতবার শীতল করিয়া ছাকিয়া লইলে জল বিশুদ্ধ হয়। পকাপক জলের মধ্যে কোন জল কত সময়ে জীর্ণ হইবে সূক্ষ্মদর্শী আর্য্য ঋষিগণ সেই বিষয়েরও অতি পরিষ্কার মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। যথা—

আমং জলং জীর্য্যতি যাম মাত্রং
তদর্দ্ধ মাত্রং শৃত শীতলঞ্চ।
তদর্দ্ধ মাত্রং শৃতং কদুষ্ণং
পয়ঃ প্রপাকে ত্রয় এব কালাঃ॥

অপক্ক জল জীর্ণ হইতে এক প্রহর সময় আবশ্যক হয়। উষ্ণজল শীতল করিয়া পান করিলে তাহার অর্দ্ধেক সময়ে জীর্ণ হয়। ঈষদুষ্ণ জল ইহারও অর্দ্ধেক সময়ে জীর্ণ হইয়া থাকে। অপক্ক জল জীর্ণ হওয়ার এক চতুর্থাংশ সময়ে ঈষদুষ্ণ জল জীর্ণ হয়, সুতরাং ঈষদুষ্ণ জলই সর্ব্বসাধারণের পানীয় রূপে গৃহীত হওয়া উচিত। জ্বরিত ব্যক্তিকে এই সাধারণের শ্রেণীভুক্ত করিলেও তাহার পক্ষে ঈষদুষ্ণ জলই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে জ্বর চিকিৎসা অধ্যায়ে পিত্তজ্বর ভিন্ন সকল জ্বরেই তরুণাবস্থায় উষ্ণজল পান করার বিধান দেখা যায়; অধিকন্তু শীতল

জলকে বিবক্ষ পরিত্যাগ করিবার উপদেশও বিরল নহে। যথা—জল পান বিধিতে—

পার্শ্বশূলে প্রতিশ্যায়ে বাতরোগে গলগ্রহে।
আধ্মানে স্তিমিতে কোষ্ঠে সদ্যঃ শুদ্ধৌ নবজ্বরে।
অরুচি গ্রহণী গুল্ম শ্বাস কাসেষু বিদ্রধৌ।
হিক্কায়াং স্নেহ পানে চ শীতাম্বু পরিবর্জ্জয়েৎ॥

পার্শ্বশূল, নাসাস্রাব, বাতরোগ, গলরোগ, উদরাধ্মান, স্তিমিত কোষ্ঠ, বমন বিরেচনের অব্যবহিত পরিবর্ত্তী অবস্থায়, তরুণ জ্বরে, অরুচি, গ্রহণী গুল্ম শ্বাস, কাস, বিদ্রধি প্রভৃতি রোগাক্রান্ত ব্যক্তি শীতল জল পরিত্যাগ করিবেন। এই প্রমাণেও তরুণ জ্বরে উষ্ণ কিংবা ঈষদুষ্ণ জল পানের বিষয় লিখিত হইল জ্বরে অপক্ক জল দূরের কথা তরুণ জ্বরে শৃত-শীতল জল পান করাও বিধেয় নহে।

জল উষ্ণ করিতে হইলে আবৃত পাত্রে জল উষ্ণ করিয়া আবৃত অবস্থায়ই শীতল করিতে হয়। জল মুক্তাবস্থায় শীতল বাতাসের সাহায্যে শীতল হইলে গুরুপাক ও বিষ্টম্ভী হয়। জল উষ্ণ করিয়া শীতল করিবার উদ্দেশ্যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আমাদের এই প্রাচীন সুপ্রথাটী অবলম্বন করিয়াছেন। কেটলী নামক (*Kettle*) জল গরমের যন্ত্রটী তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। যথা—

শৃতং শীতং ত্রিদোষঘ্নং যদস্তবাষ্প শীতলং।
শৃতং কৃতস্তু বিষ্টম্ভী দুর্জ্জরং পবনাহতং॥

জল গরম করিতে উল্লিখিতরূপ সতর্কতার আবশ্যক। উদ্ধৃত শ্লোকটী জল পানের সামান্য বিধান। জ্বর-চিকিৎসা অধ্যায়ে বিশেষ সূত্রে পিত্তজ্বরী দাহ, পিপাসা, বমি ক্লান্ত হইলে উষ্ণ কিংবা ঈষদুষ্ণ জল পান না করিয়া শৃত-শীতল জল পান করিবেন। যথা—

ব্যুষিতং ধন্যাক জলং প্রাতঃ পীতং স শর্করং পুংসাম্।
অন্তর্দাহং শময়ত্যচিরাদ্দূব প্ররূঢ় মপি॥

রাত্রিতে ২-তোলা ধনিয়া ও ৮ তোলা উষ্ণ জলে ভিজাইয়া রাখিবেন, পর দিন প্রাতে ছাকিয়া তাহাতে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে দীর্ঘ-কালোৎপন্ন অন্তর্দাহও প্রশমিত হয়। পিত্ত জ্বরের পিপাসা, দাহ, বমি প্রভৃতি

নিবারণ করার জন্য ষড়ঙ্গ পানীয় অতি উত্তম ঔষধ।

ষড়ঙ্গ পানীয়—মুথা, ক্ষেতপাপড়া, বেনার মূল, রক্তচন্দন, বালাপাতা ও শুণ্ঠী, দ্রব্যসমষ্টি ২ তোলা চারি সের জলে মাটির হাঁড়িতে মৃদু অগ্নিতে জ্বাল দিয়া দুই সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে পান করিবেন, পিত্ত জ্বরের পিপাসা শান্তির ইহা মহৌষধ। ইহাতে জ্বরেরও প্রশমন হইবে অথচ উদরাময় বর্ত্তমান থাকিলেও উপকার ভিন্ন অপকার হয় না।

দাহ প্রলাপ মূর্চ্ছা প্রভৃতি নিবারণ জন্য নানাবিধ শীতল উপনাহ (প্রলেপ) প্রদান করার উল্লেখ আছে। যথা—

পিত্ত জ্বরেন তপ্তস্য ক্রিয়াং শীতাং সমাচরেৎ ॥

পিত্ত জ্বরে শীতল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে।

আমলকী ঘৃতে ভাজিয়া তৎপর কাজি দ্বারা বাটীয়া মাথা ও কপালে প্রলেপ দিলে দাহ ও প্রলাপ প্রশমিত হয়।

পলাশের কচি পাতা কাজির সহিত বাটীয়া মাথায় প্রলেপ দিবে। দাহ, পিপাসা, রক্তলোচনতা প্রভৃতি উপসর্গ প্রশমনের জন্য চক্রদত্ত ও সারসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থে বিবিধ মুষ্টিযোগের উল্লেখ আছে কিন্তু শীতল জল বা বরফ দিতে হইবে এমন কোন উপদেশ পাওয়া যায় না।

পিত্ত জ্বরের প্রবল দাহ নিবারণের জন্য রোগীকে উত্তানভাবে শায়িত করিয়া নাভির উপর তাম্র কিংবা কাংস্যাদির গভীর একটী পাত্র স্থাপন করত তাহাতে শীতল জলের ধারা দিবে, ইহাতে সত্বরই প্রবল দাহ প্রশমিত হয়; এখানে যদিও তরুণ জ্বরে কথঞ্চিৎ শীতল জলের সম্পর্ক দেখা যায় কিন্তু তাহাতেও "সর্ব্বত্রৈব কফ সম্ভাবনাং বিনা" এই বাক্য দ্বারা সতর্ক করা হইয়াছে এবং রোগীর শরীরে জলকণার স্পর্শ না হয় এজন্য গুরুশুষ্ক বস্ত্র দ্বারা সমস্ত শরীর আবৃত করিয়া দিতে হইবে।

ত্রিকালদর্শী আর্য্যঋষিগণ যে ক্ষেত্রে জল বিন্দুটী শরীরে লাগান সঙ্গত বোধ করেন নাই সেই ক্ষেত্রে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার গণ্ডির ভিতরে থাকিয়া প্রচুর শীতল জলে রোগীর মাথা ধৌত করিয়া দেওয়া বা শীতল জলের পট্টি দেওয়া ধৃষ্টতার পরিচয় ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে। (ক্রমশঃ)

শ্রীবিপিনবিহারী সেন, কবিরাজ।

পল্লী চিকিৎসক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)।

অষ্টম অধ্যায়।

আহারান্তে হরিনাথ আজ সকালেই আসিয়া হাজির। সুরেন বাবুকে ডাকিয়া লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিল।

হ—দেখুন সুরেন বাবু, আজ প্রথমে বাঘী বসান সম্বন্ধে একটা আশ্চর্য্য ফলপ্রদ ঔষধ বলি। আমরা অনেক সময়েই একপ্রকার চুলের বাসা দেখিতে পাই। চলিত কথায় উহাকে "টাকের বাসা" বলে। গোহাল ঘরে, পাকশালে অথবা প্রাচীন পাকা পায়খানায় উহা অনেক পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত এখানে সেখানে দেখা যায়। ঐ বাসার ভিতর একটা মৃত পোকা দেখা যায়। ঐ বাসাটী সংগ্রহ করিয়া এক দিক চিড়িয়া ভিতরের পোকাটা ফেলিয়া দিয়া, ঐ ভিতর অংশে থু থু দিয়া বাঘীর বেদনা স্থানে লাগাইয়া দিতে হয় এবং অনুমান ১৫।২০ মিনিট কাল বসিয়া থাকিতে হয়। উহা লাগাইবার কিয়ৎকাল পরেই চুলকানী আরম্ভ হয়, উহা সহ্য করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে উহা খুলিলে দেখা যায় যে, উক্ত স্থানে কতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ হইয়াছে এবং উহা দিয়া ঘামের ন্যায় জল বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে বেদনা কমিয়া যায় ও বাঘি বসিয়া যায়।

সু—এইবার পোড়া ঘা এর ঔষধ বল।

হ—পোড়া ঘা ও সাধারণ ঘার পৃথক্ ঔষধ নির্ব্বাচিত আছে। কারণ ভাল স্থান অগ্নিতে দাহ হয় বলিয়াই উহার জন্য ভিন্ন ঔষধ দরকার।

সু—পুড়িয়া গেলে সাধারণতঃ ফোস্কা পড়ে; কি করিলে ফোস্কা পড়ে না তাহা বল।

হ—পুড়িবামাত্র কেরোসিন তৈল দিলে শীঘ্রই জ্বালা দূর হয় ও ফোস্কা বা ঘা হইতে পারে না।

পুড়িবামাত্র সর্ষপ তৈল মাখিয়া আগুনে ছেঁকিলে জ্বালা নিবারণ হয় ও ফোস্কা পড়ে না।

পুড়িবামাত্র পাকা কলার বা মাৎগুড়ের প্রলেপ দিলে অর্থা পোড়া

স্থান চাউলের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া রাখিলে জ্বালা নিবারণ হয়।

পুড়িবামাত্র গোল আলু বাটিয়া প্রলেপ দিলে বা ময়দা ঠাণ্ডা জলে গুলিয়া প্রলেপ দিলে শীঘ্র জ্বালা যন্ত্রণা দূর হয় ও ফোস্কা পড়ে না।

সু—জ্বালা যন্ত্রণা দূরীকরণ ও ঘা শুকাইবার উপায় কি ?

চূণের জলসহ তিল তৈল বা নারিকেল তৈল ফেনাইয়া প্রলেপ দিলে কিম্বা ঘৃতকুমারীর রস দিলে বা কাঁচা দুগ্ধের পটী করিলে শীঘ্র জ্বালা দূর হয় ও ক্রমে ঘা শুকাইয়া যায়।

ঢেকিশাকের পাতার রস দিলে বা কেঁচোর সহিত তিল তৈল পাক করিয়া কিম্বা শিমুল তুলা ও জলের বালুকা একত্রে বাটিয়া দগ্ধ স্থানে প্রলেপ দিলে আরোগ্য হয়।

মহারাষ্ট্রির মূল বাটিয়া বা পুরাতন গৃহের খড় (তৃণ) চূর্ণ করিয়া অথবা অশ্বত্থ বৃক্ষের বল্কল অন্তর্ধূমে দগ্ধ করতঃ অগ্নিদগ্ধ ক্ষতে দিলে ক্ষত শুষ্ক হয়।

বেতের কাঁচা পাতা পুড়িয়া উহার ছাই ক্ষত স্থানে দিলে ক্ষত সহজে সারিয়া যায়।

সু—পোড়া ঘা এর জন্য কেচুয়ার তৈলের কথাই শুনা যায় এবং প্রত্যক্ষ ফল দেখা যায় উহার নিয়ম কি ?

হ—প্রথমে তৈল কড়াতে বসাইয়া ঐ তৈল ভাজা হইলে উহাতে উহার এক চতুর্থাংশ ওজন কেচুয়া ছাড়িয়া দিতে হয়। ভাজা হইলে প্রদত্ত তৈলের চতুর্গুণ জল উহাতে ছাড়িয়া দিতে হয় এবং যখন জল শেষ হইয়া মাত্র তৈল অবশিষ্ট থাকে তখন উহা নামাইতে হয়। এই তৈল ক্ষত স্থানে মালিশ করিলে অতি দুঃসাধ্য ঘাও সহজে শুকাইয়া যায়।

সু—পোড়া ঘা এর জ্বালানিবারক ঝাড়ার ২।১টা মন্ত্র বলিবে না ?

হ—সে কথা স্থানান্তরে বলিবার কথা রহিল ; আজ মনে আসছে না। তবে আর একটা ঔষধ এখানে বলিয়া "পোড়া ঘা" শেষ করিব।

শ্বেতধূপ চূর্ণ ও খাটি সর্ষপ তৈল বা গব্য ঘৃত একত্রে মিশাইয়া কার্পাস তূলাসহ (পরিমাণমত) মাখাইবেন এবং পরে জলসহযোগে হাতে রাখিয়া আস্তে ২ চাপড়াইবেন। এরূপ করিতে ২ যখন ফুলিয়া বেশ সাদা মাখনের

তার হইবে তখন একবার কি বার কয়েক জল লইয়া ধুইতে থাকিবেন। এরূপ করিলে ঔষধটা বেশ সাদা হইয়া পড়িবে। এই ঔষধ তৈয়ার হইল ; এখন ঐ তুলা ক্ষত স্থানে লাগাইয়া দিবেন। অল্পদিনেই দগ্ধ ঘা আরোগ্য হইবে।

সু—অনেক সময় কাঁটা বা কোন কিছু (শাল) দেহে ঢুকিয়া থাকে। মুখে ক্ষত হইয়া যায় কিন্তু কাটা বা অস্ত্রোপচার ভিন্ন খুলিবার উপায় থাকে না অথচ অনেক সময় এমন অবস্থাও হইয়া পড়ে যে অনেক দূর না কাটিলে উহা খোলা অসম্ভব হইয়া পড়ে ; ইহার কোনও সহজ উপায় আছে কি ?

হ—ক্ষতমুখে বাতির তৈল দিলে উক্তস্থান পাকিয়া যায় এবং কাঁটা সহজেই খোলা যায়।

রোগীকে অর্দ্ধতোলা যবক্ষার (সোরা) এক ছটাক উষ্ণজল সহ পান করাইয়া শৃগাল কোকিল (বড় বদরী বৃক্ষের) মূল পেষণ পূর্ব্বক পিণ্ডাকারে ক্ষত মুখে দিলে ব্রণমধ্যস্থ কণ্টকাদি সহজে বহির্গত হয়। এই প্রণালীতে লাঙ্গলী মূল বা গবাক্ষীর (মামালাড়ুব) মূল প্রয়োগ করিলে কণ্টকাদি বহির্গত হয়।

খেজুর কাঁটার বড় বিষ এবং কথিত হয় যে উক্ত কাটা যদি রক্তের সংস্পর্শ পায় তবে রক্তের সঙ্গে ২ উহা ঊর্দ্ধমুখে উঠিতে থাকে। কাজেই উক্ত ব্যাপারে বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত।

দুধ আকনের কষ লবণ সহ যোগে ক্ষতমুখে দিলে কাঁটা—একদিনে না হউক ৩ বা ৭ দিনে আপনিই ক্ষতমুখে বাহির হইয়া পড়িবে। প্রতিদিনই উহা প্রাতে বান্ধিতে হয় এবং প্রত্যেহই কাটা ক্ষতমুখে আসিল কি না অনুসন্ধান করিতে হয়। এই ঔষধ ব্যবহারে উল্লিখিত খেজুর কাঁটাও বহির্গত হইতে দেখা গিয়াছে। ইহারই নাম কাটা খুলিবার "লবণ পড়া"।

সু—এইবার কি বলিতে চাও ?

হ—আপনিই বলুন না।

সু—উপদংশ ক্ষতের ঔষধ বল।

হ—কথাটা বুঝিলাম না।

সু—এই যাহাকে গর্ম্মির ঘা বলে—চলিত কথায় "বদরসের ব্যারাম"।

হ—কালশিরা ও ঘি পাথরের বা অন্য কোন পাত্রে কাঠি দ্বারা মিশাইবেন, পরে ময়লাযুক্ত ঘায়ে কদম পাতার নীচ পীঠে মাখিয়া তিন দিনের জন্য বান্ধিবেন পরে নিমপাতাসিদ্ধ জলে ধুইয়া ঐ ঔষধ তেনাতে মাখিয়া দুই দিন অন্তর খুলিলেই দেখিবেন যে উহা শুকাইয়া গিয়াছে। নালী থাকিলে প্রথমে মানকচুর পরিষ্কৃত শিকড় রাত্রিকালে ঐ নালীতে ভরিয়া নিকটে বসিয়া থাকিবেন, শিকড় যতই ঘা ভরিয়া বাহির হইবে, ততই উহা কাঁচিদ্বারা কাটিবেন পরে নালী ভরিলে এই ঔষধ নিয়ম মত ব্যবহার করাইবেন।

করবীমূল জল দ্বারা পেষণ করতঃ প্রলেপ দিলে অসাধ্য উপদংশও ভাল হয়।

হাতীশুঁড়া গাছের শিকর ও পাতা হুকার জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে অথবা সাদা ধুনার গুড়া ও মাখন সম পরিমাণে মর্দ্দন করিয়া ঘাএ দিলে আরোগ্য হয়।

মনসাসিজের শাস সাত খণ্ড, এক আঙ্গুল (অঙ্গুলি) দোভাঙ্গা চিরাসহ প্রাতে চিবাইয়া খাইলে তিন দিনে গর্ম্মিদোষ ও তজ্জনিত শোথ দূর হইয়া ঘা শুকাইয়া যায়। স্থল বিশেষে ৭ সাত দিন লাগে।

দাড়িম ছালের চূর্ণ বা জল সহ সুপারি ঘষা অথবা মনুষ্যকপালাস্থি চূর্ণ ক্ষত স্থানে মালিশ করিলে ভাল হয়।

একটী লৌহপাত্রে থুথু (ছেপ) দিয়া একটী জঙ্গীহরিতকী ঘষিবেন। পরে কিয়ৎ পরিমাণে খদির (খয়ের) দিয়া তাহাতে ঘষিবেন। যখন ঘন হইবে তখন তিনটী কাটানটিয়ার শিকড় (ক্ষুদুরিয়া ডাটা, কাঁটাসংযুক্ত বন্য ডাটা বিশেষ) ঘর্ষণ করিলে যে মলম হইবে উহা ক্ষত স্থানে প্রয়োগ করিলে অল্পদিনেই নিশ্চয় ক্ষত শুষ্ক হইবে। ঔষধে যেন জল না লাগে থুথুই জলের কাজ চালাইবে।

সু—কুষ্ঠ রোগের ঔষধ জান? উহা ত প্রায় অসাধ্য রোগ।

হ—কঠিন রোগ বটে কিন্তু তাই বলিয়া অসাধ্য নয়। উক্ত ক্ষতের ঔষধ 'ঘা'তে বর্ণিত ঔষধেও আছে। আবার এখানেও একটি বলি।

হরিতকী ও নিম্বপত্র সমভাগে চূর্ণ বা মরিচ চূর্ণ ও আমলকী সমভাগে

মিশাইয়া সেবন করিলে একমাস বা দেড় মাসের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ

শ্রীগোপীনাথ দত্ত।

রাজবাড়ী, ঢাকা।

সংবাদ।

ফিজিদ্বীপের সিবিলিয়ান মিঃ এ, সি, মুখোপাধ্যায় আমাদিগকে লিখিয়াছেন, "অষ্ট্রেলিয়াতে বহুসংখ্যক পঞ্জাবী চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেছে। ইহারা চিকিৎসার কিছুই জানে না, কেবল ঔষধ বিক্রয় করে, অথচ শ্বেতাঙ্গ নরনারীগণ প্রতি সপ্তাহে ৩০।৪৫৲ টাকা তাহাদিগকে দর্শনী স্বরূপ প্রদান করিয়া থাকে।" মিঃ মুখার্জী লিখিয়াছেন, ইহাদের দ্বারা ভারতীয় চিকিৎসা প্রণালীর কলঙ্ক হইবে। ভারতবর্ষ হইতে শিক্ষিত কবিরাজগণ যদি অষ্ট্রেলিয়া গমন করেন, তবে তাঁহাদের খুব উপার্জ্জন হইবে। যাঁহারা অষ্ট্রেলিয়া যাইতে ইচ্ছুক তাঁহারা মিঃ মুখার্জ্জির সহিত পরামর্শ করুন। তাঁহার ঠিকানা এই :—

এ, সি, মুখার্জ্জি এ স্কোয়ার,
সিবিল সার্জ্জন—ফিজি।

"বঙ্গবাসী" অথবা—কেয়ার অফ্ টমাস্ কুক্ এণ্ড সন্স, বোম্বাই।

"আশংসা।"

(প্রাপ্ত)

আয়ুর্ব্বেদবিদামুদারমধুরৈরত্যন্তচিন্তাফলৈঃ
আয়ুঃস্বাস্থ্যচিকিৎসতোন্নতিকরৈঃ শুদ্ধৈঃ প্রবন্ধৈর্য্যুতঃ।
ধীরশ্রীলসুধাংশুভূষণ ভিষগ্‌রাজেন সম্পাদিতঃ।
"আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ"এষ বিদুষাং হর্ষায় সংজায়তাম্॥

ইত্যাশাস্তে বাঁকুড়ান্তর্গত বিষ্ণুপুর বাস্তব্য—
শ্রীভোলানাথ দাশ গুপ্তঃ।

"প্রাণোবা অমৃতম্ ।" (শ্রুতিঃ)

আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ।

(স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন ও চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র)

"আয়ুঃকাময়মানেন ধর্ম্মার্থ সুখসাধনম্।
আয়ুর্ব্বেদোপদেশেষু বিধেয়ঃ পরমাদরঃ॥ বাগ্‌ভট।

৩য় বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩২২ { ২য় ৩য় সংখ্যা।

আয়ুর্ব্বেদীয় শল্যতন্ত্র ও পাশ্চাত্য সার্জ্জারী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যন্ত্র ও শস্ত্র।

সেকালে শল্যতান্ত্রিক বৈদ্যগণ যে সকল লৌহাদিময় চিকিৎসার উপকরণ (Instruments) ব্যবহার করিতেন তাহারা সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত যথা——

যন্ত্র ও শস্ত্র। এইরূপ এবং সূক্ষ্মতর বিভাগ আয়ুর্ব্বেদীয় শল্যতন্ত্রেই দেখা যায়, ডাক্তারী শল্যতন্ত্রে দেখা যায় না,

যন্ত্র——"যম্ নিয়মনে" এই ধাতু হইতে যন্ত্র শব্দ উৎপন্ন। যন্ত্র দ্বারা ধারণ, উৎপাটন, আকর্ষণ প্রভৃতি নানাবিধ কার্য্য হয়। দর্শনাদিও যন্ত্র সহযোগে করা হয়।

শস্ত্র——"শসু হিংসায়াম্"——এই ধাতু হইতে শস্ত্র শব্দের উৎপত্তি। ছেদন, ভেদনাদি কার্য্যের যে ছুরি, কাঁচি, সূচী প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগকে শস্ত্র বলে।

ইংরাজীতে বুঝাইতে গেলে শস্ত্র অর্থে (Cutting Instruments এবং যন্ত্র অর্থে Non cutting instruments — এইরূপ বলিতে হয়।

প্রাচীন যন্ত্র শস্ত্র সমূহের উৎকর্ষ।

অনেকে মনে করেন যে শল্যতন্ত্রোক্ত যন্ত্র শস্ত্র সমূহ অসভ্য বর্ব্বরোচিত কামারের যন্ত্রের মত ছিল। তখন এমন পালিস্ বা রূপালি রং করা (Polishing and Nickel plating) হইত না। তাহাদের এই দারুণ ভ্রম দূর করিবার জন্য যন্ত্র শস্ত্র গুলি সেকালে কিরূপ হইত তাহার সামান্য একটু পরিচয় লিখিতেছি। সুশ্রুত বলিতেছেন "তানি (যন্ত্রাণি) প্রায়শো লৌহানি-ভবন্তি তৎ প্রতিরূপকানি বা তদলাভে। তত্র নানাপ্রকারাণাং ব্যালানাং মৃগপক্ষিণাং মুখৈর্ম্মুখানি যন্ত্রাণাং প্রায়শঃ সদৃশানি, তস্মাত্তৎ সারূপ্যাদাগমাদুপদেশাদন্যযন্ত্রদর্শনাদ্ যুক্তিতশ্চ কারয়েৎ।

সমাহিতানি যন্ত্রাণি খরশ্লক্ষ্ণ মুখানি চ।
সুদৃঢ়ানি সুরূপাণি সুগ্রহাণি চ কারয়েৎ॥"

(সুঃ সূত্রস্থান ৭ অঃ

ইহার মর্ম্মার্থ এই——"যন্ত্রগুলি সাধারণতঃ লৌহময় (Aseptic) হওয়া আবশ্যক, নিতান্ত অভাব হইলে সেগুলি শৃঙ্গ, হস্তিদন্ত বা কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত হইলেও চলিতে পারে। যন্ত্রগুলি সাধারণতঃ মুখাংশে নানাপ্রকার পশু ও পক্ষীর মুখের সদৃশ হইয়া থাকে। এই সাদৃশ্য ঠিক রাখিয়া শাস্ত্রানুসারে ও সুদক্ষ লোকদিগের উপদেশানুসারে এবং আদর্শ যন্ত্রাদিদর্শনে যন্ত্র সমূহ প্রস্তুত করাইবে। ধারণাদির সুবিধার জন্য যে যন্ত্র যেরূপ করিলে সুবিধা হয়, সেই রূপেই সেই যন্ত্র নির্ম্মাণ করাইবে। যন্ত্র সমূহের যোড় বা সন্ধিস্থলে উত্তমরূপে সম্বদ্ধ (Well Jointed) হওয়া আবশ্যক এবং যন্ত্র গুলি সুদৃঢ়, সুদৃশ্য, সুগ্রহ (ধরিবার সুবিধা যুক্ত) এবং প্রয়োজনানুসারে কখনও খরমুখ (মুখের ভিতরে দাঁতকাটা Serrated) এবং কখনও শ্লক্ষ্ণ বা চিক্কণ মুখ বিশিষ্ট হইবে।" শস্ত্র নির্ম্মাণ প্রণালী সম্বন্ধে সুশ্রুত বলিয়াছেন——

তানি সুগ্রহাণি সুলোহানি সুধারাণি সুসমাহিত মুখাগ্রাণি অকরালানি বেতি শস্ত্র সম্পৎ"

সুশ্রুত — ৮ম অঃ

অর্থাৎ——"শস্ত্র সমূহ সুগ্রহ (Easy to handle) উত্তম লৌহ নির্ম্মিত (Of Suitable steel) উত্তম ধার বিশিষ্ট (Of proper Shorpress) মুখাগ্রে সুসমাহিত (Properly Jointed E. G. Scissers) এবং অকরাল অর্থাৎ যাহার দাঁত পড়িয়া যায় নাই এরূপ (Of Unbroken edge) হইবে।

শস্ত্র সমূহের ধার সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে——

তত্র ধারা ভেদনানাং মাসূরী, লেখনানামর্দ্ধমাসূরী, ব্যধনানাং বিস্রাবণানাঞ্চ কৈশিকী, ছেদনানামর্দ্ধকৈশিকী বেতি।" অর্থাৎ——"যে সকল শস্ত্র ভেদন কার্য্যে ব্যবহৃত হয় তাহাদের ধারা মসূর দালের পরিধির ন্যায় হঠাৎ মোটা হইতে সরু হইবে—এইরূপ শস্ত্র ব্রীহিমুখ (Trocar) (উদরাদি হইতে জল নিষ্কাশনের ধারাল স্থূল শলাকাকার শস্ত্র)। লেখন চাঁচিয়া দেওয়া কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত শস্ত্রের ধারা অর্দ্ধ মাসূরী অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্থূল ধারার অর্দ্ধেক পরিমিত, স্থূল হইতে সূক্ষ্ম। এরূপ ধারের দৃষ্টান্ত প্রচলিত বাটালিতে দেখা যায়। ব্যধন বা সিরাবেধ প্রভৃতি কার্য্যের জন্য কৈশিকী অর্থাৎ কেশ পরিমিত ধারা হইবে। ছেদন বা কাটিবার জন্য ছুরি প্রভৃতির ধারা অর্দ্ধকেশ পরিমিত হইবে।"

শস্ত্র সমূহের পায়না বা পান (Temper) সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত রূপ উপদেশ দেখা যায়।

"তেষাং পায়না ত্রিবিধা ক্ষারোদক তৈলেষু——তত্র ক্ষারপায়িতং শবশল্যাস্থিচ্ছেদনেষু। উদকপায়িতং মাংসচ্ছেদনভেদন পাটনেষু। তৈল পায়িতং সিরাব্যধন স্নায়ু ছেদনেষু। তেষাং নিশানার্থং শ্লক্ষ্ণশিলা মাষবর্ণা, ধারাণাং সংস্থাপনার্থং শাল্মলী ফলকম্"——

অর্থাৎ প্রয়োজনানুসারে শস্ত্র সমূহে তিন প্রকার পায়না (পান) দেওয়া হইয়া থাকে ক্ষারের পান, তৈলের পান ও জলের পান। কঠিন লৌহ, অস্থি প্রভৃতি ছেদনের জন্য যে খানে কড়া ধারের আবশ্যক সে খানে ক্ষারের পান দিবে। মাংসাদির ছেদন ভেদনের জন্য জলের পান ব্যবহার্য্য। সিরা স্নায়ু প্রভৃতি সুকোমল পদার্থের ছেদনাদির জন্য তৈলের পান দিবে। পান দেওয়ার পর পুনরায় মাষবর্ণ (বাগ্ভট বলেন মাষবর্ণ বা

[illegible]) [illegible] শান দিবে। এইরূপ শাণকে চলিত কথায়—
"ভেলশিন" (ইংরাজিতে Hone) বলে। সর্ব্বশেষে শাল্মলী ফলকের উপর ধারা সংস্থাপন (Stropping) করিবে।

বর্ত্তমান সময়ে ধারা সংস্থাপনের জন্য চর্ম্ম ব্যবহৃত হয়। শাল্মলী ফলকের বিশেষ সুবিধা কি তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক।

"যন্ত্র শস্ত্র সমূহের বিভাগ নানাবিধ চিত্র সহ আগামী বারে বর্ণিত হইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীগণনাথ সেন

দেশীয় পথ্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বাত শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক জ্বরে শীতল জল সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। এমন কি সান্নিপাতিক জ্বরে প্রবল দাহ, তৃষ্ণা কম্প মূর্চ্ছা এবং রক্ত লোচনতা প্রভৃতি বাত পিত্তোল্বণের লক্ষণ বর্ত্তমান সত্বেও স্বেদ দেওয়ার বিধান দৃষ্টহয়। যথা

সন্নিপাতে প্রকম্পন্তং প্রলপন্তং ন বৃংহয়েৎ।
তৃষ্ণা দাহাভিভূতেয় ন দদ্যাৎ শীতলং জলং॥
বাতপিত্তোল্বনে চৈব ঘৃতং যোজ্যং পুরাতনম্।
অভ্যঙ্গাৎ শময়ত্যাশু সন্নিপাত সুদারুণম্॥

সান্নিপাতিক জ্বরে রোগী তৃষ্ণা দাহ কম্পাদি দ্বারা একান্ত অভিভূত হইলেও শীতল জল পান কিংবা দুগ্ধাদি কোন বৃংহণ পানীয় ব্যবহার করিবেনা। বায়ু পিত্ত প্রকুপিত হইয়া তৃষ্ণা দাহ মূর্চ্ছা প্রলাপ প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত করিলে পুরাতন ঘৃত মালিস করিবে।

যদাহ সুশ্রুত—

মাতুলুঙ্গরসং কৃষ্ণা ক্বাথশ্চ একীকৃত্য মধুনা মধুরংকৃত্বা ধান্যরাশৌ মাসমেকং নিঃক্ষিপেৎ। মধুশুক্তনাম খ্যাতঃ শিরস্তাপ মোহ হিক্কা বমি নাশকারী শিরো লেপনে।

অন্যচ্চ—

জম্বীরস্য ফলরসং পিপ্পলীমূল সংযুতং।
মধুভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য ধান্যরাশৌ নিধাপয়েৎ।
মাসেন তজ্জাতরসং মধুশুক্তমুদাহৃতম্।

জামীরের রস পিপুলমূলের কল্কসহ মধুভাণ্ডে একমাস কাল ধান্য রাশির মধ্যে রাখিয়া কাপড়ে ছাকিয়া লইলে মধুশুক্ত উৎপন্ন হইল। ইহা মাথায় লেপন করিলে শিরস্তাপ মোহ হিক্কা প্রভৃতি উপসর্গ প্রশমিত হয়। এতদ্‌ব্যতীত চরকাদি গ্রন্থে নানাবিধ মুষ্টিযোগ লিখিত হইয়াছে এবং পিত্ত-জ্বরাধিকারে যে সকল প্রলেপ, উপনাহ লিখিত হইয়াছে, তাহা ব্যবহার করিলে সন্নিপাত জ্বরের তন্দ্রা মূর্চ্ছা প্রলাপ রক্ত লোচনতা প্রভৃতি উপসর্গ প্রশমিত হয়। বিস্তার ভয়ে সেই সকল মুষ্টিযোগ লিখিত হইলনা।

সন্নিপাত জ্বরে রোগী সংজ্ঞা হীন হইলেও তীক্ষ্ণ নস্য প্রয়োগ করনানন্তর সংজ্ঞা স্থাপন করিবে।

জ্বরিত ব্যক্তির জল পানের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ বিষয়ে আমরা কেবল মাত্র কতিপয় পুরাকালের মীমাংসিত বাক্য সংযোগ করিয়া প্রবন্ধ করিতেছি; কিন্তু বর্ত্তমান যুগের কোন ২ মনস্বিব্যক্তি বলেন যে, ইদানীং এদেশবাসীর শারীরিক মানসিক এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে এই সকল সর্ব্বতোভাবে প্রাচীন মীমাংসিত প্রথানুসরণ আমাদের পক্ষে সমীচিন নহে। যুক্তি যুক্ত পথানুসন্ধান ভিন্ন এই সমস্যা মীমাংসা করার উপয়ান্তর নাই বলিয়া দুই একটি কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। কিন্তু আমার মত লোকের স্থূল বুদ্ধিতে এই সকল গুরুতর বিষয়ের যুক্তি প্রদর্শন করিয়া পাঠকগণের তৃপ্তি সাধন করা সম্ভবপর নহে।

জড় পদার্থের সাধারণ ধর্ম্ম এই যে তাহা উষ্ণতায় দ্রবীভূত ও প্রসারিত শৈত্যে কঠিন ও সঙ্কুচিত হয়। জড় ধর্ম্মাবলম্বী মানব দেহের যে কোন অংশে অতিশয় শৈত্য প্রয়োগ করিবেন, তৎসংলগ্ন চর্ম্ম ও রোমকূপ সকল সঙ্কুচিত হইয়া স্বেদাগম পথ রুদ্ধ হয়, সুতরাং উপযুক্ত ঘর্ম্ম না হওয়াতে রোগীর জ্বর শান্তি হওয়ার এক প্রধান অন্তরায় উপস্থিত হয়, কারণ রোমকূপ জ্বরারম্ভক দোষ নির্গমনের প্রশস্ত পথ।

দ্বিতীয়তঃ দীর্ঘকাল শীতল জলের পট্টী ধারণ করিলে পট্টীসংলগ্ন ও তৎসন্নি-

হিত স্থানের বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মবহ স্রোত গুলি সঙ্কুচিত ও পিত্তশ্লেষ্ম কথঞ্চিৎ ঘনীভূত হয়। স্রোতের সঙ্কোচন হেতু সর্ব্বদেহচর বায়ুর সাধারণ গতির ব্যাঘাত হয় বলিয়া প্রথমতঃ বায়ু প্রকুপিত ও তৎপর পিত্ত কফও প্রকুপিত হইয়া অচির কাল মধ্যেই ত্রিদোষ প্রকোপের নানা প্রকার উপদ্রব উপস্থিত করে। কেননা মার্গাববোধ বায়ু প্রকোপের প্রধান হেতু। মানবদেহে বায়ু, পিত্ত কফের কর্ত্তৃত্ব বা প্রাধান্য এই বিষয়টি সকল সম্প্রদায়ের চিকিৎসকদের স্বীকার্য্য না হইলে ও শৈত্য ক্রিয়ার আতিশয্যে রক্ত বাহিনী শিরা ধমনী সঙ্কুচিতা ও রক্ত অপেক্ষাকৃত ঘনীভূত হইবে, এই বিষয় সকলেই স্বীকার করিবেন।

রক্তবাহিনী ধমনী সঙ্কুচিতা ও রক্ত ঘনীভূত হইলে ধমনীর ক্ষীণতা ও স্পন্দন সংখ্যার হ্রাস হওয়া অবশ্যম্ভাবী কিন্তু রোগীর জ্বরারম্ভক দোষের লাঘব ও উপসর্গাদি তিরোহিত না হইতে নাড়ীর ক্ষীণতা ও স্পন্দন সংখ্যা কমিয়া যাওয়া সন্নিপাত বা ত্রিদোষজ জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির মঙ্গল জনক নহে। এই জন্যই তরুণ জ্বরের রস-সামতার লাঘব না হইতে জ্বরঘ্ন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা অসঙ্গত বলিয়া কথিত হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ—সহর কিংবা সমৃদ্ধ পল্লী নিবাসী অবস্থাপন্ন রোগীতে "আইসব্যাগ" নামক রবর নির্ম্মিত থলিতে বরফ ব্যবহার হয় বলিয়া বরফের অপব্যবহার জনিত কোন উদ্‌বেগ সম্ভব হয়না কিন্তু পাড়াগায়ে কিংবা সহর-বাসী দরিদ্র পরিবারের মধ্যে সচরাচর আইসব্যাগ ভিন্নই শীতল জল বা বরফ ব্যবহার হইয়া থাকে। তাহাতে যতই সতর্কতা অবলম্বন করুন না কেন অধিকাংশ স্থলের রোগীর বালিশ হইতে আরম্ভ করিয়া বিছানার [illegible]ংশ কতকটা সিক্ত হইয়া যায়। তখন দুর্ব্বল রোগীর ভবিষ্যৎ অমঙ্গল [illegible]য়ই হউক কিংবা বিছানা পত্রের অসচ্ছলতা নিবন্ধনই হউক রোগীকে ন[illegible]ড়া করিয়া বিছানা পরিবর্ত্তন না করাতে কোন কোন রোগীর প্রতিশ্যা[illegible]স, শিরোবেদনা কর্ণশূলাদি উপসর্গ উপস্থিত হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিপিন বিহারী সেন [illegible]াজ

পঞ্চম বৈদ্যসম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ।

সভাপতি—লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল কাহ্নোয়া রনছোড়দাস
কীর্ত্তিকর আই, এম, এস, এফ, এল, এস, জে, পি,
(বোম্বাই) মহোদয় বিরচিত।

স্থান—মথুরা। (২০ ডিসেম্বর ১৯১৩)

মহাশয়গণ,

আপনারা আমাকে আপনাদেরই একজন মনে করিয়া বন্ধুভাবে এই সভার সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়া যে অসীম সম্মান প্রদান করিলেন, এজন্য আমি আপনাদিগকে হৃদয়ের ধন্যবাদ জানাইতেছি। আপনাদের এই বিরাট বৈদ্যসম্মেলনে মাদৃশ ব্যক্তির নির্ব্বাচন এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। আমার মনে হয় যে অপনারা কোন সূত্রে জানিতে পারিয়াছেন যে, বনস্পতি শাস্ত্র এবং নিঘণ্টু যাহা আয়ুর্ব্বেদেরই এক প্রধান অঙ্গ—এসকল শাস্ত্রে আমার সমধিক অনুরাগ আছে। বস্তুতঃ আর্য্যসন্তান হইয়া এবং ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ ও ভারতের জল বায়ুতে পরিপুষ্টতা লাভ করিয়াছি, এজন্যই ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যার প্রতি আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি রহিয়াছে। এই চিকিৎসা মানুষকে দুষ্ট রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। এই ভারতবর্ষই আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যার জন্মভূমি। ইনিই আবার গণনাতীত শতাব্দী হইতে আয়ুর্ব্বেদীয় সাহিত্যিকগণের ধাত্রীস্বরূপা হইয়া রহিয়াছেন। বর্ত্তমান ছোট খাট সাহিত্যিক দেখিয়াই মনে হয় যে, প্রাচীন সাহিত্যের কিরূপ গৌরব জনক আসন ছিল। এই যে উন্নতির যুগ পড়িয়াছে, এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য কাল ধর্ম্মানুসারে নিজস্ব বিদ্যা ও কলার যথোপযুক্তরূপে প্রচার ও সংবর্দ্ধন করিয়া যাহাতে লাভবান হইতে পারি তাহার চেষ্টা করা। তাহা না হয়তো পায়েয় উপর পা রাখিয়া চোখ বন্ধ করিয়া চুপ হইয়া বসিয়া থাকিতে হয় কিংবা কান বন্ধ করিয়া বলিতে হয়, আমাদের পুরাণ পবিত্র আয়ুর্ব্বেদে যা'

* বোম্বাইর প্রসিদ্ধ ডাক্তার কীর্ত্তিকর মহোদয়ের ইংরেজী ভাষায় লিখিত অভিভাষণ এলাহাবাদ আয়ুর্ব্বেদ মহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয় হইতে হিন্দী-ভাষায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা বাঙ্গালী পাঠকের জন্য উহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিলাম। সম্পাদক

কিছু লিখা আছে উহাই আমাদের মণি কাঞ্চন। কিন্তু ইহাও ঠিক যে উচিত রীতি অনুসারে রক্ষা করিতে না পারিলে কালক্রমে উহারাও প্রভাহীন হইয়া পড়িতে পারে। আমাদের মন্দিরে ভক্তিভাবে পূজিত স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, পিত্তলাদি নির্ম্মিত যে সকল শ্রদ্ধেয় দেবদেবী প্রতিমা বর্ত্তমান আছেন, যদি তাঁহাদেরও বরাবর পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা না থাকে তাহা হইলে সেই সকল দেব মূর্ত্তিতেও মরিচা ধরিতে পারে শুধু এই নিয়মেই আমাদের পূজ্য এবং প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যার তুলনা করা অন্যায় নহে।

আমাদের সহযোগিবিদ্যা রসায়নশাস্ত্র (Chemistry) বিদ্যুৎশাস্ত্র (Electricity) সূক্ষ্ম কীটানুশাস্ত্র (Bactriology) বনস্পতিশাস্ত্র (Botany) প্রভৃতি অনুসন্ধান করিলেই প্রতীতি হয় যে, অর্ব্বাচীন ডাক্তারী শাস্ত্রের ভিত্তি উহাতেই স্থাপিত।

বৈদ্যক চিকিৎসা শাস্ত্রে আশ্চর্য্য বৈদ্যুতিক প্রয়োগ।

যাহাকে রণ্টজেন রেজ (RontJen Rays) কহে। ইহার আবিষ্কার ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম কামরেড রণ্টজেন নামক এক ব্যক্তি করিয়াছেন। ইহাকে এক্স রেজ (X-Rays) বলিয়া থাকে। ইহার উপযোগ—ভগ্নাস্থি, দেহ প্রবিষ্ট গোলাগুলী প্রভৃতি ও গলমধ্যস্থ অদৃশ্য মৎস্য কণ্টকাদি নিশ্চয় করিবার জন্যই বিশেষ ভাবে কার্য্যকরী হইয়া থাকে। উক্ত বৈদ্যুতিক কিরণজালের চিকিৎসা চর্ম্মসম্বন্ধীয় রোগের উপর বিশেষ ক্রিয়া প্রদর্শন করে। বিশেষত্ব এই, যে রোগ দীর্ঘকাল যাবৎ উৎপন্ন হইয়াছে, সে স্থলেই ইহা সমধিক উপযোগী। এই কিরণ দ্বারা অন্যান্য দুষ্ট রোগও প্রশমিত হইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, রস বাহিনী নাড়ীতে কোন গ্রন্থি হইলে উহা প্লীহা এবং "থাইরাইড" নামক গ্রন্থি বৃদ্ধি পাইলে এহ কিরণ প্রয়োগে উত্তম ফল পাওয়া যায়। ভগন্দরের বিশেষ ২ অবস্থায় ইহার প্রয়োগ দোষ শান্তি হইতে দেখা গিয়াছে। উক্তরোগের মধ্যেই যাহাকে রোডেণ্ট ক্যান্সার (Rodent cancer এক বিশেষ ভগন্দর) কহে অন্যান্য এমন অনেক প্রাণ নাশক ক্ষত আছে যাহাতে এই চিকিৎসা সম্যক্ উপযোগী সন্দেহ নাই। অধিকাংশ স্থলে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া থাকে। যদি কোন রোগ দেহ মধ্যে গাঢ় ভাবে নিবদ্ধ না হয়, তবে নিশ্চয় এই প্রক্রিয়া দ্বারা রোগ আরোগ্য হইবে। উক্ত কিরণ প্রয়োগে বিদ্যুতের মন্দ প্রভাবও

সময় সময় লক্ষিত না হয় এমন নহে। (H. L. J. in En. Br, Volume 28th. (Page 38, 11th Edition) যেহেতু বহুকাল এই কিরণ প্রয়োগের ফলে ইহার মন্দ ফলও অনুমিত হইয়াছে। বিচার করিয়া দেখিলে কোন কোন রোগে ইহার আশ্চর্য্য ফল যে দেখা যায় না, এমন নহে। দেখা যায় এক চর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিশেষ ২ রোগে ইহার ক্রিয়া বর্ত্তিয়া থাকে। আজকাল পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে য়ুটরস (uterus) মধ্যে ফোড়া হইলে ইহার প্রয়োগে উপকার হইয়া থাকে। এই আবিষ্কার সম্বন্ধে মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। (ক্রমশঃ)

তেজ ও পিত্ত।

ভৌতিক জ্ঞান পঞ্চধা বিভক্ত, ক্ষিতি অপ্, তেজ মরুৎ ব্যোম এই পাঁচটি স্থূলভূত। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি উহাদের গুণ। আমরা ক্ষুদ্র জীব, নিরন্তর ঐ পঞ্চগুণের সহিত সংযুক্ত। গন্ধগুণ গন্ধগুণাত্মক নাসিকা, রসগুণ রসাত্মক রসনা, রূপগুণ নেত্র, স্পর্শগুণ স্পর্শাত্মক ত্বক্‌ও শব্দগুণ শব্দাত্মক শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রহণ করে। কেহ কেহ বলেন যে, আকাশ বা ব্যোম কিছুই নহে, শূন্য কিন্তু এই অভি মত সঙ্গত নহে ; আমাদিগের জ্ঞানেন্দ্রিয় যখন মোটে পাঁচটি এবং সেই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা যখন আমাদিগের জগৎজ্ঞান পর্য্যন্ত হইতেছে, তখন ব্যোম বা আকাশ না থাকিলে, শব্দ ও শব্দেন্দ্রিয়ের অভাব হয়। আমাদিগের দেহ ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুপরমাণু দ্বারা আমাদিগের দেহাবয়বগঠিত। বহির্জগতের সহিত দেহের এইরূপ সাধর্ম্ম্য না থাকিলে, জগদ্জ্ঞান আমাদিগের পক্ষে সম্ভবপর হইতনা। যেমন চক্ষুর সমধর্ম্মা সূর্য্য না থাকিলে দর্শন জ্ঞানের অভাব হইত, তদ্রূপ মনের ন্যায় বহির্জগতে একটা কিছু না থাকিলে, আমাদিগের মানসিক ব্যাপার অচল হইত। তবে বহির্জগতের সেই ২ ক্ষুদ্র পদার্থ দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে রূপান্তরিত অবস্থায় আছে। চক্ষুতে সূর্য্যের তেজ অবস্থান করে, কিন্তু সূর্য্যের তেজে ও চক্ষুর তেজে আকারগত পার্থক্য থাকিলেও ক্রিয়ার পার্থক্য নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অগ্নি পৃথক্ পদার্থ নহে সূর্য্যের ঘনীভূত তাপ, উহা শরীরে পিত্তের অন্তর্গত থাকিয়া শারীরিক ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে। চরকে দেখিতে পাই——

অগ্নিরেব শরীরে পিত্তান্তর্গতং কুপিতাকুপিতঃ শুভাশুভানি করোতি। তদ্ যথা—"পক্তিমপক্তিং দর্শনমদর্শননং মাত্রামাত্রত্বমুষ্মণঃ প্রকৃতির্বিকৃতির্ব্বর্ণঃ শৌর্য্যং ভয়ং ক্রোধং হর্ষং মোহং প্রসাদমিত্যেবমাদীনি চাপরাণি দ্বন্দ্বাদীনীতি অর্থাৎ অগ্নিই শরীরস্থ পিত্তে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কুপিত হইলে অশুভ এবং কুপিত না হইলে শুভফল প্রদান করে। তাহা এই যথা—পরিপাক, অপাক, দর্শন, অদর্শন শারীরিক তাপের মাত্রার সমতা ও বিষমতা, প্রকৃতি, বর্ণ অবর্ণ, শৌর্য্য, অশৌর্য্য, ভয়, অভয়, ক্রোধ, অক্রোধ, হর্ষ, অহর্ষ, মোহ, ও অপ্রসাদ ইত্যাদি এবং এইরূপ অপরাপর আরও অনেক লক্ষণ আছে। আমি পূর্ব্বেই প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া দেখাইয়াছি যে, অগ্নি বা দীপালোক পার্থিব নহে, সূর্য্যের ঘনীভূত উত্তাপ। কিন্তু ঐ ঘনীভূত তাপ বা স্থূল অগ্নি আমাদিগের দেহে থাকিতে পারে না, তজ্জন্য দ্রবাত্মক পিত্তে উহার মৃদু তেজ শরীরে অবস্থান করে। ইহাই অগ্নির রূপান্তরিত অবস্থা। একই সূর্য্যের তেজ এইরূপে বিভিন্ন আকারে আমাদিগের দেহে অবস্থান করে। বহির্জগতে সূর্য্য যেমন স্বীয় আদান গুণ দ্বারা পৃথিবীর, প্রাণিজগতের ও উদ্ভিজ্জগতের রস শোষণ করেন এবং সেই রস শোষণেরফলে পৃথিবী, প্রাণিজগৎ ও উদ্ভিদ জগৎ লঘু ও কোমল হয়, তদ্রূপ শরীরের পিত্তদ্বারা ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় অর্থাৎ ভুক্ত দ্রব্য লঘুও কোমল হইয়া রসরক্তাদিরূপে পরিণত হয়। আবার যেমন সূর্য্যদেব প্রকৃতিস্থ না থাকিলে, ঐ সকল বস্তুর রস-শোষণ ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে, তদ্রূপ পিত্ত প্রকৃতিস্থ না থাকিলে ভুক্তদ্রব্য পরি-পাকের ব্যাঘাত ঘটে। অথবা অগ্নি স্ব-ভাবে অবস্থান করিলে, যেমন ডাল ভাত তরকারী প্রভৃতি সুসিদ্ধ হয়, তদ্রূপ পিত্ত প্রকৃতিস্থ থাকিলে ভুক্ত দ্রব্য সুপরি পক্ক হয়। ইহাই পাক। আবার যেমন নিস্তেজ অগ্নিতে ডাল ভাত সুসিদ্ধ হয় না, তদ্রূপ পিত্ত নিস্তেজ হইলে, ভুক্তদ্রব্য সুচারুরূপে পরিপক্ক হয় না, ইহাই অপাক।

অগ্নি পিত্তে অধিষ্ঠিত। পিত্ত দ্বিবিধ, নীলও পীত, পীতবর্ণ পিত্ত চক্ষুর্দ্বয়ে অধিষ্ঠিত, রাত্রিকালে অগ্নি বা দীপালোকের সাহায্যে চক্ষুদ্বারা রূপ দর্শন হয়। চক্ষুতে ঐ পিত্ত আছে বলিয়াই চক্ষু রূপ দর্শনে সমর্থ। যেমন অগ্নি বা দীপালোক সতেজ থাকিলে, উজ্জ্বল আলোকে বস্তুজাত উত্তমরূপে দৃষ্টি গোচর হয়, তদ্রূপ

নেত্রগত আলোচক পিত্ত সতেজ থাকিলে দর্শন ক্রিয়া উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হয়। আবার যেমন অগ্নি বা দীপালোক নিস্তেজ হইলে বস্তুজাত উত্তমরূপে আলোকিত হয় না, তদ্রূপ আলোচক পিত্ত নিস্তেজ হইলে দর্শনের ও ব্যাঘাত ঘটে। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, অগ্নিই যদি পিত্তে অধিষ্ঠিত থাকে, তবে রাত্রিকালেই তৎসাহায্যে রূপ দর্শন সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু দিনে কিরূপে দর্শন ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়? পূর্ব্বেই বলিয়াছি সূর্য্যের আলোক ও অগ্নির আলোক ভিন্ন পদার্থ নহে, তজ্জন্যই চক্ষু দ্বারা দিনেও দর্শন হয়, রাত্রিকালেও দর্শন হয়, সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, চক্ষুতে সূর্য্যালোক ও অগ্নির আলোক এই উভয় আলোকের শক্তিই বিদ্যমান, পরন্তু ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তাপ ও অগ্নির আলোক একই পদার্থ এবং অগ্নি পার্থিব পদার্থ নহে, তৈজস। অগ্নির আলোকের মূলে ঘনীভূত উত্তাপ, ঘনীভূত উত্তাপের মূলে তাপ এবং তাপের মূলে তেজ নিহিত, তেজ সূর্য্য মণ্ডলের শক্তি বিশেষ। সুতরাং সূর্য্যালোক অগ্নির আলোকও চক্ষুর সতেজ অবস্থায় উত্তম দর্শন হয় এবং উহারা নিস্তেজ হইলে দর্শনের ও ব্যাঘাত ঘটে। এইরূপ সূর্য্যতেজ বা অগ্নি পিত্তে অধিষ্ঠিত আছে বলিয়াই শারীরিক উষ্মার সমতা ও বিষমতা ঘটে। কারণ উষ্মা তাপ। এই উষ্মা পিত্তে বিদ্যমান, "উষ্মা পিত্তাদৃতে নাস্তি" পিত্ত ব্যতীত উষ্মা নাই। পিত্ত প্রকৃতিস্থ থাকিলে শারীরিক তাপের সমতা রক্ষিত হয় ও শরীর সুস্থ থাকে, কিন্তু পিত্ত প্রকুপিত হইলে তাপের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। যেমন জ্বর, জ্বরে শারীরিক উষ্মা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য থার্ম্মামিটার বগলে দিলে পারদ ঐ যন্ত্রের উর্দ্ধে উঠিয়া যায়, আবার কোন কোন জ্বরে জ্বর বিচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে পারদ ৯৬।৯৭ ডিগ্রীতে নামিয়া যায়। ৯০ ডিগ্রীর উপরে তাপ উঠা ও নীচে তাপ নামিয়া যাওয়া উভয়ই প্রকৃতির বিকৃত ভাব। পিত্ত প্রকৃতিস্থ থাকিলে এরূপ হয়না। পারদের এই নামা উঠাকে তাপের হ্রাস বৃদ্ধি বলাযায়। বর্ণ তেজের অন্তর্গত বলিয়া তৈজস পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আদিবর্ণ চতুর্ব্বিধ, শুক্ল, কৃষ্ণ, নীল ও পীত। যেমন সূর্য্যের তেজ চক্ষুতে নিহিত, তদ্রূপ ঐ চতুর্ব্বিধ বর্ণও চক্ষুতে নিহিত। পিত্ত প্রকৃতিস্থ থাকিলে বর্ণও প্রকৃতিস্থ থাকে, অন্যথা বর্ণ বিপর্য্যয় ঘটে। এইরূপ শূরত্ব, অভয়, অক্রোধ, হর্ষ, অমোহ ও প্রসাদ পিত্ত অবিকৃতির ফল এবং অশৌর্য্য, ভয়,

ক্রোধ, অহর্ষ, মোহও পিত্তের অপ্রসন্নতা পিত্ত বিকৃতির ফল। পিত্ত দ্বিবিধ. নীল ও পীতবর্ণ।

পিত্তমুষ্ণং দ্রবং পীতং নীলং সত্ত্বগুণোত্তরম্।
সরং কটু লঘু স্নিগ্ধং তীক্ষ্ণমম্লন্তুপাকতঃ॥
পীতাম্নিরামঃ নীলং সামম্।

পিত্তের স্বরূপ বলা যাইতেছে।

পিত্ত—উষ্ণ, দ্রব, পীত ও নীলবর্ণ, অর্থাৎ নিরাম পিত্ত পীতবর্ণ, সাম পিত্ত নীলবর্ণ। উভয় পিত্তই সত্ত্বগুণাত্মক, সারক, কটুরস, লঘু, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ এবং অম্ল বিপাক।

একং পিত্তং বাতবন্নামস্থানকর্ম্মভেদৈঃ পঞ্চাবিধম্।
তেষাং পিত্তানাং নামান্যাহ॥
পাচকং রঞ্জকঞ্চাপি সাধকালোচকে তথা।
ভ্রাজকঞ্চেতি পিত্তস্য নামানি স্থান ভেদতঃ॥

এক পিত্ত বায়ুর ন্যায় নাম, স্থান ও কর্ম্মভেদে পঞ্চপ্রকারে বিভক্ত যথা—পাচক, রঞ্জক, সাধক, আলোচক ও ভ্রাজক।

অগ্ন্যাশয়ে যকৃৎপ্লীহ্নো হৃদয়ে লোচনদ্বয়ে।
ত্বচি সর্ব্ব শরীরেষু পিত্তং নিবসতি ক্রমাৎ॥

পাচকাদি পিত্তের স্থান বলা যাইতেছে।

অগ্ন্যাশয়ে,—যকৃৎ ও প্লীহাতে, হৃদয়ে, নেত্রদ্বয়ে ও সর্ব্বশরীরস্থ চর্ম্মে, এই সকল স্থানে যথাক্রমে পাচক, রঞ্জক, সাধক আলোচক এবং ভ্রাজক পিত্ত অবস্থিতি করে, অর্থাৎ পাচক পিত্ত অগ্ন্যাশয়ে, রঞ্জক পিত্ত যকৃৎ ও প্লীহাতে, সাধক হৃদয়ে, আলোচক নেত্রদ্বয়ে ও ভ্রাজকপিত্ত সর্ব্বশরীরস্থ চর্ম্মে অবস্থিতি করে।

পাচকং পচ্যতে ভুক্তং শেষাগ্নি বল বর্দ্ধনম্।
রস মূত্র পুরীষাণি বিরেচয়তি নিত্যশঃ॥

পাচক পিত্ত ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক করে এবং অপরাপর অগ্নির (ভূতাগ্নির ও ধাত্বগ্নির) বলবৃদ্ধি করে এবং রস, মূত্র ও মলকে পৃথক্ করিয়া থাকে।

রঞ্জকং নাম যৎ পিত্তং তদ্রসং শোণিতং নয়েৎ।

যে পিত্ত দ্বারা আহারজাত রস রঞ্জিত বা রক্তাকারে পরিণত হয়, তাহার নাম রঞ্জক পিত্ত।

যত্তু সাধকসংজ্ঞং তৎকুর্য্যাদ্ বুদ্ধিং ধৃতিং স্মৃতিম্।

'ধৃতিং' মেধাং।

যে পিত্ত দ্বারা, বুদ্ধি, মেধা ও স্মৃতি জন্মে, তাহাকে সাধক পিত্ত বলা যায়।

যদালোচকসংজ্ঞং তদ্রূপ গ্রহণকারণম্।

যে পিত্তের দ্বারা রূপ দর্শন কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহার নাম আলোচক পিত্ত।

ভ্রাজকং কান্তিকারী স্যাল্লেপাভ্যঙ্গাদি পাচকম্।

ভ্রাজক পিত্ত শরীরের শোভা সম্পাদক এবং প্রলেপ ও অভ্যঙ্গ দ্রব্যের পরিপাক কারক।

নীল ও পীত দ্বিবিধ পিত্তই উষ্ণ, দ্রব, সত্ত্ববহুল, সারক ও লঘু। তেজের লক্ষণে দেখিতে পাই "যত্তুষ্ণং তত্তেজঃ" সুতরাং পিত্ত যে উষ্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই। দ্রব শব্দে তরল। অপ তরল, উষ্ণতেজ লঘু পদার্থ, সুতরাং গুরু তরল অপের আবরণ ও আকর্ষণ ব্যতীত ঐ তেজ একস্থানে থাকিতে পারে না তজ্জন্য উহা অপের আবরণে আবৃত থাকে। চক্ষুর কৃষ্ণ অংশের মধ্যস্থ রেখার ন্যায় পীতবর্ণ পদার্থ টুকু পিত্ত। ঐ পিত্ত আবার শ্লৈষ্মিক পরদা দ্বারা আবৃত। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, চন্দ্র মণ্ডলের ঊর্দ্ধে সূর্য্য মণ্ডল অবস্থিত এবং অপের আপ্যায়নী শক্তির প্রভাবে সূর্য্যের প্রখর তাপের সমতা রক্ষিত হয়। যেমন তৈল ও বর্ত্তির নিম্নাকর্ষণে দীপালোক নিয়মিত হয়, তদ্রূপ চন্দ্রমণ্ডলের নিম্নাকর্ষণে সূর্য্যমণ্ডল নিয়মিত হয়। জ্যোতিষ শাস্ত্রে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। "ছাদকো ভাস্করস্যেন্দু রধঃস্থো ঘনবদ্ভবেৎ।" অর্থাৎ অধঃস্থ মেঘের ন্যায় চন্দ্র সূর্য্যের আচ্ছাদক। পিত্ত সত্ত্ব বহুল, সত্ত্বগুণ লঘু ও প্রকাশক, পিত্তও সূর্য্যালোক বা অগ্নির ন্যায় লঘু ও প্রকাশক, সুতরাং লঘুতাবশতঃ দেহের ঊর্দ্ধগামীও হয় এবং অপের সহিত সংযুক্ত বলিয়া গুরুতা-বশতঃ অধোগামীও হয়। দেহের ঊর্দ্ধে হৃৎপিণ্ডে যে পিত্ত অবস্থান করে, তাহাকে সাধক পিত্ত বলে। বুদ্ধি, মেধা, স্মৃতি, শৌর্য্য প্রভৃতি ঐ পিত্তের ক্রিয়া। যকৃতে যে পিত্ত থাকে, তাহাই রঞ্জক-পিত্ত, ঐ পিত্ত দ্বারা ভুক্ত দ্রব্যের রস রঞ্জিত হইয়া রক্তে পরিণত হয়। অগ্ন্যাশয়ে যে পিত্ত থাকে, তাহা পাচক পিত্ত, তদ্দ্বারা ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হয়। সর্ব্বশরীরস্থ ত্বকে যে পিত্ত থাকে, তাহাই ভ্রাজক পিত্ত, উহা শরীরের শোভা, বর্ণ ও লাবণ্য সম্পাদক

এবং অঙ্গে মর্দ্দিত তৈলাদির পরিপাচক। চক্ষে যে পিত্ত অবস্থান করে, তাহা আলোচক, উহা দ্বারা রূপ দর্শন হয়। পিত্ত প্রকৃতিস্থ থাকিলে, শরীর সুস্থ থাকে, বিকৃত হইলে, শরীর অসুস্থ হয়। ঐ পঞ্চ স্থান পিত্তের প্রধান স্থান, ঐ পঞ্চস্থলে থাকিয়া পিত্ত সমস্ত শারীরিক কার্য্য নির্ব্বাহ করে। সুস্থ শরীরে হরিদ্রা বর্ণের মল নির্গত হয়। ইহাই পীতবর্ণ পিত্ত। আমাশয়ে নীল বর্ণের যে পিত্ত মলের সহিত নিঃসৃত হয়, তাহাই অপক্ক বা নীলবর্ণ সাম পিত্ত। এই পিত্তে বহির্জ্জগতের সূর্য্যতেজ অবস্থিত।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ।
১৭নং কাশীদত্ত ষ্ট্রীট, নিমতলা, কলিকাতা।

পল্লী-চিকিৎসক।

অষ্টম অধ্যায়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সু—পা, ফাটার ঔষধ কি ?

হ—বটের আঠা বা আমের আঠা লাগাইলে ভাল হয়।

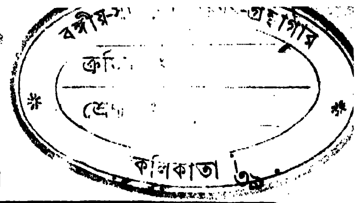
সাদা ধুনার গুড়া ও ঘৃত সমভাগে পাথরে মাড়িয়া রৌদ্রে সূর্য্যপক্ক করিয়া পা-ফাটায় দিয়া অগ্নিতাপ দিলে শীঘ্রই ভাল হইবে। হাত ফাটিলে বা চর্ম্ম উঠিতে থাকিলেও এই ঔষধ দিলে ভাল হয়।

নেকড়ার সলিতা করিয়া সর্ষপ তৈলে ভিজাইয়া বাতির আগুণ ধরাইয়া উহা দ্বারা ফাটাস্থানে আবৃত দিতে থাকিলে সহজেই ফাটাস্থানের ঘা শুকাইয়া যায়।

সু—কুনখ বা কুনীর ঔষধ কি ?

হ—সচরাচর নখে মাটি প্রবেশ করিয়াই কুনী জন্মায়, কাজেই যাহাতে নখ পরিষ্কার থাকে তাহা করিবেন। স্নানকালে নখমূলে সর্ষপতৈল দিতে হয়, তাহা হইলে আর কুনী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

পাপরি খয়ের ও পানের বোটা একত্র বাটিয়া কুনীতে লাগাইলে নিশ্চয় আরোগ্য হয়।



অপরাজিতা ফুলের পাতার রস অথবা তার্পিন তৈল দিলেও সারে।

ডালিম পাতা, খয়ের ও সামান্য পরিমাণ কলিচূণ লাগাইয়া তিন দিন পরে খুলিতে হয়। জল লাগাইবেন না। জল না লাগান অসম্ভব হইলে স্নানকালে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করিয়া ধুইবেন এবং স্নানান্তে পুনঃ উক্ত ঔষধ বান্ধিবেন। তিন দিনে আরোগ্য। যে কুনীই হউক না কেন এ ঔষধে যাইবেই যাইবে। চূণ এর পরিমাণ খয়েরের অর্দ্ধেকের বেশী না হয়।

সু—কানের পাতায় এক প্রকার ঘা হয় ও উহা হইতে বড়ই ক্লেদ বাহির হইতে থাকে এবং কানের চারি পাশ ঘা হইয়া যায় ও বিষম চুলকায়, ইহা ছেলেপিলের অধিক হইতে দেখা যায়। উহার কি ঔষধ?

হ—চলিত কথায় আমরা উহাকে "কান পেচকি" বলি, তাই ত?

সু—হাঁ।

হ—পান চিবাইয়া (মসলা সংযুক্ত) উহার রস ক্ষতস্থানে দিলে উহা সারে

আমগাছের শুক্‌নো ডালে কানের মত এক প্রকার জিনিষ দেখা যায়— উহাকে স্থল বিশেষে "আমের কান" বলে। উহা পোড়াইয়া, ঐ ছাই ক্ষতস্থানে দিলে ভাল হয়।

মাতুল যদি খাওয়া দাওয়ার পর আচমন করিয়া কুল্লীকৃত জল ভাগিনেয়ের কর্ণক্ষতে দেয় তবেও দেখিয়াছি উহা সারে।

সু—অরুংষিকা রোগের ঔষধ বল?

হ—কথা বুঝিলাম না।

সু—উহা এক প্রকার শিরোগত ব্রণ মস্তকস্থ ব্রণ সকল পাকিয়া বহুধা বিদীর্ণ হইয়া যায় ও ক্লেদ নিঃসৃত হইতে থাকে।

এখানেত দেখি মেজেণ্ট রং দ্বারা মাথা রং করিয়া দেয়। ২।১ স্থলে যে ফল দেখা না যায় এমন নয়, তবে সন্তোষ জনক ফল বড় ইহাতে পাওয়া যায় না।

অবিকৃত রস গন্ধ ও বর্ণযুক্ত কুড়কাষ্ট খণ্ড খণ্ড করিয়া মৃৎপাত্রে মৃদু সন্তাপে ভাজিবেন, কৃষ্ণবর্ণ হইলে চূর্ণ করতঃ তিলতৈল সহ মিশাইয়া ব্রণ স্থানে প্রলেপ দিবেন। প্রদত্ত প্রলেপ শুকাইলে উহা গরম জলে ধুইয়া ফেলিবেন এবং পুনঃ নূতন প্রলেপ দিবেন; দিবসে ৩।৪ বার প্রযোজ্য ৪।৫ দিনে নিঃশেষে আরোগ্য হয়।

সু—বর্ষাকালে পায়ের আঙ্গুলের ফাকে এক প্রকার ঘা হয় উহার ঔষধ বল।

হ—হাঁ, উহাকে আমরা প্যাঁকায় খাওয়া বা প্যাঁকায় ধরা বলি। কেরোসিন তৈল প্রয়োগ করিলে উক্ত ক্ষত সারে।

আদা সহ কুঁচুরিয়া ডাটার মূল বাটিয়া উক্ত ক্ষতে দিলেও আরোগ্য হয়।

সু—বর্ষাকালে,—গৃহস্থবর্গের প্রায় সকল সময়েই পায়ের তলায় ছিদ্র হইয়া যায়, যদি কোনও শক্তদ্রব্যে পাড়া দেওয়া যায় তবে বেথা লাগে উহা দূর করিবার কিছু আছে কি ?

হ—তালগাছের শুকনা গোড়ায় ঘষিয়া ২ পা ধুইলে উক্ত রোগ প্রশমিত হয় ও বেদনা কমিয়া যায়। আমরা ইহাকে "সুত প্যাকা" বলি।

তিক্ত পটল (তিত পটল) আনিয়া উক্ত ফল পদতলে ফেলিয়া পাড়াইলে উহার রস পায়ে শুষিতে থাকে, ইহা দ্বারা উক্ত রোগ দূর হয়।

আজ এই পর্য্যন্ত এখন তবে আসি।

সু—আচ্ছা, ভুলোনা যেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীগোপীনাথ দত্ত।
(রাজাবাড়ী ঢাকা)

উপেক্ষিত লতা গুল্মাদি।

৩। স্বর্ণুলী ও গাঁধল্যা (সিয়াল কাঁটা)।

স্বর্ণুলী চরকাদি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে উল্লেখ দেখা যায় না, কেবল রাজ নির্ঘণ্টুতে স্বর্ণুলীর নাম ও গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। স্বর্ণুলী ক্ষুপ বিশেষ। হেম পুষ্পী, স্বর্ণ পুষ্পীও অধ্বজা এই তিনটি স্বর্ণুলীর নামান্তর এবং কটু তিক্ত কষায় ও ব্রণাপহ। স্বর্ণবৎ পুষ্প বিশিষ্ট অধ্বজক্ষুপ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বাচার্য্যগণকে স্বর্ণুলী ব্যবহার করিতে দেখা যায় না, সুতরাং কোন্‌টী যে স্বর্ণুলী তাহা নির্দ্ধারণ করা সহজ সাধ্য নহে। অব্যবহৃত দ্রব্যের গুণাগুণ ব্যবহার না করিলে জানা যায় না। প্রায়শঃ সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া

যায়। শীতের প্রারম্ভে পথের সন্নিকটে পতিতভূমিতে ফলপাকান্ত এক প্রকার ক্ষুপ জন্মিয়া থাকে, উহা উচ্চে দুই হস্ত পরিমিত, পত্র অর্দ্ধহস্ত পরিমিত দীর্ঘ, বৃন্ত হইতে অগ্র পর্য্যন্ত উভয় পার্শ্বে ঈষৎ বিভক্ত এবং তীক্ষ্ণ কণ্টকময়। পত্র মধ্যস্থ শিরার পার্শ্বে ঈষৎ শ্বেতাভ; অবশিষ্টাংশ হরিৎবর্ণ। কাণ্ড বৃত্ত (গোল) প্রায়শঃ অঙ্গুষ্ঠবৎ স্থূল, শ্বেতাভ; অগ্রভাগ শাখা বিশিষ্ট, পুষ্প ফাল্গুন মাসের প্রথম হইতে প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। পুষ্পদল ছয়টী ফলকে বেষ্টন করিয়া থাকে। পুষ্পের বর্ণ হেম অর্থাৎ স্বর্ণ বর্ণের ন্যায় (পীতাভ) ফল গোস্তন সদৃশ কণ্টকময়। চৈত্র মাস হইতে ফল পরিপক্ক হইতে থাকে, বীজ সর্ষপাকৃতি কৃষ্ণবর্ণ। পক্ক হইলে ফলের ঊর্দ্ধ দেশ চারি ভাগে বিভক্ত হওয়ায় বীজ পতিত হয়। বীজে তৈল আছে, তৈলে গন্ধকের ঈষৎ গন্ধ পাওয়া যায়। আমাদের দেশে বর্ণিত ক্ষুপকে গাঁধিল্যা বা শিয়াল কাঁটা বলিয়া থাকে। রক্ত পরিষ্কারক জন্য লোকে ইহার কাণ্ড দ্বারা ব্যঞ্জন পাক করিয়া খাইয়া থাকে। গাঁধিল্যার কাণ্ড কাটিলে হরিদ্রাভ ক্ষীর নির্গত হয়। এই ক্ষীরে পাঁচড়ার ক্ষত শুষ্ক হয়। বীজতৈলেও ক্ষত শুষ্ক হয়। স্বর্ণূলী অধ্বজ অর্থাৎ পথসমীপজ, গাঁধিল্যাও পথ সমীপজ। স্বর্ণূলী—হেমপুষ্পী অর্থাৎ স্বর্ণ বর্ণ পুষ্প বিশিষ্টা। গাঁধিল্যার পুষ্পও তৎসদৃশ বর্ণ বিশিষ্ট।

স্বর্ণূলীর গুণের মধ্যে কষায় ও ব্রণাপহ গাঁধিল্যাতে বর্ত্তমান আছে,ব্যবহারে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

সুতরাং রাজনির্ঘণ্টুতে স্বর্ণূলীর বর্ণনা এবং গুণ যেরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, গাঁধিল্যার উৎপত্তিস্থান, পুষ্প ও গুণ তৎসদৃশ। সুতরাং গাঁধিল্যাই স্বর্ণূলী এরূপ বলা অসঙ্গত নহে, গ্রন্থ লিখিত নাম এবং ভাষানামে অনেক স্থলে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। অতএব স্বর্ণূলীর ভাষা নাম গাঁধিল্যা বা শিয়াল কাঁটা হওয়া অসম্ভব নহে।

কবিরাজ শ্রীকুমুদনাথ সেন
ব্যাকরণতীর্থ বৈদ্যরত্ন।
নাটোর।

আহরণ।

—০)*(০—

চায়ের দোষ গুণ—

এদেশে চা সেবীর সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। চা, চুরুট, কাফি, কোকেইন প্রভৃতি কতগুলি দ্রব্য এদেশীয় অনেকেরই এখন নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মানুষ ইহাদের অযথা অভ্যাস করে কেন, এবিষয়ে ইতঃপূর্ব্বে আমরা আহার সমস্যা প্রবন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া ছিলাম। দ্রব্যের দোষগুণ যাহাই থাকুক না কেন অনেক জিনিষই অভ্যাসের ফলে সাত্ম্য হইয়া দাঁড়ায় অর্থাৎ দোষগুণ সহজে বুঝিবার আর উপায় থাকে না।

প্রাচীন কালে এদেশে চায়ের ব্যবহার ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। যখন এদেশে চা লব্ধপ্রসর হইয়া পড়িল, তখন আয়ুর্ব্বেদকারও ইহার গুণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। যেমন ঃ—

শ্লেস্মারি গিরিভিচ্ছামপর্ণ্যতন্দ্রী স্ত্রিয়ামুভে।
শ্লেস্মারিপত্রং কফঘ্নং স্বেদনং বলবর্দ্ধনম্॥
প্রতিশ্যায় হরং প্রোক্তং জ্বরঘ্নং কামদীপনম্।
কাস সংহরণং বহ্নি দীপনং জাড্য নাশনম্।
ফাণ্টোঽস্য সিতয়া যুক্তঃ সেব্যো নৈরুজ্যমিচ্ছতা॥

চায়ের নাম—শ্লেস্মারি, গিরিভিৎ, শ্যামপর্ণী ও অতন্দ্রী।

গুণ বা আময়িক প্রয়োগ—ইহার পত্র কফঘ্ন, ঘর্ম্মকারক, বলবর্দ্ধক, প্রতিশ্যায় নিবারক জ্বরঘ্ন, কামোদ্দীপক, কাস নিবারক, অগ্নিদীপক ও শরীরের জড়তানাশক। ইহার ফাণ্ট শর্করা সহ সেবনীয়। ইহাতে কিন্তু কোন দোষের উল্লেখ নাই, কিন্তু দেখা যায় ইহা যেমন কাস নাশক তেমনি সময় ২ কাসজনকও হইয়া থাকে। অবশ্য এই গুণ বিচার ঔষধরূপে এবং রোগের প্রতি, পরন্তু নিত্য সেবীর পক্ষে নহে। এখন কথা হইতেছে নিত্যসেবীদের নিয়া, আজ আমরা "ব্যবসা ও বাণিজ্য" নামক মাসিকপত্র হইতে এসম্বন্ধে সুচিন্তিত

ও সারগর্ভ একটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিলাম। আমরা এ বিষয়ে সময়ান্তরে আরও আলোচনা করিব ইচ্ছা রহিল।

"সকলেই জানেন চা একপ্রকার গাছের পাতা। আমরা যেরূপ নিমপাতা খাই, সোণামুখীর পাতা জলে ভিজাইয়া জোলাপ লই, পাট পাতা বা নালতে পাতা ভিজাইয়া অজীর্ণ ও ক্ষুধামন্দ রোগে পান করি, ঠিক সেইরূপ শরীরের বিশেষ অবস্থায় চা গরম জলে ভিজাইয়া পান করিয়া থাকি। বাজারে সচরাচর দুইপ্রকার চা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম কৃষ্ণ চা দ্বিতীয় হরিৎ চা। পূর্ব্বে লোকের সংস্কার ছিল যে কৃষ্ণ চা, ও হরিৎ চা ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন হয়, কিন্তু ইহা প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন হইলেও একইপ্রকার বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে। পত্র শুষ্ক করিবার প্রক্রিয়ার বৈষম্যানুসারে হরিৎ ও কৃষ্ণ চায়ের বর্ণ বিভিন্নতা ঘটে। চা পাতা-গুলি বৃক্ষ হইতে সংগ্রহ করিবার এক কি দুই ঘণ্টা পরে শীঘ্র শীঘ্র অগ্নির তাপে শুষ্ক করিলে উহার বর্ণ হরিৎ হয়। আর পাতা গাছ হইতে ছিঁড়িয়া রাশীকৃত করিয়া ১০।১২ ঘণ্টা রাখিলে ঐ সময়ে পাতাগুলির মধ্যে পরিবর্ত্তন বা পচন আরম্ভ হয়, তারপর অগ্নির তাপে শুষ্ক করিলে কৃষ্ণ চা প্রস্তুত হয়। হরিৎ ও কৃষ্ণ চা একই প্রকার বৃক্ষ হইতে প্রস্তুত হইলেও পত্র সঞ্চয়ের কাল ও প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়ার তারতম্য বশতঃ হরিৎ চায়ের ক্রিয়া কৃষ্ণ হইতে প্রবল।

চা পাতার প্রধান তিনটী বিষয় বিশেষ আলোচনার বিষয়। ১ম এক প্রকার কষায় দ্রব্য :—এই দ্রব্য থাকাতেই চা তিক্ত কষায় বোধ হয় আর কাপড় দিয়া ছাঁকিলে দাগ ধরে। এই দ্রব্য চা পাতায় সাধারণতঃ ১০ হইতে ১৮ অংশ আছে। ২য় একপ্রকার বায়ী তৈল বা আতর :—এই দ্রব্যে থাকাতেই সুঘ্রাণ পাওয়া যায়। এই দ্রব্য চা মধ্যে অতি অল্প আছে। চা অনেকক্ষণ জলে ফুটাইলে এই তৈল উড়িয়া গিয়া চার গন্ধাস্বাদ নষ্ট হয়। ইহার পরিমাণ দুই ভাগের এক হইতে তিন ভাগের এক অংশমাত্র। ৩য় এক প্রকার ক্ষার গুণবিশিষ্ট দানাশীল দ্রব্য ইহাকে চা-বীর্য্য বা চা-সার বলে। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় চা পত্রে এই দ্রব্যের পরিমাণের অনেক ইতর বিশেষ দেখা যায়। শতকরা দুই ভাগের এক হইতে ৩ অংশ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কখন কখন ছয় অংশ পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে।

সূক্ষ্মরূপে দেখিলে চা মধ্যে নিম্নলিখিত দ্রব্য পাওয়া যায়।

	কৃষ্ণ চা	হরিৎ চা		কৃষ্ণ চা	হরিৎ চা
চা সার	·৪৬	·৪৩	রজন	৩·৬৪	২·২২
বায়ী তৈল	·৬০	·৭৯	সার দ্রব্য	২১·৩৬	২২·৮০
কষায় দ্রব্য	১২·৮৮	১৭·৮০	বর্ণজ পদার্থ	১৯·১৯	২৩·৬০
হরিৎবর্ণ পদার্থ	১·৮৪	২·২২	অণ্ডলাল	২·৮০	৩
গঁদ	৭·২৮	৮·৬৬	কাষ্ঠ বা উদ্ভিদ সূত্র	২৮·৩২	১৭·০৮
মোম	০	·৮	খনিজ দ্রব্য (ভস্ম)	৪·২৪	৬·৫৬

আমাদের দেশীয় চা আটপ্রকার পাওয়া যায়। কোন কোন পণ্ডিতের মতে সাধারণ চায়ের ১০০ ভাগের চা সার ২-৩ ভাগ, ছানা ১৫, গঁদ ১৮, চিনি ৩, কষায় দ্রব্য ৩৬, শ্বেতসার ২৫ ও বায়ী তৈল ৭৫, মেদ ৪, কাষ্ঠ ২০, খনিজ দ্রব্য ৫ অংশ আছে। চায়ের মধ্যে যে সকল দ্রব্য আছে উহার মধ্যে চা সারই প্রধান। ঐ চা সারের গুণ পাইবার জন্য চা পাতা গরম জলে ভিজাইয়া পান করা হয়। বায়ী তৈল চা পাতাকে সুস্বাদ ও সুগন্ধ করে, আর কষায় দ্রব্য উহাকে সঙ্কোচন গুণ প্রদান করে। সচরাচর চা যেমন অল্প সময় গরম জলে ভিজাইয়া পানীয় প্রস্তুত করা হয় তাহাতে চার অন্যান্য দ্রব্যগুলির অধিকাংশ জলে দ্রব না হইয়া চা পাতাতেই থাকিয়া যায়। আর অতি সামান্যরূপ দ্রব হইলেও তাহার পরিমাণ এত অল্প যে আমাদের বিশেষ কোন কাজে লাগে না। চা পাতার উপর ফুটন্ত গরম জল ঢালিয়া দিয়া কিছুক্ষণ রাখিলেই পান করিবার উপযোগী চার জল প্রস্তুত হয়। চার পাতা জলের সহিত ফুটাইলে বায়ী তৈল উড়িয়া গিয়া ঐ জল বিস্বাদ ও সুগন্ধহীন হয়। চার আদিম উপাসক চীনেরা বলিয়া থাকে "প্রস্রবণ বা খরস্রোতের জল উত্তম, নদীর জল মধ্যম, কূপ জল অধম।" অর্থাৎ যে জলে লবণের অংশ অত্যন্ত অল্প এবং যাহার প্রবাহ চঞ্চল অর্থাৎ যাহাতে অধিক বায়ু মিশ্রিত থাকে তাহাই উৎকৃষ্ট। কচি পাতা হইতে প্রস্তুত চা অনেকক্ষণ গরম জলে ভিজাইলে তাহা হইতে চা সার অনেক পাওয়া যায়। চা সার অনেক বাহির হইলেও কষায় দ্রব্য অধিক বাহির হইতে পারে না। জাপান দেশে চা পাতা চূর্ণ করিয়া জলের সহিত পান করিয়া থাকে, চীনেরা কেবলমাত্র চার জল পান করিয়া থাকে, অর্থাৎ ইহার সহিত অন্য কোন

দ্রব্য মিশায় না। রুষিয়ার লোক লেবুর রসের সহিত চা পান করে। জর্ম্মণ দেশে রম, সিরাপ ও দারুচিনি প্রভৃতির সহিত মিশাইয়া পান করে; ইংলণ্ড দেশে দুগ্ধ কিম্বা দুধের সর চিনির সহিত মিশাইয়া পান করে। দুগ্ধ ও সর চার কষায় আস্বাদ কম করে আর চিনি উহাকে সুমিষ্ট করে। আমরাও দুগ্ধ ও চিনির সহিত মিশাইয়া চা পান করিয়া থাকি। কি পরিমাণে এক ব্যক্তির জন্য ব্যবহার করা উচিত তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন। স্নায়ুপ্রধান ধাতুবিশিষ্ট অতি দুর্ব্বল ব্যক্তি অতি অল্প পরিমাণ চা পান করিলে হাত পা সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে থাকে, বুক ধড়ফড় করিয়া কাঁপিতে থাকে ও মাথা ঘুরায়। কচি পাতার চা ও হরিৎ চার ক্রিয়া প্রবল আর মাটী, চাষ ও পাতা প্রস্তুতের প্রক্রিয়া ও চার জাতি অনুসারে চা সারের পরিমাণের কমবেশ হইয়া থাকে। এ ছাড়া চা পাতা সুবাসিত ও সুরঞ্জিত করিতে ও প্রতারণার জন্য চার সহিত বিবিধ দ্রব্য মিলান হইয়া থাকে। সচরাচর এক চা চামচপূর্ণ পাতাকে এক-ড্রাম বা ত্রিশ কুঁচ বা পাঁচ আনা ওজন মনে করিয়া এক ব্যক্তির একবারের জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে উল্লেখিত কয়েকটী অবস্থা চা পায়িদিগের স্মরণ করিয়া চার পরিমাণ নির্ভর করা কর্ত্তব্য। আমরা এক্ষণে চার দোষ গুণের বিষয় আলোচনা করিতেছি।

১। শ্রান্তিহারক :—শারীরিক ও মানসিক শ্রমে শরীর অবসন্ন ও ক্লান্ত হইলে পরিমিত মাত্রায় দেহ ও মন উত্তেজিত হয়। চার এই গুণ, সকল পণ্ডিত একবাক্যে স্বীকার করেন। চায়ের এই শ্রান্তিহরা ক্রিয়া সুরা প্রভৃতির ন্যায় উত্তেজনা দ্বারা সম্পাদিত হয় না।

২। নিদ্রা-নিবারক। চায়ের নিদ্রা-নিবারক ক্রিয়া নিশ্চিত অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষে এই ক্রিয়ার সামান্য ইতরবিশেষ হইলেও কদাচ ব্যর্থ হয় না। কোন কোন পণ্ডিতের মতে চা শ্বাসযন্ত্রকে উত্তেজিত করিয়া দেহ হইতে অধিক পরিমাণ অঙ্গারাম্ল বাষ্প নির্গত করে। শ্বাসযন্ত্রের উত্তেজনা ও দেহ হইতে অধিক অঙ্গারাম্ল বাষ্প বহির্গমন এই দুইটী নিদ্রার প্রতিকূল। এইজন্য চা নিদ্রা-হারক। যাহা হউক উক্ত মত কতদূর সত্য বলিতে পারি না। চার অন্যান্য ক্রিয়া থাকিলেও নিদ্রা নিবারণের জন্য চা যে মস্তিষ্ক স্নায়ুমণ্ডলের উপর বিশেষ প্রকার ক্রিয়া প্রকাশ করে,তাহা একরকম সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে।

ঘর্ম্মকারক ঃ—শরীর অত্যন্ত উষ্ণ হইয়াছে, গ্রীষ্মের যাতনা দুঃসহ, পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত, এমন সময় এক বাটী গরম চা পান করিবামাত্র শত-ধারায় তরল ঘর্ম্ম বাহির হইতে থাকে আর অবিরাম গতিতে রাশী রাশী অদৃশ্য বাষ্প চর্ম্মপথে বাহির হইয়া দেহের তাপ হরণ করিতে থাকে। তাহাতে অল্পক্ষণ মধ্যেই তাপিত দেহ শীতল হয়। নীরস মুখ সজল হয়। অনেকে বলিয়া থাকেন গরম চার উত্তাপ ও চার সহিত মিলিত জল এই দুইটীতে ঘর্ম্ম বৃদ্ধি হয় কিন্তু উক্ত দুই কারণ ব্যতীত চার ঘর্ম্ম করণ গুণ থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়।

জড়তা-নিবারক। উপযুক্ত মাত্রায় চা পান করিলে শরীর ও মনের জড়তা দূর হইয়া দেহ মন উত্তেজিত সরল ও প্রফুল্ল হয়।

৫। পোষক। চা পোষক কিনা সে বিষয়ে তিনপ্রকার মত আছে। প্রথম শ্রেণীস্থ পণ্ডিতেরা বলেন যে, চা নিজে পোষক। এজন্য তাঁহাদের মতে সর্ব্বসাধারণের নিয়মিতরূপে চা পান করা কর্ত্তব্য। ২য় শ্রেণীস্থ পণ্ডিতেরা বলেন চার নিজের পোষক গুণ নাই, তবে চা দেহের স্বাভাবিক ক্ষয় ও শ্রম জনিত অতিরিক্ত ক্ষয় কম করিয়া অসাক্ষাৎভাবে দেহ পোষণ করে। তাঁহা-দের মতে অতিশ্রম, অনুপযুক্ত খাদ্য জন্য দেহ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা হইলে চা পানে তাহা নিবারণ করা যায়। এইজন্য তাঁহারা দরিদ্র অর্দ্ধাশন ও অনুপযুক্ত আহারপ্রাপ্ত আমিত শ্রমীদিগের চা পান করা একান্ত কর্ত্তব্য, এরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন। ৩য় শ্রেণীস্থ পণ্ডিতেরা বলেন যে, চার যে কেবল পোষক গুণ নাই এবং দেহের ক্ষয় নিবারণ করিতে সক্ষম এমত নহে, প্রত্যুত ইহা দেহ ক্ষয় করিয়া থাকে। এই শ্রেণীস্থ পণ্ডিতগণের মধ্যে ডাক্তার স্মিথ বহুবিধ পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে উপযুক্ত মাত্রায় চা পান করিলে শ্বাসযন্ত্র উত্তেজিত হইয়া অঙ্গারাম্ল বাষ্প শ্বাসপথে নির্গত হইয়া থাকে, এজন্য চা অধিক পরিমাণ অঙ্গারযুক্ত খাদ্যকে দেহে নিয়োজিত করিয়া থাকে আর ঘর্ম্মাদি অধিক হইয়া চা দেহের তাপ হরণ করে। চা দেহের অঙ্গারের অংশ পরিপূর্ণ ও তাপ উৎপাদন করিতে সক্ষম নহে। এবং সুস্থ দেহে ক্ষুধা বৃদ্ধি করিবারও শক্তি ধারণ করে না। এই শ্রেণীস্থ পণ্ডিতগণের মতে যে সকল ব্যক্তি প্রচুর খাদ্য অথবা দেহে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করেন, চা তাহাদের পক্ষে

হিতকর। শ্বাসযন্ত্র উত্তেজিত করিয়া দেহের অঙ্গার অংশ ক্ষয় এবং ঘর্ম্মাদি দ্বারা দেহ শীতল করিয়া অতিরিক্ত খাদ্য দেহে প্রযুক্ত করে। এ ভিন্ন পূর্ণ আহারের পর চা পান করিলে খাদ্যদ্রব্য শীঘ্র শীঘ্র দেহে নিয়োজিত হয়। দরিদ্র অসার ও অপূর্ণভোজী এবং অনাহারী ব্যক্তির পক্ষে চা অনুপযুক্ত ও অনিষ্ট-কর। শরীরের প্রয়োজন ও অবস্থা বিশেষে চার অপকার হইতে দেখা যায়। চা শূন্যোদরে পান করিলে পাকস্থলি দুর্ব্বল হয়। যে সকল ব্যক্তির ঘর্ম্ম পাতলা বা সহজে ঘর্ম্ম হয় ও চর্ম্ম উত্তেজনা অবস্থাপ্রাপ্ত এবং যে সকল ব্যক্তি অপূর্ণ আহার করে ও দুর্ব্বল তাহাদের জন্য চা অনিষ্টকর। শীতকালে ও শীতল সময়ে চা ব্যবহারে অনিষ্ট হয়। অল্পবয়স্ক ব্যক্তিদিগের পক্ষে চা উপকারী নহে বরং অনিষ্ট করিয়া থাকে।

চার পুষ্টিকারিতা বিষয়ে উপরে যে তিনপ্রকার মত উল্লেখ করা গেল তাহা পাঠ করিলে পরস্পর বিপরীত মত দেখা যায়। চিকিৎসকগণের মধ্যে কেহ কেহ স্বপক্ষে মত দিয়া থাকেন। চা যে প্রকৃতরূপে কি ক্রিয়া প্রকাশ করে এবং কোন অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য চা পান করিলে তাহার সাক্ষাৎ ক্রিয়াই বা কি এ সমুদয় অদ্যাপি সূক্ষ্মরূপে ও অভ্রান্তরূপে অবগত হইতে পারা যায় নাই বলিয়া এইপ্রকার মত বৈষম্য হইবার সম্ভাবনা। যাহা হউক এক্ষণে আমরা চা বিষয়ে আমাদের অভিমত প্রকাশ করিতেছি। চা নিজে পুষ্টিকর কিনা এ বিষয়ে বিবেচনা করিতে হইলে আমরা মুহূর্ত্তের জন্য একবার চিন্তা করিয়া দেখিব খাদ্য কি? যাহাতে দেহ পোষণ হয় তাহাকেই খাদ্য বলা যায়। অর্থাৎ যেসকল দ্রব্যে আমাদের দেহ গঠিত এই সকল দ্রব্য যাহাতে আছে সেই সমুদায় দ্রব্যকে আমরা মোটামুটীভাবে খাদ্য বলি। কিন্তু সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে দেখিব যে আমাদের দেহে যে যে দ্রব্য আছে তাহার সমুদায় বা কতক অংশ যে সকল দ্রব্যে পাওয়া যায় ও তাহা যদি আমাদের পাকযন্ত্রের সাহায্যে অনায়াসে আমাদের দেহ পোষণের ভাণ্ডার রক্তের সহিত মিলিত হয় তবে তাহাই আমাদের খাদ্য। আমরা উক্ত সর্ব্ববাদী সম্মত যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া চা মধ্যে অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই চা মধ্যে শতকরা ৩ অংশ চা সার আছে। এবং ঐ চা সারে শতকরা ২৮·৮৩ ভাগ মাত্র নাইট্রোজেন বা প্রকৃত বলকারক দ্রব্য আছে। এই পরিমাণ নাইট্রোজেন পুষ্টিকর খাদ্যরূপে

গণনায় অযোগ্য।" চা যে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সাক্ষাৎ ভাবেই হউক আর গুপ্তভাবেই হউক দেহ পোষণের সাহায্য করে এবিষয়ে আমাদের সন্দেহ থাকিলেও তাহার প্রশংসা অনেক লোকের মুখে শুনা যায়। চার পোষক গুণ বিষয়ে মত বৈষম্য থাকিলেও চার অন্য যে কয়টী গুণ উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা একপ্রকার নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে।

সম্পূর্ণ সুস্থ দেহে চা নিয়মিতরূপে পান করা উচিত কিনা অর্থাৎ চা খাদ্য বা পানীয়ের শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে কিনা তাহা দেখা যাউক। পূর্ণভোজী ইংরেজগণ চাকে যতই উপাদেয় ও পোষক পানীয় বলুন না কেন, জঠর জ্বালায় ব্যথিত ম্যালেরিয়ার উৎপীড়নে ব্যতিব্যস্ত, দারিদ্রতা রাক্ষসের কবলস্থ বাঙ্গালীর নিত্য ব্যবহার জন্য চা কতদূর উপযোগী আমরা একবার চিন্তা করিয়া দেখি। যথানিয়মে উপযুক্ত পরিমাণ চা প্রত্যহ পান করিলে বিশেষ কোন লাভ আছে কিনা বিবেচনা করিতে হইলে চার গুণগুলি একবার চিন্তা করিতে হয়। শ্রান্তি হরণ জন্য বাঙ্গালী চা পান করিতে চাহিলে বক্তব্য এই যে ২।১০ ব্যক্তি ভিন্ন বাঙ্গালী জাতি আজিও শ্রম ও সময়ের মূল্য বুঝেন নাই। মুটে ও মজুর লোকও আজকাল সংসর্গ দোষে শ্রম কমাইয়া সৌখীন হইতেছে। যে সকল নিতান্ত দরিদ্র ব্যক্তি পেটের জ্বালায় বাধ্য হইয়া শ্রম করে তাহারা তামাকের ধূম পানে শ্রান্তি দূর করিয়া থাকে। এস্থলে উল্লেখকরা কর্ত্তব্য, যে পরিমিত মাত্রায় সেবন করিলে তামাক বিলক্ষণ শ্রান্তি হরণ করে অথচ চার মত নিদ্রা নিবারণ করে না।

আজকাল দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে এই শ্রেণীস্থ লোককে চা খাইতে পরামর্শ দিলে তাহারা স্থলপথ ও জলপথে গমনাগমন করিবে। অর্থাৎ চা ও তামাক উভয়ই সেবন করিবে। এরূপ স্থলে ঐ শ্রেণীস্থ লোকের মধ্যে চা পান প্রচলিত করিবার প্রয়োজন দেখা যায় না। গুড়ুকের প্রিয় শিষ্য বঙ্গকুলতিলক, বঙ্গকুম্ভকর্ণ, তাকিয়া—উপাসকসম্প্রদায়ের জন্য চার ত প্রয়োজনই হইতে পারে না। এরূপ স্থলে মহাত্মারা অনুকরণ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য কেন যে নিদ্রাময় জীবনে নিদ্রার ব্যাঘাত উৎপন্ন করেন তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি বুঝিতে পারে না। এটি কি নন্দনকানন দীর্ঘকাল পবিত্র করিবার জন্য ?

সম্প্রদায় ও শ্রেণীবিশেষের কথা ছাড়িয়া সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে আমরা দেখি যে, প্রকৃতি আমাদের ব্রহ্মবীর্য্য অনুসারে শ্রম করিবার শক্তি দিয়াছে। যেমন বাষ্পীয় যন্ত্রগুলি বাষ্পের চাপে নষ্ট হইবার উপক্রম হইলে তাহার "সেফ্‌টী ভাল্ব" নামক কপাট ঘুলিয়া দিয়া বিপদ নিবারণ করে, সেইরূপ আমাদের দেহও অত্যাচারে নষ্ট হইতে না পারে, এইজন্য অনেক প্রকার রক্ষারও উপায় রহিয়াছে। তাহার ভিতর প্রধান সুনিদ্রা। চা পান করিলে সেই নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটে। নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটিলে স্বাস্থ্যের পক্ষে হানি হয়। তা ছাড়া ডাক্তার স্মিথের কথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে আমরা বাঙ্গালী দুর্ব্বল জাতি, আমাদের সহজেই ঘর্ম্ম হয়, আমরা পতিত দেশের লোক সুতরাং অনার অপূর্ণভোজী, অর্দ্ধ উলঙ্গ, আমাদের জন্য চার বিধি নাই। ইহা আমাদের পক্ষে অনিষ্টকর।

চার নিদ্রানিবারক ক্রিয়ার জন্য সুস্থ দেহেই ইহার আদর করা চলে না।

পিপাসা নিবারণ ও শরীর শীতল করিবার জন্য আমাদের চা পানের প্রয়োজন দেখিতেছি না। ঘোল, দধি, তেঁতুল, লেবু ইত্যাদির সরবৎ এবং ডাবের জল আমাদের দেশের জন্য প্রকৃত উপযোগী।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন চা ম্যালেরিয়া নষ্ট করিয়া থাকে, কিন্তু ইহার অভ্রান্ত প্রমাণাভাব। ইংরাজের কথা ছাড়িয়া দিন, আমাদের দেশের এখন যে সকল ব্যক্তি নিয়মিত চা পান করেন, তাঁহারা পর্য্যাপ্তরূপ বস্ত্র ব্যবহার করেন, চব্য, চুষ্য লেহ্য, পেয়, আকণ্ঠ ভক্ষণ করেন, প্রত্যহ ফিল্টার করা জল পান করেন, দ্বিতল গৃহে পালঙ্কে শয়ন করেন, মানসিক চিন্তা থাকিলেও দুশ্চিন্তা নাই, বরং আশা, উৎসাহ তাঁহাদিগকে সুখ ও আনন্দে মোহিত করিয়া রাখে। এপ্রকার ব্যক্তির দেহে ম্যালেরিয়ার প্রভাব কম হওয়া চার গুণে কি অন্য কোন গুণে তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর। নারাণ চাষা, হরে জেলে, ভুবন মজুরের মত লোক অর্দ্ধাশনে, অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় একদিকে দীর্ঘকাল কঠোর পরিশ্রম অপরদিকে দারিদ্রতা, নৈরাশ্য প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎভাবে মল্লযুদ্ধ করিয়া (দুধ ও চিনি ব্যতীত) শুধু চার অনুগ্রহে ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ অব্যাহতি পাইয়াছে এপ্রকার অন্ততঃ একশত বাঙ্গালীর অবস্থা যদি কেহ দেখাইতে পারেন তাহা হইলে চার ম্যালেরিয়া নিবারক গুণ অসঙ্কোচভাবে কীর্ত্তন করিব।

রাসায়নিক বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়া দিতেছে যে চা খাদ্যের উপযোগী নহে। তবে পোষক কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ করিয়া অনেকে চা পান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু ডাক্তার স্মিথের পরীক্ষিত বিষয় যদি সত্য হয় তাহা হইলে চা'ও দেহক্ষয় করিয়া থাকে ; সুতরাং চা বিপরীত ক্রিয়া করে। আর একটী কথা এই যে চাল, ডাল, মাছ, দুগ্ধ ইত্যাদি যেগুলি আমাদের পুষ্টিকর খাদ্য, এগুলির পরিমাণের ইতরবিশেষ হইলে কিংবা ব্যক্তি বিশেষে কোন বিষ ক্রিয়া প্রকাশ করে না, কিন্তু চা এবিষয়ে সম্পূর্ণ কলঙ্কিত। আমাদের এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া হয়ত অনেকে মনে করিবেন, যে চার সৃষ্টি হইয়া শত শত বাঙ্গালীকে দুরারোগ্য উমেদারী রোগ হইতে মুক্ত করিয়াছে ও করিতেছে, যে চা আসামের জঙ্গলে মাটিতে সোনা ফলাইতেছে, যে চা তীর্থক্ষেত্রে দারিদ্রতা পাপ বিমোচনের জন্য শত শত বাঙ্গালী নরনারী আত্মীয় স্বজন, স্বর্গাধিক আদরণীয় জন্মভূমি ও প্রাণাধিক প্রিয়তম সদ্যপ্রসূত ও দুগ্ধ-পোষ্য পুত্র কন্যা পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবিত হইতেছে, যে চা-ক্ষেত্র দেশের লোক বৃদ্ধির কতকটা সমতা রক্ষা করিতেছে, যে চা ইহার মাতৃভূমি ও আদিম উপাসক চীনের গৌরব বৃদ্ধি না করিয়া এই দুঃসময়ে স্বর্ণভূমি ভারতের গৌরব বৃদ্ধির জন্য পূর্ণাঙ্গ ও সুগুণ ধারণ করিতেছে, যে চার জন্য ভারতের জগৎবিখ্যাত নাম জগতের সর্ব্বস্থানে বিঘোষিত হইতেছে, যে চাকর, দূত, পাণ্ডা ও বেহারারূপে তীর্থ যাত্রী ও পিত্রালয় গমন প্রয়াসী কুলবধূকে পর্য্যন্ত ছলনা দ্বারা নির্ব্বাসিত করিয়াছে, এপ্রকার চা বাঙ্গালীর কোন কাজে আসিবে না, বাঙ্গালী কেবল চিনির বলদের ন্যায় দেখিয়াই সন্তুষ্ট থাকিবে, এ কিরূপ যুক্তি এ কিরূপ বিধান ?

পাঠকগণ নিরাশ হইবেন না। চা আমাদেরও কাজে লাগিবে। কোন্ কোন্ অবস্থায় চা পান করিলে আমাদের কাজে লাগিবে তাহার আলোচনা করিতেছি।

সম্পূর্ণ সুস্থ দেহে চা দরিদ্র পক্ষে আবশ্যক। চা অনিষ্টকারী হইলেও কয়েকটি বিশেষ অবস্থায় ইহা বিশেষ উপকার করিয়া থাকে।

প্রথম অত্যন্ত সর্দ্দি করিয়াছে, শরীরে অত্যন্ত বেদনা ও জড়তা বোধ হইয়াছে, হাত, পা মাথা গা কামড়াইতেছে, নাক বুজিয়া আছে, এক বাটী

গরম চা পান করিয়া একটি মোটা চাদর গায়ে দিলে শত ধারায় ঘর্ম্ম নির্গত হইয়া শীঘ্রই সর্দ্দির অসহ্য যন্ত্রণা বিলক্ষণ লাঘব বা একেবারে দূর হইবে।

দ্বিতীয় ঃ—যে সকল লোক সামান্য কারণে বিরক্ত হয়, স্বভাব খিট খিটে, অধিক গোলমাল কি কোন প্রকার শব্দ সহ্য করিতে পারে না অধিক কাজ করিলে হাত পা কাঁপে, মাথা ঘুরায়, এ প্রকার ধাতুর লোককে স্নায়ুপ্রধান ধাতু বিশিষ্ট লোক বলে। এ প্রকার ব্যক্তির স্নায়বীয় শীরঃপীড়ায় চা পান উপকার দেখাইয়া থাকে।

তৃতীয় ঃ—যে সকল ব্যক্তি অভ্যস্ত রূপে অধিক সুরাপান করে, তাহাদের এক প্রকার ধাতু হইয়া যায়; কোন প্রকার কাজ কর্ম্ম করিতে গা হাত কাঁপে, মেজাজ খিট্‌খিটে হয়, পান ইচ্ছা প্রবল হয়, ক্ষুধা মন্দ হয়, ঐ সকল ব্যক্তির পক্ষে ঐ অবস্থায় চা বিশেষ উপকারী।

চতুর্থ ঃ—অহিফেন, মর্ফিয়া প্রভৃতি নিদ্রাকারী বিষ দ্বারা দেহ বিষাক্ত হইলে চা নিদ্রা নিবারক ও কষায় দ্রব্য দ্বারা বিষ নষ্ট করিয়া উপকার করে। ইহাতে কষায় দ্রব্য আছে বলিয়া এণ্টিমনি প্রভৃতি ধাতু দ্বারা বিষাক্ত হইলে ইহা বিনষ্ট করে।

পঞ্চম ঃ—শ্বাস কাস অর্থাৎ হাঁপানি কাসের প্রবলাবস্থায় এক বাটী গাঢ় চা পান করিলে, কোন কোন ব্যক্তির শ্বাস কষ্ট অতি শীঘ্র নিবারণ হয়।

ষষ্ঠ ঃ—কোন কারণে যদি উপযুক্ত আহার না জুটে ও বাধ্য হইয়া অতিরিক্ত শ্রম করিতে হয় তদবস্থায় চা পান করিলে অন্ততঃ শ্রমকষ্ট ও জঠর যন্ত্রণা লাঘব হয়।

সপ্তম ঃ—দৈব দুর্ব্বিপাকে ও বাধ্য হইয়া রাত্রি জাগরণ করিতে হইলে চা নিদ্রা নিবারণ করিয়া অনিদ্রা-জনিত ক্লেশ নিবারণ করে।

অষ্টম ঃ—অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কঠোর মানসিক শ্রম করিতে হইলে চা পানে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বুদ্ধি সতেজ ও স্থির থাকে, এবং শ্রমজনিত ক্লেশ লাঘব হয়।

নবম ঃ—কোন পীড়া ব্যতীত শরীরের কি মনের জড়তা ও সামান্য অসুখ বোধ হইলে চা পানে মন প্রফুল্ল ও দেহ সুস্থ হয়।

দশম ঃ—কুইনাইনের তিক্ত আস্বাদ জন্য উহা সেবন করা অনেকের পক্ষে কষ্টকর, চা জলের সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে কুইনাইনের আস্বাদ বিলক্ষণ কম হয় ও চা যোগে ইহার ক্রিয়া প্রবল হয়।

আমরা ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম চিহ্নিত প্রস্তাবে চা পানের যে উপকারিতা বলিলাম তাহা বিধির বিপাকে অথবা নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই জানিতে হইবে।

এইবার আমরা চার কয়েকটী দোষের কথা উল্লেখ করিব।

চা-সার একটী বিষ। অধিক পান করিলে বিষের ন্যায় কার্য্য করে। অত্যন্ত দুর্ব্বল ও রুগ্ন দেহে চা অহিতকারী। অজীর্ণ রোগে চা অপকারী। শূন্যোদরে শুদ্ধ চা পান করা কোন মতে কর্ত্তব্য নহে, তাহাতে পাকস্থলী পীড়িত ও দুর্ব্বল হয়। প্রত্যহ নিয়মিতরূপে চা পান করা বাঙ্গালীদের পক্ষে বর্ত্তমান অবস্থায় উচিত কিনা তাহা ভবিষ্যতে মীমাংসার বিষয়। বিদ্যালয়ের অল্পবয়স্ক ছাত্রগণের অধিক রাত্রি জাগরণ করিয়া অত্যধিক মানসিক শ্রম জন্য চা পান কোন প্রকারে অনুমোদনীয় নহে, তাহাতে অনিদ্রা, অতি শ্রম ও অপ্রাপ্ত বয়সে চা পান এই ত্রিবিধ দোষ তাহাদিগকে আশ্রয় করে। চা সুবাসিত ও সুরঞ্জিত করিবার জন্য কখন কখন উহাতে প্রুসীয়ান ব্লু, নীল, জিনসন, পাথর চূর্ণ, লৌহ, প্লাম্বগো, খড়ি, চীনামাটী, বালু, হরিদ্রা, শ্বেতসার, খদির, গঁদ, নানাপ্রকার বৃক্ষ ও ঘাসের পাতা ইত্যাদি মিশ্রিত করা হইয়া থাকে।

বৈদ্যক গ্রন্থ বিবরণী।

——০)*(০——

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

২১। যোগতরঙ্গিণী।

যোগতরঙ্গিনী, বৈদ্য ত্রিমল্ল ভট্ট প্রণীত। ত্রিমল্লের পিতার নাম বল্লভ; পিতামহ শিঙ্গন ভট্ট; পুত্র রসপ্রদীপ প্রণেতা শঙ্কর ভট্ট। ত্রিমল্ল, ত্রৈলঙ্গ দেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইহাঁর কৃত অন্যান্য বৈদ্যক গ্রন্থ, যথা——দ্রব্য গুণ শত শ্লোকী, বৃহদ্ যোগতরঙ্গিণী, বৃত্তমাণিক্য মালা ও বৈদ্যচন্দ্রোদয়। অলঙ্কার মঞ্জরী নামক অলঙ্কার গ্রন্থ ত্রিমল্ল কর্ত্তৃক কাশীতে অবস্থিতি কালে বিরচিত হয়।

যোগতরঙ্গিণীতে সাকল্যে ৭৭টি তরঙ্গ বা পরিচ্ছেদ আছে। ইহাতে রস ও ধাতুঘটিত এবং ক্বাথ, কল্ক, চূর্ণ, তৈল ও ঘৃতাদির ব্যবহারও আছে।

এই গ্রন্থের বিষয় নির্দ্দেশ এইরূপঃ—পরিভাষা। যুক্তাযুক্ত বিচার। স্নেহ-রসপাক। পঞ্চকর্ম্ম, স্বেদ, বমন, বিরেচন, বস্তিবিধি, নস্য, ধুমপান, রক্তস্রুতি, নাড়ী, জিহ্বা, মূত্র,মল, দৃক্ পরীক্ষা; ধাতু শোধন, স্বরসাদি বিধান। তৎপরে মাধবকরের নিদানোক্ত "জ্বরোঽতি সার" ইত্যাদি সূচীর নির্দ্দেশ অনুসারে জ্বর হইতে বিষাধিকার পর্য্যন্ত সকল রোগের লক্ষণ ও চিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর বাজীকরণাধিকার। ষড় ঋতুবর্ণনাতে গ্রন্থের পরিসমাপ্তি হইয়াছে।

এই গ্রন্থে বক্ষ্যমান গ্রন্থ ও গ্রন্থকারগণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। অশ্বিনীকুমারি সংহিতা, আরোগ্য, দর্পণ, কৃষ্ণাত্রেয়, কলিকা (চিকিৎসা কলিকা?), গোরক্ষমত, চরকাচার্য্য, চর্পটী, চিন্তামণি (রসেন্দ্র চিন্তামণি ?), চক্রদত্ত, চিকিৎসা কলিকা, চিকিৎসা দীপ, ত্রীশটাচার্য্য, নারায়ণ, প্রয়োগ পারিজাত, বৃহদ্ আত্রেয়, বৃদ্ধহারীত, বৌদ্ধ (বৈদ্য ?) মত, বৌদ্ধ (বৈদ্য ?) সর্ব্বস্ব, তন্ত্র শৌনক, ভালুকি তন্ত্র, ভৈরব তন্ত্র, মদন পাল, মতিকুমার, যোগ রত্নাবলী, যোগশত, যোগ প্রদীপ, রসরত্ন প্রদীপ, রুদ্রচন্দ্র, রত্ন প্রদীপ, রসেন্দ্র চিন্তামণি, রুগ বিনিশ্চয়, রসরত্ন. রস প্রদীপ, রাজমার্ত্তণ্ড, রসরত্নাবলী, বৈদ্যালঙ্কার, বৃন্দ, বীর সিংহাবলোক, বসন্তরাজ, বৈদ্যাদর্শ,বাগ্‌ভট, শার্ঙ্গধর, সারসংগ্রহ ও সুশ্রুত;

ত্রিমল্ল, স্বগ্রন্থের উপান্তে এই দুইটী শ্লোক বলিয়া গিয়াছেনঃ—

"আতুরস্য পিতা বৈদ্যঃ স্বস্থচিত্তস্য বান্ধবঃ।
ততঃ স্বস্থতরে জাতে ন পিতা ন চ বান্ধবঃ॥"

"কর্কশঃ কশ্মলঃ স্তব্ধঃ স্বগামী স্বয়মাগতঃ।
পঞ্চ বৈদ্যা ন পূজ্যন্তে ধন্বন্তরিসমা অপি॥"

কবিরাজ—শ্রীমথুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থ কাব্যচিন্তামণি।
২ নং বালাখানা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যাপীঠ-পরীক্ষা।

বর্ত্তমান বর্ষের পরীক্ষার্থীদের বিশেষ জ্ঞাতব্য।

পরীক্ষা সময়—

এবৎসরের নিখিল ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যাপীঠের আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য, আয়ুর্ব্বেদ বিশারদ এবং প্রাকৃত বৈদ্য পরীক্ষা আগামী ১১, ১২, ১৩, অগ্রহায়ণ (ইং ২৭, ২৮, ২৯ নবেম্বর) শনিবার, রবিবার ও সোমবার গৃহীত হইবে।

পরীক্ষা স্থান—

এবৎসর প্রাকৃত বৈদ্য পরীক্ষা ও আয়ুর্ব্বেদ বিশারদ পরীক্ষার জন্য প্রয়াগ বাঁকীপুর, কলিকাতা, ঢাকা, মাদ্রাজ, পুনা বোম্বাই, আহম্মদাবাদ, আজমের, লাহোর, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ এবং জব্বলপুর কেন্দ্র স্থিরীকৃত হইয়াছে। যদি ভাদ্র মাসের শেষ তারিখের মধ্যে অন্য কোন স্থান হইতে কেন্দ্র করার জন্য প্রার্থনা আসে, তাহা হইলে বিদ্যাপীঠের সমিতি এবিষয়ে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া জ্ঞাপন করিবেন। আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য পরীক্ষার জন্য কেবল প্রয়াগ, কলিকাতা এবং মাদ্রাজ কেন্দ্র স্থাপিত হইল।

পরীক্ষা ক্রম—

১১ই অগ্রহায়ণ শনিবার প্রথম দিন ১০ ঘটিকা হইতে ১ ঘটিকা পর্য্যন্ত নিদান এবং রোগ পরীক্ষা, ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত স্বাস্থ্য বিজ্ঞান এবং সূত্রস্থান বিষয়ক পরীক্ষা হইবে। দ্বিতীয় দিন (রবিবার) ১০টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত চিকিৎসা ও রসায়ন, পরে ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত নিঘণ্টু বিষয়ক পরীক্ষা হইবে। তৃতীয় দিন সোমবার সকালবেলা ৭টা হইতে ১০টা তক মৌখিক পরীক্ষা গৃহীত হইবে, যাহাতে রোগী প্রদর্শন পূর্ব্বক রোগ নিশ্চয় করণ ও চিকিৎসা বিধি নির্দ্ধারণ এবং বিবিধ ঔষধি প্রত্যক্ষ পূর্ব্বক ভেষজ পরিচয়, এই

কয়টি বিষয় থাকিবে। অতঃপর বেলা ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত শারীর বিষয়ক পরীক্ষা লওয়া হইবে।

পদক পরীক্ষা—

এই সকল পরীক্ষা ভিন্ন আয়ুর্ব্বেদ বিশারদ ও আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য পরীক্ষার্থী ইচ্ছা করিলে স্বতন্ত্র পদক পরীক্ষা দিতেও সক্ষম হইবেন। ইহার পাঠ্যক্রম বাহিরের ভিন্ন ২ বিষয় নিয়া অথচ যাহার সঙ্গে আয়ুর্ব্বেদের কোন না কোন সম্বন্ধ রহিয়াছে, যেমন ধর্ম্মশাস্ত্র, জ্যোতিষ, যোগ ও সাংখ্য প্রভৃতি। বিদ্বদ্বর্গের এক সমিতি দ্বারা এই পরীক্ষা লওয়া হইবে।

বিষয় ও প্রশ্নপত্র—

নিদান, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, চিকিৎসা, রসবিদ্যা, নিঘণ্টু ও শারীর বিজ্ঞান বিষয়ে মুদ্রিত প্রশ্নপত্র প্রদত্ত হইবে। মৌখিক পরীক্ষা কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক পরীক্ষাস্থানে অথবা কোন ঔষধালয়ে গ্রহণ করিবার বন্দোবস্ত করিবেন। অন্যূন তিন জন আয়ুর্ব্বেদিক পণ্ডিত দ্বারা মৌখিক পরীক্ষা গৃহীত হইবে। রোগী প্রদর্শন পূর্ব্বক পৃথক্ ২ রোগ নিশ্চয়, চিকিৎসা ও পথ্যাপথ্য নির্দ্ধারণ বিষয়ে প্রশ্ন করা যাইবে। এই প্রকার ৫টি বা ৬টি ঔষধি দ্রব্য প্রত্যক্ষে ভেষজ পরিচয় পরীক্ষা লওয়া হইবে। পদকপরীক্ষা কেবল মৌখিক হইবে। পদক পরীক্ষার পরীক্ষার্থী শতকরা অন্যূন ৫০ নম্বর পাইলেই উত্তীর্ণ বলিয়া গণ্য হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—কোন বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে মন্ত্রীকে লিখিবেন। নিয়মাবলী পুস্তিকা নিম্ন ঠিকানায় বিনা মূল্যে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীজগন্নাথ প্রসাদ শুক্ল

মন্ত্রী—আয়ুর্ব্বেদ মহামণ্ডল ও আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যাপীঠ।

প্রয়াগ (এলাহাবাদ)

বৈদ্য মহোদয় গণের নিকট

নিবেদন।

(প্রাপ্ত)

শ্রীযুক্ত আয়ুর্ব্বেদ-বিকাশ সম্পাদক মহোদয়েষু।

মহোদয়। আমার নিবেদন এই যে আয়ুর্ব্বেদীয় যে সকল ঔষধ চিকিৎসার্থ ব্যবহৃত হয় তন্মধ্যে বহুতর দ্রব্যই সন্দেহ সঙ্কুল, অর্থাৎ অনেক দ্রব্যের অবস্থা এইরূপ যে, আয়ুর্ব্বেদোক্ত একই নামে ভিন্ন ২ দেশে ভিন্ন ২ দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন—বৃদ্ধদারু, জীবন্তী, রাস্না প্রভৃতি। এই সমুদয়

দ্রব্যের নির্ণয় হওয়া একান্ত আবশ্যক। এই সকল শাস্ত্রোক্ত দ্রব্যের সন্দেহ নিরাকারণের লিখিত নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন কয়া যাইতেছে।

প্রথমতঃ ভারতবর্ষের ভিন্ন ২ প্রান্তের বৈদ্যগণের নিকট প্রার্থনা যে, তাঁহারা যে ২ ঔষধ সন্দিগ্ধ বলিয়া বিবেচনা করেন সে সকল দ্রব্যের এক সূচী তৈয়ার করিয়া প্রেরণ করেন। এই ভাবে ভারতবর্ষের সমুদয় প্রান্তীয় সন্দিগ্ধ ঔষধের সূচী পাওয়া গেলে সে সমুদয়ের সহয়তার এক বিরাট সম্পূর্ণ সন্দিগ্ধ সূচী প্রস্তুত করা যাইবে। বিশেষতঃ সেই সূচী এবং তৎসহ বনস্পতি প্রভৃতির নমুনা কিরূপে তৈয়ার করা আবশ্যক তাহার সম্পূর্ণ বিধি মুদ্রণ পূর্ব্বক ভারতবর্ষীয় সমুদয় বৈদ্য মহোদয়গণের নিকট প্রেরণ করা হইবে এবং প্রার্থনা করা হইবে, তাঁহারা সেই নামে যে সকল দ্রব্য ব্যবহার করেন তাহার নমুনা প্রেরণ করেন। এই ভাবে নমুনা সংগৃহীত হইলে পর আয়ুর্ব্বেদ মহামণ্ডলের সম্মতি অনুসারে এইরূপ এক কমিটি নির্দ্ধারণ করা হইবে যাহাতে দুইজন বনস্পতি শাস্ত্রবেত্তা (বোটানিষ্ট), দুইজন বৈদ্য এবং পাশ্চত্য চিকিৎসা-শাস্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ উভয় শাস্ত্রে পারদর্শী এমন এক ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হইবেন। উক্ত কমিটি সেই ২ নমুনা দ্বারা শাস্ত্রোক্ত নামে ব্যবহার যোগ্য দ্রব্য নির্ণয় করিয়া তাহা সর্ব্বসম্মত হওয়ার নিমিত্ত বৈদ্যসম্মেলনে উপস্থাপিত করিবেন।

উক্ত কার্য্য—সন্দিগ্ধ দ্রব্যের সম্পূর্ণ সূচী প্রস্তুত এবং তাহা বৈদ্যগণের নিকট প্রেরণ করতঃ তাহাদেরই সহায়তায় কমিটি নির্ব্বাচনার্থ দ্রব্যের নমুনা সংগ্রহ প্রভৃতি কার্য্যের ভার নিখিল ভারতবর্ষীয় বৈদ্যসম্মেলনে কলিকাতার ষষ্ঠ অধিবেশনের ৯ম প্রস্তাবের অনুযায়ী আমার প্রতি অর্পিত হইয়াছে। অতএব কার্য্যারম্ভে প্রার্থনা—আপনি যে ২ ঔষধ সন্দিগ্ধ বিবেচনা করেন উহার এক সূচী প্রস্তুত করিয়া শীঘ্র কৃপা করিয়া আমার নিকট প্রেরণ করিবেন। তাহা হইলে সত্বরই এক সম্পূর্ণ সূচী প্রস্তুত করিয়া নমুনা প্রেরণার্থ ভবৎ-সমীপে প্রেরণ করিব। সম্পূর্ণ ভরসা আছে এই সদুদ্দেশ্য সাধনার্থ সমুদয় বৈদ্য মহোদয় উক্ত কার্য্যকে নিজ পরম কর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়া এই কার্য্যে সর্ব্বপ্রকারে আমাকে সহায়তা করিবেন।

ভবদীয়

বৈদ্য যাদবজী ত্রিকমজী আচার্য্য।

৩৭২ বরবাজার ষ্ট্রীট্, ফোর্ট, বোম্বাই।

রাজ

"প্রাণোবা অমৃতম্ ।" (শ্রুতিঃ)

আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ।

(স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন ও চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র)

"আয়ুঃকাময়মানেন ধর্ম্মার্থ সুখসাধনম্।
আয়ুর্ব্বেদোপদেশেষু বিধেয়ঃ পরমাদরঃ॥ বাগ্‌ভট।

৩য় বর্ষ } শ্রাবণ ১৩২২ { ৪র্থ সংখ্যা।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রবন্ধ।

৫। আয়ুর্ব্বেদোক্ত শল্য চিকিৎসা।

—০)*(০—

শল্য চিকিৎসা আয়ুর্ব্বেদের একটি প্রধান অঙ্গ সন্দেহ নাই। এক সময়ে ইহার যে যথেষ্ট উন্নতি ও প্রসার হইয়াছিল তাহার সুস্পষ্ট ইতিহাস প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই চিকিৎসার জন্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র ও ভারতবাসী মহা গৌরবান্বিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় বহুকাল হইতেই এ বিদ্যাটি লুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদে অস্ত্রচিকিৎসা আছে ইহা অনেকেই জানেন না, সহসা কেহ শ্রবণ করিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া থাকেন। ইহা যে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার অঙ্গ নহে তাহা বলিলেও বোধ হয় দোষ হয় না। যখন আমরা দেখিতেছি অধুনাতন এমন কি বহুদিন পূর্ব্বেও প্রাচ্য চিকিৎসক সম্প্রদায় ইহা অবহেলা করিয়া আসিয়াছেন, ইহা যে চিকিৎসাক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয় তাহাও কেহ মনে করেন বলিয়া অনুমিত হয় না। এই অনাদর অসদ্ভাবের প্রতি উদাসীনতা

কেন? বস্তুতঃই কি ইহা চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রয়োজনে আসে না? ইহাকে বাদ দিয়া কি চিকিৎসাশাস্ত্রে সম্পূর্ণ হইতে পারে এবং তাহা বিশ্বাসযোগ্য কথা এরূপ প্রশ্ন স্বতঃই এখন হৃদয়ে জাগিতেছে। শল্য চিকিৎসা কোন্ সময়ে সমধিক প্রচলিত ছিল, কখন হইতে কি কারণে ইহার অবনতি আরম্ভ হইয়াছে; তাহার কারণ নির্ণয় অবশ্য কর্ত্তব্য। যে কারণে এক সময় শস্ত্রবিদ্যার প্রসার ঘটিয়াছিল সে হেতুর কি প্রয়োজনীয়তা এখন নাই? পাশ্চাত্য অস্ত্রচিকিৎসা এদেশে প্রবর্ত্তিত হইলে এই চিকিৎসার অভাব অনেকটা দূরীভূত হইয়াছে সত্য, কিন্তু পাশ্চাত্য চিকিৎসার প্রবর্ত্তনই আয়ুর্ব্বেদোক্ত শল্য চিকিৎসা লোপের অবশ্য কারণ নহে, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। পাশ্চাত্য চিকিৎসার অস্ফুটালোকও যখন এদেশে পতিত হয় নাই তাহারও বহু পূর্ব্বে এই বিদ্যাটির লোপ হইয়া গিয়াছে দেখা যায়। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে বহু২ খ্যাতনামা ধুরন্ধর ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদের অন্যান্য বিভাগের যথেষ্ট উন্নতি ও করিয়া গিয়াছেন, কেবল শল্যতন্ত্রের প্রতি তাঁহাদের উদাস দৃষ্টি ছিল কেন? তবে কি বলিতে হইবে চিকিৎসা ক্ষেত্রে উহার উপযোগিতা সামান্যই, অথবা নাই? প্রাণীর দুঃখ নিবারণ করাই চিকিৎসার মূল উদ্দেশ্য। যন্ত্র-শস্ত্রাদিকে বাদ দিয়া কি এই উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ হইতে পারে? যদি পারে তবে অমন নৃশংস ব্যাপারকে বাদ দিতে পারিলে খুবই ভাল হয়, তাহা সকলেই আনন্দের সহিত অনুমোদন করিবে। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্র কি এতটা উন্নতি লাভ করিয়াছে যে অস্ত্রচিকিৎসা উঠিয়া যাইবে, উহার প্রয়োজনীয়তা নাই। যে বিদ্যা প্রাচীন কালে চিকিৎসার অন্যতম প্রধান অঙ্গ ছিল, তাহার আজ আবশ্যকতা দূরীকৃত হইল? ভগবান্ এমন দিন কি আমাদের জন্য আনয়ন করিবেন?

শল্য চিকিৎসা—আবদ্ধ শল্য আহরণ, শরীরের কোন স্থানে দৈব আগন্তু ও ব্যাধি বশাৎ শল্যাদি আবদ্ধ হইলে তাহার উদ্ধার কল্পেই শস্ত্রপ্রয়োগের আবশ্যক হয়। প্রাকৃতিক নিয়মে, ভেষজ প্রয়োগে মন্ত্র-তন্ত্র-কৌশলে অনেক শল্য সহজে বহির্ম্মুখে আনীত হয়, ইহা ঠিক কিন্তু এমন বহুবিধ শল্য আবদ্ধ হইয়া পড়ে যে, তখন উহা শীঘ্র শস্ত্রপ্রয়োগে আহরণ না করিলে রোগী অচিরেই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়, পরন্তু শস্ত্র প্রয়োগের ফলে সাময়িক দারুণ দুঃখ ভোগ

ঘটিলেও প্রাণ রক্ষা হইয়া থাকে। আজ তোমার মন্ত্র ঔষধির অদ্ভুত শক্তির কথা আমি জানি, বিশ্ব সংসার জানে, বেশ, কিন্তু তোমার মন্ত্র তোমার ভেষজ তোমার বাহাদুরী কত স্থানে পরাস্ত তাহার গণনা কি তুমি একবার করিয়া থাক? তুমিও তোমার দল বলিবে, মন্ত্রৌষধি না করিতে পারে এমন কাজ নাই কিন্তু উহা তোমার মহাভ্রম। যদি তাহাই হইত তবে শল্য চিকিৎসার নামও কেহ শুনিত না, তবে পাশ্চাত্যগণ তোমার দ্বারেই নিয়ত মাথা খুঁড়িত। অস্ত্রের জন্য আর এত রাশি ২ অর্থ ব্যয় করিয়া বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় স্থাপন করিতেন না। শস্ত্র বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে এবং থাকিবে। ইহা বেদ-প্রমাণ্য, অস্ত্র বিদ্যার উন্নতির জন্য আমাদের উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে। আর উদাসভাবে কাটাইলে চলিবে না।

শস্ত্র বিদ্যা লুপ্ত হওয়ার বহুবিধ কারণই বিদ্যমান রহিয়াছে, ভরসা করি সম্মেলনের শুভানুষ্ঠানে সকলেই তাহার বিশদ আলোচনা করিবেন। আমরাও যথাবসর এতৎপ্রসঙ্গে পুনঃ দু'চার কথা বলিতে প্রয়াস পাইব। সংক্ষেপে আজ দু'একটি কথা মাত্র বলিয়া রাখিব। শস্ত্রবিদ্যার অবনতির প্রধান কারণ হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য ও বৃথা অবসাদ, মনে করিও না পূর্ব্ব পুরুষদের গালি দিতেছি, তাঁহারা অতি করুণ হৃদয় ছিলেন তাহা সত্য, সেই অপরিহার্য্য করুণা পরবশ হইয়াই এহেন কঠোর কার্য্য হইতে তাঁহারা বিরত রহিয়াছিলেন তাহাও সত্য মানি এবং এবম্বিধ অনুজিঘৃক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা শস্ত্র চিকিৎসার বহু অভাব পুরণ কল্পে অসাধারণ অদ্ভুত গুণশালী অসংখ্য ঔষধ সমুহ আবিষ্কার ও প্রচার করিয়া চিকিৎসাশাস্ত্রকে গৌরবান্বিত ও প্রজাসমূহের পরম আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়া রহিয়াছেন ইহাও ধ্রুব সত্য। কিন্তু আবার আমরা যখন ভাবি চক্ষুর সমক্ষে দেখিতে পাই, কত শত শত শোভন দেহ জীব নানাবিধ কারণে শল্যাহত হইয়া একমাত্র আহরণ কর্ত্তার অভাবে সদ্য মানবলীলা পরিহার করিতেছে। ঈদৃশ আর্ত্তগণের ত্রাণ করা কি পুণ্য নহে, ইহাতে কি কারুণ্য প্রকাশ পায় না? আজ তুমি প্রবীণ আয়ুর্ব্বেদ বিশারদ মহামহোপাধ্যায় চিকিৎসক, আজ তোমারই পার্শ্বে পতিত ওই শল্যাহত ব্যক্তির আর্ত্তনাদ তোমাকে মোহাভিভূত করিয়া দূরে পলায়ন করিতে বাধ্য করিতেছে, তোমার এমন সাহস নাই, এমন যন্ত্র নাই, এমন কৌশল নাই যদ্দারা তুমি ওই আর্ত্তের

দুঃখ নিবারণ করিয়া ধন্য হইতে পার। তুমি পার দুই বিন্দু চোখের জল ফেলিতে, তুমি পার ডাক্তারের বাড়ী দৌড়িতে, তুমি পার হাসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে, এইত তোমার কর্ত্তব্য। আজ যদি হাসপাতাল না থাকিত, যেখানে সেখানে ডাক্তার না থাকিত, তবে কি উপায় হইত; তাহা আর কি বলিয়া দিতে হইবে? আজ যদি তোমার যন্ত্র শস্ত্র ও তদুপযোগী বল বুদ্ধি থাকিত তবে কি করিতে ভাবিয়া দেখ। এমন অনেক স্থলে অনেক ঘটনা ঘটিয়া থাকে যে রোগীকে হাসপাতালে পৌঁছাইতে বা ডাক্তার ডাকিতে ডাকিতেই প্রাণ পাখী উড়িয়া যায়। সর্ব্বত্রই যে চিকিৎসা সুফল প্রসবিনী হইবে এমন ভাবাও উচিত নহে। এই যে অগণিত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক সর্ব্বত্র বিরাজিত রহিয়াছেন ইহাদের শতকরা একজনও যদি শল্যতন্ত্রে সুপণ্ডিত হইতেন তবু সংসারের কত উপকার হইত! যা' ছিল না তা' আমরাত করিতে পারিই না কিন্তু যা আছে সে বিষয়েও আমরা একান্ত উদাসীন! দেহের একটি অঙ্গ বিকল হইলে অন্য অঙ্গ সবল হয় ইহা ঠিক তাই বলিয়া কি বিকলাঙ্গ কেহ কামনা করে? কখনই নহে। তেমন যদিও শল্য বিদ্যা লুপ্ত হইয়া ক্রমে ২ ঔষধ চিকিৎসা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সে জন্য কি আমরা শল্য বিদ্যাকে পরিত্যাগ করিতে পারি? আমরা যেন আর দুর্ব্বলতার উপর দুর্ব্বলতার দারুণ বোঝা না চাপাই, কর্ত্তব্যে কঠোর হওয়াই মনুষ্যত্ব, সিদ্ধির পথ। এই কর্ত্তব্য পালনের জন্য কঠোর ভাবেই আমাদের অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। ক্ষণিক অবসাদ, অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া স্থায়ী অনাবিল সুখের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা শল্য চিকিৎসা উদ্ধার করিয়া যদি একটি মাত্রও রোগীর প্রাণ বিনিময়ে পাইতে পারি তাহাও আমাদের শ্লাঘনীয়। প্রাণীর প্রাণ রক্ষার তুল্য জগতে আর কি পুণ্য আছে? প্রাণই জগতের সার, প্রাণই পবিত্র, প্রাণই রক্ষণীয়। যে কোন উপায়ে যে কোন অনুষ্ঠানে আমাদের প্রাণের সেবা আর্ত্তের সেবা করিতে হইবে। ইহাই চিকিৎসকের গুরুতর দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য।

পল্লী-চিকিৎসক।

নবম পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

হ—আজ কোন্ বিষয়ে জানিতে চাহেন ?

সু—আজ চর্ম্মরোগ সম্বন্ধে কিছু বলিয়া যাও।

হ—আচ্ছা, এই প্রথমে বিখাউজ (বিকজ) সম্বন্ধে বলিয়া যাই। বিখাউজ-কে স্থল বিশেষে 'কাউর ঘা' ও বলা হয়।

শঠির প্রলেপ দিলে বিখাউজ আরোগ্য হয়।

কুমীরা লতার পাতার উপর পিঠ বা কদম্ব পাতার উপর পিঠ ঘায়ে দিয়া বাঁধিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

এক ভাগ আল্কাতরা ও দুই ভাগ গর্জ্জন তৈল মিশাইয়া প্রলেপ দিলে অথবা বাসী (পান্থা) ভাত পাকা কলা সহ মর্দ্দনান্তে পটী করিলে সত্বরই আরোগ্য হয়।

চিতল মৎস্যের আইশ (চোক্‌লা) পোড়াইয়া কিম্বা সোহাগার খৈ ও মেটে সিন্দুর চালমুগরার তৈল সহ মিশাইয়া প্রলেপ দিলে আরোগ্য হয়।

কলমী লতার আগা ও আদা একত্রে বাটিয়া গরম করিয়া ঘায়ে দিলে সারে।

কাঁচা হরিদ্রা ও নিমপাতা বাটা দ্বারা প্রলেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ দূর হয়।

ভেদা (ফেদা) মাছের নাড়ী ভুবী জলজ আম্বলী (আম্‌লী) পাতার সহিত মর্দ্দন করতঃ পটী করিলে পোকা বাহির হইয়া ঘা শুকাইয়া যায়। তিন বা সাত দিনে নিশ্চয় আরোগ্য। ডাটা পাতা সহ আম্বলী গাছ [illegible] হয়।

হ—এইবার দাদা, পাঁচড়া রোগ সম্বন্ধে কিছু বলি।

সু—আচ্ছা, বল। উঃ, পাঁচড়ায় যাকে ধরে তার বড় কষ্ট। কি চুলকানি, আর কি তীব্র অসহ্য জ্বালা।

আর দাদা, তুমি যে ঔষধই কেন বলিবে না, আমি কিন্তু দেখেছি—ঔষধ বড় বিশেষ একটা ফল ফলে না, তবে আমি যা ঠিক করেছি তাই আগে শোন।

হ—কি বলিতে চা'ন বলুন।

সু—রোগস্থ নটী বেশ করিয়া পরিষ্কার রাখা আর তথায় সর্ষপ তৈল ভাল করিয়া দেওয়া।

হ—এখন আমার কথাটী শুনুন।

মাটিয়া সিন্দুর, সোহাগার খৈ, নারিকেল তৈল, তেলাকুচের পাতার রস এই কয় দ্রব্য একত্র মিশাইয়া প্রত্যহ তিন বেলা মালিশ করিলে পাপড়ী আরোগ্য হয়।

স্নানের পূর্ব্বে তৈল লইয়া মাথায় দিবার আগে পাপড়ী স্থানে তৈল দিয়া পরে তালুতে তৈল দিলে পাপড়ী আরোগ্য হয়।

সু—কিছুই যে বিশ্বাস করিব না। বলিয়া যাও। তবে এখানে একটা প্রত্যক্ষদৃষ্ট ফলের কথা না বলিয়া পারিলাম না।

জনৈক উকিলের পুত্রের মাথায় ঘা হইয়া ভয়ঙ্কর অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। উকিলের নিবাস কলিকাতা। শনিবার তারিখ অতি প্রত্যূষে একটী কচুপাতে করিয়া বান্ধা পুকুরের জল সহ জনৈক ব্যক্তির নিকট উপনীত হইলে পর তিনি উক্ত জলে একটু তুলসী মাটী দিয়া উক্ত উকিল বাবুকে খাওয়াইয়া দিলেন। উকিল বাবুকে বলিলেন যে আপনি বাটী যাইয়া আপনার পুত্রকে তিনবার আলিঙ্গন দিবেন, তারপর তিনদিন পর্য্যন্ত আর ছুইবেন না। উকিল বাবু তাহাই করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহাতেই উক্ত ছেলেটীর রোগ মুক্ত হইতে দেখিয়াছি।

হ—সবই সেই ভগবানের লীলাখেলা। আমরা বুঝি না, তাই আশ্চর্য্য বা হতভম্ব হই।

এখন ছুলি সম্বন্ধে কিছু বলি। ছুলির অপর নাম 'ছোদ'।

সু—যেরূপ তোমার অভিপ্রায়।

হ—সাদা চন্দন ঘসা বা তৎসহ সোহাগার খৈ মিশাইয়া সপ্তাহকাল মালিশ করিলে ছোদ আরোগ্য হয়।

সোহাগার খৈ, কর্পূর ও ঘৃত দ্বারা অগ্নিতাপে মলম প্রস্তুত করিয়া রোগস্থানে মালিশ করিলে সহজে আরোগ্য হয়।

দুর্গা পূজার দর্পণ স্নানের জল লইয়া রোগস্থানে দিলে ছুলি আরোগ্য হয়।

প্রস্তর পাত্রে পাতিলেবুর রসে হরিতাল ঘষিয়া সূর্য্যপক্ক করিয়া ছুলি চুলকাইয়া দিলে তিন দিনে আরোগ্য হয়।

কৃষ্ণ অপরাজিতা ফুলের পাতার রস কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ সহ মিশাইয়া দিলে নিশ্চয়ই ভাল হয়।

শ্বেত চন্দন ঘষিয়া উহার সহিত কিছু দারমুজ মিশাইয়া জল সহযোগে গুলিয়া একদিন মাত্র ছোদে দিতে হয়।

গাড়ু সংক্রান্ত (আশ্বিন মাসের সংক্রান্ত) দিন অথবা শনি কি মঙ্গলবারে প্রাতে একটী হলুদ ফুল এক শ্বাসে তুলিয়া আনিয়া তদ্দারা রোগীর গায়ে কয়েক বার জোড়ে আঘাৎ দিলেও অনেক সময় রোগ আরোগ্য হইতে দেখা যায়।

হ—এইবার 'ঘামাচি'র একটী ঔষধ বলি।

গুলঞ্চের রস শরীরে মাখাইলে উক্ত রোগ সারে।

সু—গুলঞ্চ লতা হইতে যে সকল লম্বা শিকড়ের ন্যায় লতা বাহির হয় তাহার বাকল ফেলিয়া যদি উক্ত লতা গলায় রাখা যায় তাহা হইলেও নাকি উক্ত রোগ সারে। শনি কি মঙ্গলবার উহা সংগ্রহ করিয়া অনেককেই ব্যবহার করিতে দেখা যায়।

হ—হাঁ, তা' বটে।

সু—আজকাল পাঁচড়া রোগে বহু লোকে অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করে তাই খুঁজলি পাঁচড়া সম্বন্ধে কিছু ঔষধ বল।

হ—তিল উত্তমরূপে বাটিয়া পাঁচড়ার মুখে প্রলেপ দিলে অল্প দিনেই আরোগ্য হয়।

কচি বাসকপাতা ও হলুদ একত্রে গোমুত্রে বাটিয়া ক্ষতে প্রলেপ দিলে বা বাসকের পাতা ও ফল চিনির সহিত মর্দ্দন করিয়া লেপ দিলে অথবা থুলকুড়ীর পত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে পাঁচড়া বিনষ্ট হয়।

মাখন ও গন্ধক মিশাইয়া প্রলেপ দিলে অথবা ছয় ভাগ নারিকেল তৈল ও একভাগ গন্ধক চূর্ণ একত্রে মর্দ্দন করিয়া মলম প্রস্তুত করিয়া ক্ষত স্থানে দিলে কিম্বা ঘৃত সহ মুদ্রাশঙ্খ ঘর্ষণ করিয়া তদ্দারা প্রলেপ দিলে পাঁচড়া বিনষ্ট হয়।

পাঁচড়াতে তুঁতিয়া চূর্ণ দিলে অথবা নারিকেলের খোলা (আইচ্যা, আচি) পোড়াইয়া তৈল বাহির করিয়া উহা দিলেও পাঁচড়া সারে কিন্তু ঔষধটী একটু জ্বালাকারক।

চালমুগরা তৈল অথবা উক্ত তৈল খাঁটী সর্ষপ তৈলে পাক করিয়া সেই তৈল বা চালকুমড়া খাঁটী সরিষা তৈলে পাক করিয়া ঘায়ে দিলে সারে।

কুইনাইন ও নারিকেল তৈল একত্রে মিশাইয়া পাঁচড়ায় দিলে আরোগ্য হয়।

গাঁজা ও সর্ষপ তৈল একত্রে জ্বাল দিয়া অথবা গন্ধক, তিল বা নারিকেল তৈল ও নিম পাতার রস একত্রে জ্বাল দিয়া এই তৈল পাঁচড়াতে দিলে রোগ সারে।

নিম পাতা ও কাঁচা হরিদ্রা বাটীয়া তদ্দারা গাত্রমর্দ্দন করিয়া কিয়ৎকাল পরে নিম পাতা সিদ্ধ উষ্ণ জল দ্বারা গাত্র ধৌত করিলে পাঁচড়াদি চর্ম্মরোগ ভাল হয়।

চালমুগরার তৈল ও হরিদ্রা একত্রে বাটিয়া ৩।৪ দিন গাত্রে মর্দ্দন করিলে চুলকনা সারিয়া যায়।

শ্রীগোপীনাথ দত্ত শিক্ষক।
রাজাবাড়ী, ঢাকা।

জীব যন্ত্রে আয়ুর্ব্বেদের বিশেষত্ব।

——(॥✻✻✻॥)——

জগতে এযাবত্ যত প্রকার চিকিৎসা শাস্ত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছে; আয়ুর্বেদ তাহার অন্যতম হইলেও অনগণ্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ শাস্ত্র অপেক্ষা ইহাতে বিশেষত্ব অধিক।

সংসার বিশ্রুত এলিওপ্যাথিক হোমিওপ্যাথিক নামক চিকিৎসা শাস্ত্রদ্বয়ের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা রোগনিরূপণ প্রণালী বা শরীরগত যন্ত্রাদিও তাহার ক্রিয়া লইয়া নহে। রোগের নিদানাদিতত্ত্ব এলিওপ্যাথিক শাস্ত্রে ডাঃ অস্লার মহোদয় কর্ত্তৃক যেরূপ ভাবে নিবদ্ধ হইয়াছে হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রে ডাঃ লড়ি কর্ত্তৃকও সেই তত্ত্বাদি তথা নিবদ্ধ। তাই এলিওপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক উভয় শাস্ত্রের শিক্ষার্থীরা পর পর সম্প্রদায়ভুক্ত গ্রন্থকার লিখিত রোগতত্ত্বাদি পাঠে কুন্ঠিত হন না।

এই শাস্ত্রদ্বয়ের বিরোধ কেবল পদার্থ সমূহের রোগারোগ্য কারিণী শক্তির প্রকার ভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। যথা এলিওপ্যাথিক শাস্ত্র বলিতেছেন যে—রোগোৎপাদক কারণ বা রোগবিরোধী পদার্থ প্রয়োগই রোগ আরোগ্যকর উপায়। তাই তাহারা স্বাভাবিক অবস্থায় যে দ্রব্য প্রয়োগে শরীর উত্তেজিত হইতে দেখেন; প্রকৃতি দত্ত চির সংস্কার অনুসারে সেই দ্রব্যকে অবসন্ন অবস্থায় প্রতিকূল মনে করিয়া তদবস্থায় প্রয়োগকরিয়া থাকেন; এবং ফলও প্রাপ্ত হন। হোমিওপ্যাথ কিন্তু তাহা বলেন না; তিনি বলেন কোন ও দ্রব্য প্রভাবে শরীরে যে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়; ঐ লক্ষণ সমষ্টি যদি মিথ্যাচারাদি অন্য কারণে দেখা দেয়, তাহা হইলে তল্লক্ষণোৎপাদক দ্রব্য প্রয়োগে, তাহা প্রশান্ত হইবে; ইহা মনে করিয়া তাহারই প্রয়োগ নৈপুণ্যে ব্যাধি আরোগ্য করিয়া থাকেন!

এস্থলে এখন এক বিষম সমস্যা উপস্থিত:——

উপায় বিরোধি, ফল এক। বিরুদ্ধ উপায় দ্বারা একরূপ ফলোৎপত্তি সর্ব্বথা অসম্ভব। বৃক্ষ হইতে আম পারিবার জন্য ঢিল উৎক্ষিপ্ত হইলে যে ফল; অবক্ষিপ্ত হইলেও সেই ফলের আশাকারীকে আমাদের সাধারণ সংস্কারানুযায়ী উন্মাদগ্রস্ত বলিতেও বোধহয় কুণ্ঠিত হইবনা? কিন্তু যদি আমরা কখনও প্রত্যক্ষ করি যে, উৎক্ষিপ্ত লোষ্ট্রের ন্যায় অবক্ষিপ্ত লোষ্ট্রের ও আম্র পাতনের ক্ষমতা আছে, তখন আমরা বিস্মিত ভাবে উহার কারণানু সন্ধানে ব্রতী হইয়া স্থির সিদ্ধান্ত প্রচারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নানা প্রকার মতামত প্রকাশ করিতে থাকি।

যতই না কেন আমরা ইহার কারণতত্ত্ব অনুসন্ধান করি, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বৃক্ষ হইতে অম্রপতনের কারণ বোঁটা হইতে তাহার বিভাগ; ইহা যে প্রকার কৃত নিশ্চিত, রোগারোগ্যরূপ ফলোৎপত্তির প্রতি ও যেটি সাক্ষাৎ হেতু তৎ সাধনের জন্য এলিও হোমিওপ্যাথ সমস্তকেই সমান কর্ত্তৃত্ব সম্পন্ন হইতে হইবে!

বৃন্তসংলগ্ন আম্রকে, বৃন্ত যে প্রকার মাধ্যাকর্ষণের শাশ্বতিক প্রভাবের গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার শক্তি পরিচালনা করত তাহার সহিত দ্বন্দ্বে জয়ী হইয়া অম্ররক্ষা ব্যাপার সাধন করিতেছে। তাহাকে ভূপাতিত করিতে হইলে

যে প্রকারেই হউক বৃন্তনিষ্ঠ মাধ্যাকর্ষণবিরোধি শক্তিকে অভিভূত হইতেই হইবে। কেহ কোটা দিয়া কেহ ঝাকাইয়া, কেহ লোষ্ট্র নিক্ষেপে, কেহ কালের হাতে ছাড়িয়া দিয়া আম্রের পাতন কার্য্য সমাধান করিয়া থাকেন।

কিন্তু এই পাতন কার্য্য সাধনে যে ব্যক্তি যত প্রকার উপায় অবলম্বন করুক না কেন তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রতি বৃন্তের রক্ষণ শক্তির অভাবই সাক্ষাৎ হেতু উক্ত বৃন্তনিষ্ঠ গ্রহণ শক্তি যখন একমাত্র আম্র সংস্থিতির সাক্ষাৎ হেতু তখন তন্নিশ্চ্যুতি মাত্র তৎ পতনের সাক্ষাৎ কারণ।

রোগ সম্বন্ধে ও এই বিশ্বব্যাপি প্রাকৃতিক নিয়ম এইরূপ যথাঃ—ম্যালেরিয়া-বিষদুষ্ট কোন মশক তোমাকে দংশন করিল দংশন কালীন তাহার শূলাগ্র ভাগ হইতে ম্যালেরিয়া বীজ তোমার রক্তে প্রবিষ্ট হইয়া যথাসময়ে কম্প, জ্বর, দাহ, প্লীহা বৃদ্ধি প্রভৃতি আপন প্রভাব প্রকাশ করিল।

এস্থলে এলিওপ্যাথ মহোদয়গণ মনে করেন, মশক জনিত ম্যালেরিয়া বীজের বংশ রক্ত মধ্যে বৃদ্ধি পাইয়া যখন এই সমস্ত লক্ষণ উৎপন্ন হইয়াছে; তখন যদি এরূপ একটী ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারি যাহা কীটকুল নাশে সমর্থ তাহা হইলেই তত্কৃত কম্পাদি রূপ জীবন প্রতিকূল লক্ষণের উপশম হইবে। কারণ তাঁহারা দেখিতে পান ম্যালেরিয়া জীবাণুর সংখ্যা ও প্রভাবের তারতম্যের উপর রোগ লক্ষণের তারতম্য নির্ভর করে। তাই তাহার তিরোধানই রোগারোগ্যকর যুক্তিসিদ্ধ প্রশস্ততম উপায়, ইহাই মনে করিয়া তাঁহারা ম্যালেরিয়া নাশক কুইনাইন ব্যবহার করিয়া থাকেন; ফলও প্রাপ্ত হন।

হোমিওপ্যাথ কিন্তু তাহা অস্বীকার করতঃ কম্পদাহাদি আনয়নকারক দ্রব্য সূক্ষ্ম মাত্রায় ব্যবহার করিয়া, সমবৈধানিক Semelement নিয়মানুসারে এলিওপ্যাথিকের সেই কুইনাইন সাধ্য ব্যাধিই আরোগ্য করিয়া থাকে।

যে ভাবেই যে কোন বিজ্ঞান যে কোনও রোগ আরোগ্য করুক না কেন; যাহা রোগ স্থিতির হেতু সকল বিজ্ঞানকেই তাহার বিরোধি হইতে হইবে। নতুবা সে রোগের আরোগ্যের আশা নাই।

সহস্র চেষ্টায় ও কেহ জল স্পর্শ না করিয়া তাহাতে অবগাহন করিতে পারে না।

রোগরূপ কার্য্যে যে কারণের সহিত দৃঢ় সংবদ্ধ, তাহার উচ্ছে

যখন কোন ও প্রকারেই রোগ আরোগ্যের সম্ভাবনা নাই, তখন এলিওপ্যাথিই বল আর হোমিওপ্যাথিই বল, উভয়কেই যখন একই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইবে, তখন উহাদের মধ্যে যে প্রভেদ তাহা উদ্দেশ্য নিষ্ঠ নহে; উহা দ্রব্যগত প্রয়োগ প্রণালী নিষ্ঠ। কথাটা আর ও একটু স্পষ্ট করিয়া বলি।—

কার্য্য মাত্রেরই কারণ আছে, ইহা এলিওপ্যাথ হোমিওপ্যাথ কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না, অতএব রোগের প্রতি যাহা কারণ, হয় তাহার উচ্ছেদ, অথবা অভিভব সাধন ব্যতীত শান্তির আশা নাই। যদি কোনও রূপ উপায় থাকে, তাহা হইলে উহা উহার কারণই হইতে পারে না। মনে কর তোমার শরীর অবসন্ন হইল বলিয়া নাড়ী ক্ষীণতাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইল, তুমি এলিওপ্যাথ, অতএব উত্তেজক দ্রব্যপ্রয়োগে অবসন্নতা দূর করিলে সুতরাং তন্মূলক নাড়ীক্ষীণতাদি দোষ অনায়াসে দূরীভূত হইল। হোমিওপ্যাথ ও তাহা দূর করিবেন অবসন্নতা দূর করিয়া, কারণ অবসন্নতাই এখানে নাড়ীক্ষীণতাদির সাক্ষাৎ হেতু। কিন্তু সে অবসন্নতা দূর করিবে ভিন্ন উপায়ে, অবসাদক ঔষধ আবার এরূপ হওয়া চাই, যাহা প্রয়োগে তথাবিধ অবস্থা উপস্থিত হইতে পারে নতুবা ঔষধ ঠিক হইল না।

জীবযন্ত্রে, বিরুদ্ধ গুণ পদার্থ দ্বারা সমান উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় কি প্রকারে, আমি ইহার আভাস প্রদান করিয়াই অদ্যকার মত প্রবন্ধের উপসংহার করিব। অনতিক্রম্য প্রাকৃতিক নিয়মের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া, এ জগতের কোনও বস্তু দ্বারাই কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। মনে কর তোমার জ্ঞান বিজ্ঞানাকর মস্তিষ্ক অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া এমন একটী যন্ত্র নির্ম্মাণ করিল, যাহাতে দম দিবা মাত্র ঘুরিতে লাগিল, ফিরিতে লাগিল, তোমাকে আমাকে সেলাম করিতে লাগিল। দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলাম, কিন্তু ক্রমশঃ অনুসন্ধানে বুঝিতে পারিলাম যে উহা আর কিছুই নহে, যাহা সতত আমাদিগের চক্ষুর সম্মুখে প্রকৃতি দেবীর অঙ্গুলী সঙ্কেতে সম্পাদিত হইতেছে, যাহা দেখিতে ২ আর আমাদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে না, এইরূপ ইতস্ততোবাতবিক্ষুব্ধ কাগজ খণ্ড যে নিয়মের অধীন হইয়া ঘুরিতেছে ফিরিতেছে উর্দ্ধে উঠিতেছে নিম্নে নামিতেছে, বৈজ্ঞানিকের অসাধারণ মস্তিষ্ক প্রসূত যন্ত্র-কার্য্যও সেই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া তথাবিধ ব্যাপার সাধন করিতেছে।

বিশ্বজগতে যে কয়টী শাশ্বতিক নিয়ম আছে, যদি তাহার বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা থাকিত;—যদি পৃথিবী বলকে আকর্ষণ করিয়া নিজের কোলে আনিত, কখন বা খেয়াল করিয়া উপরে ঠেলিয়া দিত, তাহা হইলে ডাক্তার, কবিরাজ, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক সকলকেই হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকিতে হইত। কোন বৈজ্ঞানিকই কোনরূপ কলকজ্জা লইয়া কিছুই ধারণা করিতে পারিত না। ভাগ্যক্রমে তাহা না হইয়া প্রাকৃতিক নিয়ম অলক্ষ্যরূপে দাঁড়াইয়া আছে;—তাই আজ বিজ্ঞান, দর্শন, রসায়ন প্রভৃতির নাম আমাদের শ্রুতিপথের পথিক রূপে বিদ্যমান। নতুবা উহাদের নাম মাত্র শ্রুত হইত কিনা সন্দেহ। কেহ শ্রবণ কর্ত্তা বা বক্তা থাকিত কিনা সে বিষয়ও সন্দেহ।

যাহার দৃষ্টিশক্তি যতদূর প্রখরা, তিনি প্রকৃতি দেবীর নিকট হইতে ততদূর শিক্ষা লাভ করতঃ, নানাপ্রকার যন্ত্রাদি-কার্য্যসাধনোপায় প্রণয়ন করিয়া তাঁহারই অলক্ষ্য আদেশ প্রতিপালন করতঃ জগতে নানাপ্রকার হিতাহিত সাধনে সমর্থ হয়। এই দৃষ্টিশক্তির তারতম্য অনুসারেই জীব উৎকৃষ্টানুৎকৃষ্ট বিশেষণ ভাগী হইয়া থাকে। প্রোক্ত শক্তি আবার যাহার যতই প্রখরা কিম্বা ক্ষীণা হউক, উহা সহজ সংস্কারকে অতিক্রম করিতে পারে না। যাহা কাহারও নিকট হইতে শিক্ষা করিতে হয় না, প্রকৃতি আপনিই সময় মত যে মন্ত্র শিক্ষা দিয়া থাকেন, তাহার সাধনস্বরূপ আহার নিদ্রাদি প্রবৃত্তিই সহজ সংস্কার নামে অভিহিত। উহা আহার নিদ্রাদি বহু ভাগে বিভক্ত হইলেও সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—উপাদেয়গ্রহণেচ্ছা, হেয়ত্যাগেচ্ছা, এবং অনাবশ্যক বস্তুতে উপেক্ষা।

সদ্যপ্রসূত শিশু, নাভিনাড়ী কর্ত্তনে মাত্র মাতৃরক্ত না পাইয়া যে “ওঁয়া” “ওঁয়া” করিয়া খাদ্যাভাব জানাইয়া দেয় এবং মাতৃস্তন্য মুখপ্রক্ষিপ্ত হইবামাত্র চুষিতে থাকে, এই উপাদেয় গ্রহণেচ্ছাভিব্যঞ্জক স্বরপ্রয়োগ, চুষণপ্রণালী, উভয়ই উপাদেয় গ্রহণেচ্ছা-বিষয়-সিদ্ধি-সাধনোপায়। কিন্তু তাহার মধ্যে ক্রন্দন অভিব্যঞ্জক এবং আচুষণ সাধক বলিয়া পরিগণিত হইলেও উহারা প্রত্যেকেই উপাদেয় গ্রহণান্তর্গত।—কারণ মুখ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল সাধনীয় বিষয় প্রত্যেকেই উপাদেয়।

এইরূপ যদি উক্ত শিশুর হাতে চিমটী কাটা যায়, তাহা হইলে সে তাহার হাত গুটাইয়া লইবার চেষ্টা করিবে ও চিৎকার করিয়া মনোবেদনা জানাবে। ইহা হইল তাহার স্বতঃসিদ্ধ হেয় বর্জ্জনের চেষ্টা।

এক ভাবে দেখিতে গেলে হেয় বর্জ্জন ইচ্ছার সহিত উপাদেয় গ্রহণেচ্ছার কোন প্রভেদ নাই। মনে কর বালক যখন চিমটী খাইতেছে তখন তাহার মনে, চিম্‌টী যখন না খাইত সেই সময়ের অবস্থা, বর্ত্তমান অবস্থাপেক্ষা উপাদেয়। বালকও সেই অবস্থা পাইলে যখন ক্রন্দনাদি হইতে নিবৃত্ত হয় তখন চিম্‌টী রূপ হেয় বর্জ্জন চেষ্টাই চিম্‌টীর পূর্ব্ববর্ত্তীরূপ উপাদেয়তর অবস্থা প্রাপ্তির ইচ্ছাও প্রচেষ্টা। মশকদংশন করিতেছে এস্থলে মশক হেয় বলিয়া মারিলাম; মারিলাম কিন্তু উপাদেয়ের আশায়। পক্ষান্তরে উপাদেয় গ্রহণকেও হেয় বর্জ্জনের অন্তর্গত করিতে পারা যায়,। সে যাহাই হউক আমরা সহজ সংস্কারক হেয় বর্জ্জনাদি তিন ভাগেই বিভক্ত করিলাম।

(বারান্তরে সমাপ্য)

শ্রীনগেন্দ্র নাথ সেন গুপ্ত কবিশেখর
কেওড়া, বরিশাল।

উপেক্ষিত লতা গুল্মাদি।

——০)*(০——

৪। স্বর্ণক্ষীরী, দুগ্ধিকা ও নলটুণী

কোন কোন প্রদেশে স্বর্ণক্ষীরীকে ক্ষীরাই বলে। স্থান ভেদে দুগ্ধিকাও ক্ষীরাই নামে প্রসিদ্ধ। আয়ুর্বেদের অনেক স্থলেই স্বর্ণক্ষীরীর প্রয়োগ বিধান আছে। কিন্তু এ প্রদেশে তাদৃশ ব্যবহার না থাকায় উহা আমাদের অপরিচিত। কোন কোন চিকিৎসক দুগ্ধিকাকে স্বর্ণক্ষীরী বলিয়া থাকেন। বস্তুতঃ দুগ্ধিকা স্বর্ণক্ষীরী নহে। কারণ উভয়ের লক্ষণে অনৈক্য দেখা যায় হেম অর্থাৎ স্বর্ণবর্ণের ন্যায় (পীতাভ) ক্ষীর বিশিষ্ট হেতু স্বর্ণক্ষীরী ও হৈমবতী এবং হিমালয় ভূমিজাত জন্য হিমাবতী নামে স্বর্ণক্ষীরী উল্লিখিত হইয়াছে। উহার পত্র নাগ জিহ্বার (অনন্ত মূল) পত্রের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট। স্বর্ণক্ষীরীর মূল বণিজৌষধ। এই বণিজৌষধ চোচ (?) কি অন্য কোন বস্তু তাহা জানিবার উপায় দেখিনা।

আয়ুর্ব্বেদে স্বর্ণক্ষীরী—স্বর্ণদুগ্ধা, স্বর্ণাভা রুক্মিণী, সুবর্ণা, হেমদুগ্ধা ও কাঞ্চনী নামে উল্লিখিত হইয়াছে। স্বর্ণক্ষীরী—শীতল, তিক্ত, ক্রিমিঘ্ন, পিত্ত শ্লেষ্মঘ্ন, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী শোথ দাহ ও জ্বরঘ্ন।

দুগ্ধিকা আমাদের দেশে দুই প্রকার দেখা যায়। পত্রশূন্য নীলাভ দুগ্ধবৎ রসবিশিষ্ট কাণ্ডময় এক প্রকার গুল্মকে ও লঙ্কা মরিচের পত্রের ন্যায় ঈষৎ রক্তাভ ক্ষুদ্রপত্র, দুগ্ধবৎ রসবিশিষ্ট এক প্রকার গুল্মকে দুগ্ধিকা বলে। দ্বিতীয়টী পশ্চিম প্রদেশে ক্ষীরাই নামে এবং আমাদের দেশে দুধল্যা নামে পরিচিত, প্রথমটীকে আমাদের দেশের দুধকুশী বা দুধকোঁড়া বলে, এবং উহাকে যত্ন পূর্ব্বক রোপন করিয়া থাকে। দুগ্ধ বৃদ্ধি জন্য তণ্ডুলের সহিত সিদ্ধ করিয়া সদ্যঃপ্রসূতা গাভীকে সেবন করিতে দেওয়া হয়। ইহা ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে ব্যবহার করিতে দেখা যায় না।

আয়ুর্ব্বেদে দুগ্ধিকা—স্বাদুপর্ণী, ক্ষীরাবা ও ক্ষারিণী নামে পরিচিত। দুগ্ধিকা—উষ্ণবীর্য্যা, গুরু, রুক্ষা বাতলা, গর্ভকারিণী, স্বাদুক্ষীরা, কটুতিক্তা সৃষ্টমূত্র মলাপহা, স্বাদু, বিষ্টম্ভিণী, বৃষ্যা, কফকুষ্ঠ ক্রিমি নাশিকা (ভাব প্রকাশ) স্বর্ণক্ষীরীর গুণের মধ্যে, তিক্ত ও ক্রিমিঘ্ন গুণ দুগ্ধিকাতে আছে, অবশিষ্ট গুণগুলি বিপরীত ভাবাপন্ন; এবং আকৃতিতেও যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায় সুতরাং দুগ্ধিকা স্বর্ণক্ষীরী নহে ইহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু আধুনিক কোন কোন গ্রন্থে স্বর্ণক্ষীরীর ভাষানাম ক্ষীরাই উল্লিখিত হইয়াছে।

নাগজিহ্বিকা অনন্ত মূলের একটী নাম। অনন্ত মূলের পত্র বিশিষ্ট সদৃশ পীতাভ পত্র এক প্রকার লতা আমাদের দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। এই লতার পত্র অনন্ত মূলের পত্র অপেক্ষা একটু বৃহৎ। পত্রের মধ্যভাগে শিরার দুই পার্শ্ব শ্বেতাভ। ইহা জল সমীপস্থ ভূমিতে উৎপন্ন হইয়া, বৃক্ষাদি আশ্রয় করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ছিন্ন হইলে অনন্ত মূলের ন্যায় ক্ষীর অর্থাৎ রস নির্গত হয়। বর্ষাকালে পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, পুষ্প শ্বেত, এবং পৃষ্ঠদেশে বৃন্তের সন্নিকটে কিঞ্চিৎ বেগুণে বর্ণ, চারিটী দলবিশিষ্ট এবং নিম্নাভিমুখী। ফল আকন্দের ফলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, ক্ষুদ্র এবং ফলের শেষ ভাগ ক্রমশঃ সরু। সাধারণতঃ উল্লিখিত লতাকে আমাদের দেশে নলটুনী বলিয়া থাকে। শোথে নলটুনীর ক্বাথ প্রাচীনগণ ব্যবহার করিতেন, অধুনাও

দুই এক জন চিকিৎসক প্রাচীনগণের প্রদর্শিত পথাবলম্বনে শোথে ব্যবহার করিয়া থাকেন। পত্রাদির আভা এবং আকৃতি, বর্ণিত স্বর্ণক্ষীরীর তুল্য। নলটুণীর ক্বাথ সেবনে মূত্রকৃচ্ছ্র ও শোথ বিদূরিত হইতে দেখা যায়। অন্যান্য গুণ আছে কিনা তাহা এ যাবৎ কেহ পর্য্যালোচনা করেন নাই। স্বর্ণক্ষীরী শোথঘ্ন ও মূত্রকৃচ্ছ্রঘ্ন সুতরাং স্বর্ণক্ষীরীর সহিত নলটুণীর অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে। অবশ্য ইহাও স্বীকার্য্য যে স্বর্ণক্ষীরীর ন্যায় স্বর্ণবর্ণ ক্ষীর বিশিষ্টা নহে। স্বর্ণক্ষীরী হিমবৎ ভূমিসম্ভবা এইজন্য হিমালয়জাত বলিয়া অনেকেই বলিয়া থাকেন। এই হিমবৎ ভূমি অর্থে জলাসন্ন ভূমিও হইতে পারে। যদিও নলটুণীকে নিঃসন্দেহে স্বর্ণক্ষীরী বলা যায় না, তথাপি পত্রাকৃতি, উৎপত্তিস্থান গুণ ও বর্ণ সম্যক্ আলোচনা করিলে, স্বর্ণক্ষীরী বলা অসঙ্গত নহে, যে হেতু হিমবৎ অর্থে হিমালয় অর্থ করিলে, এতদ্দেশে স্থানভেদে, ক্ষীরের (রস) বর্ণ পরিবর্ত্তিত হওয়া অসম্ভব নহে। আয়ুর্ব্বেদে নলটুণী বা তদর্থবাচক কোন শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু শোথ ও মূত্রকৃচ্ছ্রে ব্যবহারে বিশেষ ফল দেখা যায়। (ক্রমশঃ)

কবিরাজ শ্রীকুমুদনাথ সেন ব্যাকরণতীর্থ, বৈদ্যরত্ন।
নাটোর।

বৈদ্যক গ্রন্থবিবরণী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

২২। আয়ুর্ব্বেদ মহোদধি।

আয়ুর্ব্বেদ মহোদধি, সুষেণ দেব কর্ত্তৃক বিরচিত। যে সকল মহাবীরের সাহায্য লইয়া রামচন্দ্র সীতার সমুদ্ধার করিয়াছিলেন, রাজবৈদ্য সুষেণ তাঁহাদিগের অন্যতম ছিলেন, ইহা রামায়ণে কথিত হইয়াছে।

গ্রন্থকার, গ্রন্থের অন্তভাগে বলিতেছেন ;—

"এযোঽন্নপানস্য বিধি র্ময়া কৃতো
লোকে হিতার্থায় সুহৃদ্মভীভূতাম্।
রসস্য সর্ব্বস্য গুণাশ্চ দোষা,
ময়া শ্রুতাঽগস্ত্যমুখাৎ সমগ্রাঃ॥"

মহামুনি অগস্ত্যই সুষেণের আয়ুর্ব্বেদ উপদেষ্টা ছিলেন, উল্লিখিত শ্লোক দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণীকৃত হইয়াছে। সংসারে বর্ত্তমান থাকিলে, যাহা নিত্য প্রয়োজন, সেই অন্ন ও পান অর্থাৎ আহার্য্য বস্তুর দোষ ও গুণসমুহ গ্রন্থকার কর্ত্তৃক এই গ্রন্থে বিশদভাবে বিরচিত হইয়াছে।

২৩।২৪। শতশ্লোকী ও তট্টীকা।

ত্রিমল্ল ভট্ট একশত সংখ্যক শ্লোকে পরিপূর্ণ দ্রব্যগুণ বিষয়ক যে অতি সুন্দর গ্রন্থ (শতশ্লোকী) রচনা করিয়া গিয়াছেন, কৃষ্ণ দত্ত প্রণীত তাহার টীকার নাম "দ্রব্যদীপিকা"। কৃষ্ণ দত্তের পিতার নাম শিব দত্ত। শিব দত্ত তাঁহার পিতা চতুর্ভুজের নিকট হইতে বিদ্যাশিক্ষা করেন। চতুর্ভুজ নিজগুণে সকলেরই বন্দনীয় ছিলেন।

২৫। বটক শতক।

বটক শতক, শ্রীমিশ্র পদ্মানন্দের পুত্র গোপানন্দ কর্ত্তৃক বিরচিত। বৈদ্যক সংহিতার (নামের উল্লেখ নাই) তৃতীয় অধ্যায় মাত্র। ইহাতে অভাবে দ্রব্য পরিগ্রহণ ও নানারোগের যোগসমূহ উপনিবদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থে "অশ্বিনী-কুমার" কৃত গ্রন্থের উল্লেখ দেখা যায়।

২৬। বৈদ্য মুক্তাবলী।

হরিদাস, এই গ্রন্থ-প্রণেতা। গ্রন্থোক্ত প্রতিপাদ্য বিষয়, যথা;—আয়ুর্ব্বেদোৎপত্তি, বৈদ্যোৎপত্তি, আয়ুর্ব্বেদ লক্ষণ, দূতজ্ঞান, রোগ পরীক্ষা, রসাদির উৎপত্তি, কলা, দোষ, ব্যাধির ভেদ, নাড়ী, জিহ্বা, নাসা ও মূত্র পরীক্ষা, পারিভাষিক মান, স্নেহাদির ভক্ষণ মাত্রা, পাক বিধান, কষায় বিধি, পঞ্চ কর্ম্ম, রস ও ধাতু প্রভৃতির শোধন, মারণ, গুণ এবং রোগসমূহের চিকিৎসা বিধি। এই গ্রন্থে মোট ৪ উল্লাস বা অধ্যায় আছে। বৈদ্যমুক্তাবলী গ্রন্থে, রাজবল্লভ দ্রব্যগুণের উল্লেখ আছে, সুতরাং ইহা রাজবল্লভের পরবর্ত্তী কালে বিরচিত।

(ক্রমশঃ)

কবিরাজ শ্রীমথুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থ, কবিচিন্তামণি।
২ নং বালাখানা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদীয় মুষ্টিযোগ।

(প্রেরিত)

পীনস রোগে জলের নস্য।

একজন প্রৌঢ় বয়স্কা স্ত্রীলোকের সামান্য সর্দ্দিকাস হয়। জনৈক প্রাচীন কবিরাজ তাহার চিকিৎসা করেন। চিকিৎসায় রোগিনীর কোন উপকার হওয়া দূরে থাকুক, বরং প্রভূত অপকারই হইল। শ্লেষ্মা শুষ্ক হইয়া কাস অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল। অবিরত শুষ্ক কাস, কাসিতে কাসিতে প্রাণান্ত হইত ;— এক বিন্দু শ্লেষ্মা নির্গত হইত না। কাসিতে কাসিতে বুকে, পাঁজরে ও পেটে ব্যথা হইল। কাসিতে কাসিতে অনেক সময় বমি হইয়া যাইত। এইরূপ অবস্থায় স্ত্রীলোকটীর চিকিৎসার ভার আমার উপর ন্যস্ত হয়। আমি চন্দ্রামৃত রস ও একটী পাচন ব্যবস্থা করিলাম। এই ব্যবস্থায় ৭।৮ দিনে রোগিনী আরোগ্য ভাল করিল। কিছু দিন বেশ ভাল আছে, পরে পুনরায় তাহার সর্দ্দি কাস দেখা দিল। এই স্ত্রীলোকটী স্নানাহার সম্বন্ধে বড়ই যথেচ্ছাচারিণী ছিল। যাহা ইচ্ছা হইত, তাহাই খাইত ; যখন অবসর পাইত, স্নান করিত ; এইরূপ অনিয়মের ফলে এই সর্দ্দিকাসে সে অনেক দিন ভুগিতে লাগিল। এক্ষণে ঔষধ দিলেও আর ব্যবহার করেনা। এই লোকটীর স্বভাবই এইরূপ, রোগের যন্ত্রণা নিতান্ত অসহ্য না হইলে, সে কিছুতেই ঔষধ খাইতে চাহেনা। এইরূপে তাহার রোগ ক্রমশঃ কঠিন হইতে লাগিল। প্রত্যহ হাঁচি হয়, অল্প অল্প কাস, নাক সর্ব্বদা বন্ধ, নাক ঝাকিলে শ্লেষ্মা নির্গত হয় না ; ক্রমে তাহার ঘ্রাণ শক্তি বিলুপ্ত হইল, স্বরযন্ত্র নিষ্ক্রিয় হইয়া বাক্যোচ্চারণের ক্ষমতা রহিত হইল। স্ত্রীলোকটীর দন্তরোগও ছিল। ২।৩টী দাঁত অল্প অল্প নড়িত, সময় সময় দন্তবেষ্ট স্ফীত হইয়া তাহাতে বেদনা হইত এবং তজ্জন্য গাল পর্য্যন্ত ফুলিয়া উঠিত। সহসা একদিন রাত্রে সে দাঁতের গোড়ার বেদনায় অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িল। জিজ্ঞাসা করিলে বলিল, যে তাহার দাঁতের গোড়া হইতে মাথা পর্য্যন্ত কে যেন সূচিকা দ্বারা বিদ্ধ করিতেছে, কুঠার দ্বারা আঘাত করিতেছে ,—এতই ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা। সে যন্ত্রণায় অধীর হইয়া করুণ স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল ; শয্যায় গড়াগড়ি দিতে লাগিল। দাঁতের

গোড়ার বেদনার চিকিৎসা চলিতে লাগিল। অনেক রাত্রে বেদনা কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইল এবং রোগিনী ঘুমাইয়া পড়িল। ৪।৫ দিন ভাল আছে, আবার একদিন রাত্রে সেইরূপ বেদনা। এবারও পূর্ব্ববৎ চিকিৎসায় রোগিনী কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিল। কয়েক দিন পরে তাহার তালুগ্রন্থি স্ফীত হইয়া তাহাতে অল্প অল্প বেদনা হইল। কিন্তু ইহার কোন চিকিৎসা করিতে হইল না, ৫।৭ দিন পরে তাহা স্বতঃই অন্তর্হিত হইল। কিন্তু ১০।১২ দিন পরে পুনরায় তালুগ্রন্থি ফুলিয়া উঠিল এবং ২।৪ দিন থাকিয়া মিশাইয়া গেল। এক্ষণে এই রূপই চলিতে লাগিল;—তালুগ্রন্থি ফুলিয়া ২।৩ দিন থাকে, আবার স্বতঃই মিশাইয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত দাঁতের গোড়ার বেদনা বা মাথার বেদনাও তদ্রূপ। ৪।৫ দিন পরে একদিন বেদনা উঠে, দাঁতের গোড়ায় ঔষধ দিলে এবং মস্তকে তৈলাদি মর্দ্দন করিলে বেদনা প্রশমিত হয়, আবার একদিন হঠাৎ রোগিনী বেদনায় অধীর হইয়া পড়ে। কিছুদিন পরে তাহার তালুগ্রন্থি স্ফীত হইয়া ব্রণে পরিণত হইল, তাহাতে দুইটী ছিদ্র হইয়া অল্প অল্প পূযস্রাব হইতে লাগিল, মুখে দুর্গন্ধি এবং আহারীয় পদার্থ গলাধঃ করণে কষ্ট হইল। তালুব্রণের চিকিৎসায় ৪।৫ দিনে উক্ত ব্রণ আরোগ্য হইল। তালুব্রণ আরোগ্য হইল বটে, কিন্তু তালুগ্রন্থি যে মধ্যে মধ্যে প্রায়ই ফুলিয়া উঠিত তাহা আরোগ্য হইল না। পূর্ব্বের ন্যায়ই সময় সময় তালুগ্রন্থি ফুলিত এবং কয়েক দিন পরে আপনা হইতেই তাহা বিলীন হইত, কোন কোন বার বা ব্রণে পরিণত হইত, ব্রণের চিকিৎসা করিলে তাহা আরোগ্য হইত। এই সময় রোগিনীর নাসারন্ধ্রে ক্ষত দেখা দিল; ভ্রু, শঙ্খদেশ ও নাসিকায় অত্যন্ত বেদনা হইল। বেদনা এতই প্রবল হইল যে ঐ সকল স্থান হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলেও রোগিনী কষ্টানুভব করিত। এই স্ত্রীলোকটীর অতি পূর্ব্বে—যৌবন কালে একবার উপদংশ রোগ হইয়াছিল। তাহার এই বক্ষ্যমান রোগ উপদংশেরই ভীষণ পরিণাম মনে করিয়া, তাহাকে কিছুদিন তদনুযায়ী চিকিৎসা করিলাম। কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র ফল হইল না, বরং দিন ২ রোগ বৃদ্ধিই হইতে লাগিল। তখন বড় ফাঁপড়ে পড়িলাম। কি ঔষধ ব্যবস্থা করিব চিন্তা করিতেছি, এমন সময়—

"ব্যঙ্গ বলী পলিতঘ্নং পীনস বৈস্বর্য্য কাসহরম্।
রজনী ক্ষয়েহম্বু নস্যং রসায়নং দৃষ্টিজননঞ্চ॥"

এই শ্লোকটী মনে পড়িল। কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলাম। ভাবিলাম, আপাততঃ ইহাই ব্যবহার করাইয়া দেখি, দেখা যাউক কি ফলে উপনীত হইতে পারি। অন্ততঃ ঔষধটীর পরীক্ষাও ত হইবে। তখন রোগিনীকে বলিলাম, তুমি কা'ল হইতে প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই পরিষ্কার শীতল জলের নস্য গ্রহণ করিবে। বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা বাম নাসারন্ধ্র টিপিয়া ধরিয়া, দক্ষিণ হস্তে জলগণ্ডূষ গ্রহণ করতঃ সেই জল দক্ষিণ নাসারন্ধ্র দ্বারা খুব জোরে টানিয়া লইবে; পরে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসারন্ধ্র টিপিয়া, বামহস্তে জলগণ্ডূষ লইয়া সেই জল বাম নাসারন্ধ্র দিয়া টানিবে। এইরূপে কিছুদিন জলের নস্য গ্রহণ করিলে তোমার এই ব্যারাম নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। পরদিন হইতে রোগিনী জলের নস্য লইতে আরম্ভ করিল। প্রথম ২।৩ দিন কিছু উপকার বুঝা গেল না। চতুর্থ দিন হইতে তাহার নাসাপথ অবলম্বনে নানাবর্ণের শ্লেষ্মস্রাব হইতে লাগিল। লাল, হলদে, কালো, সাদা, পূঁযের মত, গাঢ়, তরল কত প্রকারের যে শ্লেষ্মা নির্গত হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। নাক ঝাড়িলেই উহা অক্লেশে বাহির হইয়া আসিত এবং রোগিনী তাহাতে বড়ই সোয়াস্তি লাভ করিত। ইহার পর স্থূল চর্ম্মখণ্ডের ন্যায়, সুসংহত শুষ্ক শ্লেষ্মসমূহ খণ্ডে খণ্ডে নির্গত হইতে আরম্ভ হইল। এই সকল শ্লেষ্ম খণ্ড নাক ঝাড়িবামাত্র অনায়াসে বাহির হইত না; রোগিনী বলিত, এই শ্লেষ্মখণ্ডসমূহ তাহার নাসিকাভ্যন্তরে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থানে আসিয়া কেমন এক প্রকার সুড়্‌সুড়্ করিত, তখনই নাক ঝাড়িতে হইত, অনেক ক্ষণ নাক ঝাড়িতে ঝাড়িতে শ্লেষ্মখণ্ড বহির্গত হইত। কিন্তু কোন কোন খণ্ড স্থূলতা প্রযুক্ত সহজে বাহির হইতনা, নাসারন্ধ্রে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া কষ্টে বাহির করিতে হইত। আবার কোন কোন খণ্ড এতই স্থূল ছিল, যে অঙ্গুলি দিয়া ও তাহা বাহির করা যাইত না, সরু চিমটা বা শোন দ্বারা ধরিয়া অতি কষ্টে টানিয়া বাহির করিতে হইত। শোনদ্বারা বাহির করিবার সময় রোগিনী মনে করিত, যেন তাহার নাসিকা বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। সেই শ্লেষ্ম খণ্ড সমূহ এতই শক্ত ছিল, যে টানিলে ছিঁড়িতনা বা সামান্য আঘাতে ভাঙ্গিত না। এইরূপ শ্লেষ্মস্রাব প্রায় দুই মাস কাল ছিল। শ্লেষ্ম নির্গত হইত, আর সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ রোগিনীর ষষ্টি" দ রোগ লক্ষণ সমূহ হ্রাস হইতে

থাকিত। এই রূপে প্রায় দুই মাসে রোগিনী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া পূর্ব্বস্বাস্থ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইল।

আমি জলের নস্যের আশ্চর্য্য উপকারিতা ও ঋষি জ্ঞানের গভীরতা প্রত্যক্ষ করিয়া পরম পুলকিত হইলাম।

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী।
গজের কুটী পোঃ নাওডাঙ্গা, (রঙ্গপুর)

(প্রেরিত)

প্লেগ বিষয়ক প্রশ্নোত্তর।

(হিন্দীর অনুবাদ)

শ্রীমান মহোদয়,

আপনার অমূল্য পত্রিকায় নিম্নলিখিত সূচনাটির স্থান দান করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

সংবৎ ১৯৭০ অব্দের নিখিল ভারতবর্ষীয় চতুর্থ বৈদ্যসম্মেলনের যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহার পঞ্চদশ প্রস্তাবে প্লেগ ও অন্যান্য রোগ সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করণার্থ এক অনুসন্ধান সমিতি (কমিশন) গঠন করিবার নির্দ্ধারণ হইয়াছিল, তদনুসারে বৈদ্য সম্মেলনের স্থায়ী সমিতি আয়ুর্ব্বেদমহামণ্ডল নিজ সমুদয় সভাসদ এবং বৈদ্য মহোদয়গণের সম্মতি লইয়া এক প্রশ্নাবলী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। অতএব সমুদয় বৈদ্য মহোদয়গণের নিকট প্রার্থনা এই যে, প্লেগ বিষয়ক ঐতিহাসিকতত্ত্ব, নিদান, রোগনিশ্চয় এবং তৎপ্রতিবন্ধকউপায় সকল তাঁহারা নির্দ্ধারণ করিয়া সমিতিকে জ্ঞাপন করেন। বৈদ্য মহোদয়গণ উক্ত প্রশ্নাবলীর জন্য প্রধান কার্য্যালয়ে নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন। আশাকরি সকলেই এই সকল প্রশ্নাবলীর যথোচিত উত্তরসকল নিশ্চয় করিয়া এই ভয়ানক রোগের তত্ত্বানুসন্ধানে সহায়ক হইবেন।

ভবদীয়—শ্রীজগন্নাথ প্রসাদ শুক্ল, মন্ত্রী আয়ুর্ব্বেদ মহামণ্ডল।

মন্তব্য—আমরা শীঘ্রই আয়ুর্ব্বেদ বিকাশের পাঠক বর্গের অবগতির নিমিত্ত উক্ত প্লেগ বিষয়ক প্রশ্নাবলী প্রকাশ করিব। আঃ বিঃ সঃ।

অজ্ঞতা ও সুলভতার পরিণাম।



দুই কারণে ভারতবাসীর অধঃপাত ঘটিতেছে, এক কারণ আয়ুর্বেদে অনভিজ্ঞতা, অন্য কারণ সস্তায় দ্রব্যক্রয়। মানুষ কোন্ সময়ে বিবাহ করিবে, কোন্ নিয়মে জীবন পরিচালিত হইবে, কেমন করিয়া দীর্ঘজীবী হইবে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতানিবন্ধন নানা রোগে সমাক্রান্ত হইয়া অকালে কালকবলে পতিত হইতেছে। প্রত্যেক মনুষ্যেরই আপনার প্রাণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম, কিন্তু তথাপি মানুষ বর্ব্বরতাবশতঃ প্রাণ বাঁচাইবার দিকে একবারও দৃষ্টিপাত করে না। কেহ কেহ বা গর্ভে গর্ভেই বিবাহ দেন—কেহ কেহ বা নাড়ীকাটার পরই ঢাক ঢোল বাজাইয়া বধূসমাগমের আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন।

"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।"

একথা লোকে জানেন, এই মহাজনবাক্যটী পুনঃ পুনঃ আম্রেড়নও করিয়া থাকেন। কিন্তু তথাপি কেহ শরীররক্ষার দিকে কোনও যত্ন না করিয়া বরং শরীরকে অত্যন্ত কষ্ট দিয়া কৃত্রিম ধার্ম্মিক হইতে অভিলাষী হন। কিন্তু যিনি রুগ্ন ভগ্ন ও অসুস্থ, তাঁহারা কোন দিনই ধর্ম্মানুষ্ঠান হইয়া উঠে না। জগতের যে কোনও কার্য্যই বল, প্রত্যেক কার্য্যের সাধনেই শারীরিক স্বচ্ছন্দতার প্রয়োজন। শরীর সুস্থ থাকিলে মন সুস্থ হয়, মনের সুস্থতাদ্বারা মানুষ ধর্ম্ম কর্ম্ম, সব করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ দেশের একদল লোক, প্রকৃত শিক্ষার অভাবে ভোগ ও বিলাসে মত্ত হইয়া অকালেই কালকবলে পতিত হইতেছেন, আর একদল লোক সস্তায় জিনিষ খরিদ করিতে যাইয়া বিনাশকে ডাকিয়া আনিতেছেন।

"সস্তায় পস্তা।"

এ প্রবাদবাক্যের প্রতি কাহারই লক্ষ্য নাই। ফলতঃ তুমি যাহা খাইবে, তাহা যদি পুষ্টিকর ও টাটকা না হয়—তাহা হইলে সস্তা মূল্যের খারাপ বস্তু খাইয়া তোমার কেন রোগ ও দেহপাত না ঘটিবে?

সকলেই আর্ত্তনাদ করিয়া থাকেন যে—আজকাল আর খাটী জিনিষ পাওয়া যায় না। কেন পাওয়া যাইবে? ভদ্র অভদ্র প্রত্যেকেই অসাধু, সুতরাং

তাহারা কেন প্রতারণা দ্বারা ধনবান্ হইতে না চাহিবে? কিন্তু তোমরা যদি দ্রব্যের উচিত মূল্য দিতে চাহ, তাহা হইলে এরূপ বহু লোক আজিও আছে, যাহারা অকৃত্রিম দ্রব্য দিতে প্রস্তুত। অবশ্য কালমাহাত্ম্যে লোক বৃদ্ধিতে ও বহির্ব্বাণিজ্যে বস্তুর মূল্য বাড়িয়াছে—কিন্তু অকৃত্রিম বস্তু যখন জন্মিতেছে, তখন কেন তুমি অল্প ও অনুচিত মূল্য দিয়া কদর্য্য বস্তু ক্রয় করিতে প্রস্তুত হও?

যদি তুমি কোনও গয়লাকে বল যে—ভাই চর্বি প্রভৃতি মিশাইয়া তুমি যে লাভ কর আমি উহা ধরিয়া দিতেছি তুমি আমাকে খাটি দুধ, ঘৃত ও খাটি মাখন দেও, তাহা হইলে গয়লা অবশ্যই খাটী জিনিষ দিতে বাধ্য হইবে, না দেয় তাহাকে তুমি রাজদ্বারে প্রতারণার জন্য দণ্ডিত করাইতে সমর্থ। দেশের যে সব লোক ভিন্ন দেশের লোকের সংসর্গে পড়িয়া ধর্ম্ম ও সারল্যাদি হারাইয়াছে, তাহাদিগকে বাদ দেও, কিন্তু এখনও দেশে এরূপ ধর্ম্মভীরু বহু লোক আছে, যাহারা ভাল পাইলে মন্দ ব্যবহার করে না।

আমরা মনে করি—যদি দেশের কৃতবিদ্য যুবকেরা দাসত্বের মায়া ত্যাগ করিয়া খাটী দুগ্ধ, খাটী ঘৃত ও খাটী মাখন প্রভৃতির কারবার করেন—তবে তাঁহারা কখনই অকৃতকার্য্য হইবেন না। আজকাল দেশের বহু লোক উচিত মূল্য দিয়া প্রাণ রক্ষা করিতে ব্যস্ত। অবশ্য আর এক দল লোক আছেন—যাঁহারা মূর্খতা ও কৃপণতা বশতঃ সস্তার দিকে আনত—কিন্তু তাঁহাদিগকে স্বয়ং ভগবানও রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না। লোকেরা ভয়েই হউক বা উচিত মূল্য পায় বলিয়াই হউক, সাহেবদিগকে খাটী জিনিষ দিয়া থাকে। সাহেবেরাও ভাবেন যে সমস্ত জগৎটা এই ভাবেই চলিতেছে—সুতরাং আর ভেজাল দমনের চেষ্টা কে করে? সুতরাং দেশীয় লোকের কর্ত্তব্য—তাঁহারা বেশী মূল্য লইয়াও খাটী জিনিষের সরবরাহ করেন। তাহাতে মৃত্যুসংখ্যাও শতকরা অনেক কমিয়া যাইবে, সকলের আশীর্ব্বাদ ভাজনও হইতে পারিবেন। এ পর্য্যন্ত যে সকল দেশীয় লোক দুগ্ধাদির কারবার করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে সাধু অল্প, উপযুক্ত লোকও অল্প।

আমাদিগের মৃত্যুর আর এক কারণ ঐ সস্তায় দ্রব্যক্রয়। ডাক্তার ব্যবস্থা করিলেন যে রোগীর অবস্থা খারাপ। তাহাকে এই ২ ঔষধ আনিয়া খাওয়াও অমনি আমরা সেই ঔষধালয়ে যাইব, যেখানে সস্তায় পাওয়া যায়।

দেখ, বিলাতী ও দেশীয় অনেক ঔষধেরই গুণ ২।৩ মাসের বেশী হয়ত থাকে না। কোন কোন ঔষধ পনর দিনের মধ্যেই খারাপ হইয়া যায়। সুতরাং যাঁহারা টাটকা ঔষধ বিক্রয় করেন—তোমরা তাঁহাদের দোকানে না যাইয়া যদি সস্তার দোকানে যাও, তাহা হইলে তোমার পয়সা বাঁচিবে, কিন্তু রোগী বাঁচিবে না। অথবা যে রোগী তিন টাকার টাটকা ঔষধ খাইলে ১০ দিনে ভাল হইত, অল্প মূল্যের খারাপ ঔষধ খাইয়া হয় ত তাহাকে এক মাসে নীরোগ হইতে হইবে। রোগী যদি উপার্জ্জনক্ষম হয়—তাহা হইলে তাহার সে দিকেও যে কত ক্ষতি, ইহা সস্তা খোর বাবুরা ভাবিয়াও দেখেন না।

বরিশাল, ফরিদপুর, যশোহর ও ঢাকা অঞ্চলের কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর নিরক্ষর লোকের ব্যবসায় মাটিয়া কবিরাজী, তাহারা কৃত্রিম মকরধ্বজ, কৃত্রিম রসসিন্দুর ও কৃত্রিম অভ্রভস্ম প্রভৃতি লইয়া সুদূর মৈমনসিংহ, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট ও চট্টলাদি দেশে যাইয়া বর্ব্বর নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে ঠকাইয়া ছাইভস্ম যাহা তাহা দিয়া অর্থোপার্জ্জন করে। ইহাদের নাম "মাটিয়া কবিরাজ"।

ইহাদের তূণ অক্ষয়, তুমি যাহা চাও—যত দামে চাও, ইহারা তাহাতেই দিতে সমর্থ ও দিয়া থাকে। কেননা উহারা জানে যে—উহারা পয়সার মাল না দিয়াই পয়সা আদায় করিতেছে। দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা স্বচক্ষে বহু ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য কবিরাজকেও উহাদের নিকট হইতে ঔষধ ক্রয় করিতে দেখিয়া থাকি। এই মাটিয়া কবিরাজ দিগের দ্বারা সুদীর্ঘ কাল যাবৎ দেশের লোক প্রতারিত হইতেছেন। বলা বাহুল্য উক্ত সস্তা খোর বাবুরাই ইহাদের নিকট প্রতারিত হইয়া থাকেন।

দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ দেশে দেশে আর এক দল কবিরাজ প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন—যাঁহাদের চৌদ্দ চৌদ্দ পুরুষের মধ্যেও কবিরাজীর সহিত মুলাকাত নাই। তাঁহাদের কেহ বা ভূতপূর্ব্ব কেরাণী, কেহ বা রেলওয়ের বহিষ্কৃত-বুকিং ক্লার্ক ও কেহ কেহ বা পাঠশালার ভূতপূর্ব্ব বৃহস্পতি। ইহারা লম্বা লম্বা সাইনবোর্ড ঝুলাইয়া ও শত শত কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া সস্তায় ঔষধ বিক্রয় করিতেছেন। লাভও প্রচুর পরিমাণে হইতেছে। কিন্তু সস্তাখোর বাবুরা এক বারও ভাবিয়া দেখেন না যে, উহারা কোথা হইতে বহুমূল্য ঔষধ এত সস্তায় দেয়।

অবশ্য প্রকৃত কবিরাজ ডাক্তারেরা ঔষধের মূল্য বেশীই নিয়া থাকেন। তাঁহারা যে প্রকৃত ঔষধ প্রস্তুত করিতে পারেন, তাহার কি একটা মূল্য নাই? তাঁহাদের বহুমূল্য অন্নপুষ্ট যে সকল ছাত্র ও বহুমূল্যে ক্রীত খাটী জিনিষ দিয়া প্রকৃত পদ্ধতিতে ঔষধ প্রস্তুত করে, তাহারও কি একটা মূল্য ধরিতে হইবে না? এখন জিজীবিষু ব্যক্তিরা উচিত মূল্যে ঔষধ ক্রয় করিয়া জীবনরক্ষা করিবেন, না, অল্পমূল্যে ছাইভস্ম যাহা তাহা কিনিয়া অকাল মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিবেন? আমরা সাধারণের মঙ্গলের জন্যই ইহা বলিলাম, আমরা আশা করি, গভর্ণমেণ্টও কঠোর আইন করিয়া যার তার ডাক্তারী কবিরাজী করা বন্ধ করিয়া দিবেন এবং যে সে লোকের হাত হইতেও ডাক্তারী বা কবিরাজী ঔষধের বিক্রয়াধিকার কাড়িয়া লইবেন। ভদ্রবেশধারী প্রতারকেরা যে মানুষ মারিয়া ফেলিল !!

শ্রীউমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

সংবাদ।

—:০*০:—

শ্রীযুক্ত সিদ্ধমোহন মিত্র—ওরফে মিঃ এস এম মিত্র দশবৎসর যাবৎ বিলাতের প্রবাসী। তবে, মিত্র মহাশয়ের এখনও এদেশের উপর টান যায় নাই। এদেশবাসীর প্রতিও তিনি মমতাহীন নহেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি যুদ্ধনিরত ভারতীয় সৈন্যগণের প্রয়োজন বুঝিয়া এদেশ হইতে সুপারি লইয়া ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। মিত্র মহাশয়ের অনুগ্রহে ভারতীয় সৈন্যগণ ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে বসিয়াও কলিকায় করিয়া গুড়ুক তামাক খাইয়া তৃপ্তি বোধ করিতেছে। এবার মিত্র মহাশয় তাহাদের জন্য আর এক জিনিষ পাঠাইতেছেন। ইহা ঔষধ,—খাঁটী ভারতীয় ঔষধ,—শ্রান্তিনাশক পাকতৈল। ফ্লাণ্ডার্সের যুদ্ধক্ষেত্রে বহু বৃটিশ সৈনিক কর্ম্মচারী এই আয়ুর্ব্বেদীয় পাকতৈল ব্যবহার করিয়া সুফল পাইয়াছেন। মিত্র মহাশয় বলেন,—ভারতের কবিরাজেরা ইচ্ছা করিলে তাঁহার নিকট বিবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় পাকতৈল পাঠাইয়া দিতে পারেন। তাহাতে বিদেশে তাঁহাদের তৈলের বিজ্ঞাপন প্রচারের সুবিধা হইবে। মিত্র মহাশয়ের ঠিকানা,—রয়াল এসিয়াটীক সোসাইটি, লণ্ডন।

বঙ্গবাসী।

সংশোধন—৬৬ পৃষ্ঠার সর্ব্ব শেষ পংক্তিতে "উচ্ছেদ ব্যতীত" স্থানে কেবল উচ্ছেদ শব্দ মুদ্রিত হইয়াছে। ব্যতীত শব্দের যোগে পাঠ হইবে।

"প্রাণোবা অমৃতম্ ।" (শ্রুতিঃ)

আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ।

(স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন ও চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র)

"আয়ুঃকাময়মানেন ধর্ম্মার্থ সুখসাধনম্।
আয়ুর্ব্বেদোপদেশেষু বিধেয়ঃ পরমাদরঃ॥ বাগ্‌ভট।

৩য় বর্ষ | ভাদ্র ১৩২২ | ৫ম সংখ্যা।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রবন্ধ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৬। আয়ুর্ব্বেদ মতে শস্ত্রোপচার ব্যতিরেকে ক্ষতাদি চিকিৎসা—

এই কার্য্যটিও চিকিৎসা জগতের এক অভিনব রূপ। সাধারণ লোকসকল ও চিকিৎসকবর্গ শরীরের কোন স্থানে ব্রণ, ক্ষত, পিষ্ট অথবা প্রস্তর কণ্টকাদি আবদ্ধ হইলে শস্ত্রোপচার করিয়াই প্রতিকারে যত্নবান হন। যেমন একটী ব্রণ হইল—ব্রণ হইলেই তাহা স্বাভাবিক নিয়মে পাকিয়া উঠে অথবা পাকিতে বিলম্ব হইলে, পুলটিস প্রভৃতি দ্বারা সত্বর পাকাইবার ব্যবস্থা হয়, পাকিলেও অধিকাংশ ব্রণই আপনা হইতে বিদীর্ণ হয় না, এজন্য উহাকে পক্কাবস্থায় শস্ত্রোপচার করিলেই নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। পাকানের উদ্দেশ্যও কাটিয়া দোষ নির্গত করিয়া দেওয়া। অস্ত্রাঘাতাদি কোন কারণে একটী বৃহৎ ক্ষত উপস্থিত হইল, তাহাতে হয়ত

কোন মাংসপেশী অথবা কোন অবয়বাদি বিচ্ছিন্নপ্রায় হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে, এমতাবস্থায় উহাকে সেলাই করা ভিন্ন আর কি উপায় আছে, তৎক্ষণাৎ সেলাই করিতে পারিলে হয়ত তাহা ঔষধ ব্যতীত ও স্বাভাবিক নিয়মে আরোগ্য হইয়া উঠে। এমত স্থলে তৎক্ষণাৎ সেলাইর বন্দোবস্ত না হইলে হয়ত সেই অঙ্গটি হীন হইয়া পড়িতে পারে, ক্ষত বৃহৎ হইয়া উহা সুদীর্ঘ কাল স্থায়ীভোগ এমন কি রোগী মৃত্যুমুখেও পতিত হইতে পারে। ধরুন, কোন একটী স্থান অস্থি সহিত পিষ্ট ও ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, তখন জীবন ও অন্য অঙ্গ রক্ষা কল্পে ঐ পিষ্টস্থান ছিন্ন ও বন্ধন করিয়া দিলে জীবন ও অন্য অঙ্গের হানীর সম্ভাবনা থাকে না। আবার দেখুন শরীরে একটী কাঁকড়, কাঁটা প্রভৃতি বিঁধিয়া গেলে আমরা কি করি; না—তখন একটী সূচ বা কাঁটার সাহায্যেই উহা খুলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করি, যদি উহা তখন তখন একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া তুলিয়া ফেলিতে পারি, সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় আরাম, নতুবা একটু কষ্টের জন্য বা তুলিবার কোন উপায় না থাকিলে কতটা বেশী কষ্ট ভোগ করিতে হয়। এই সকল চেষ্টা যে উপায়ে করা হয় তাহাই শস্ত্রোপচার। শস্ত্রোপচার দীর্ঘ ও স্থায়ী দুঃখকে লঘুতর ও ক্ষণস্থায়ী করিয়া দেয়। দুঃখ ব্যতিরেকে যখন কোন প্রকার সুখই লাভ করা যায় না, তগন অল্প দুঃখ সহিয়াও স্থায়ী সুখ লাভ করাই সকলের অভি-প্রেত। কিন্তু অজ্ঞ মানব ক্ষণিক সুখের জন্য স্থায়ী সুখে জলাঞ্জলী দেয়। কাঁটা বিঁধিলে কোন্ মুর্খ তাহাকে তুলিতে চেষ্টা না করে। যে উহা না তুলে সে সামান্য দুঃখের পরিবর্ত্তে অশেষ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। ঔষধ দিবে, পুলটিস দিবে, পাকিবে—তৎপর আপনা আপনি বাহির হইতেও পারে, নাও পারে, এমতস্থলে প্রথম প্রথম উহার প্রতিকার করিলেই কি ভাল হয় না? সেই প্রতিকারই অস্ত্র প্রয়োগসাধ্য। বৈদিক যুগ হইতেই উক্ত প্রথা চলিয়া আসিয়াছে। ভারতবর্ষই ইহার উৎপত্তিক্ষেত্র এবং ইহার যথেষ্ট উন্নতিও হইয়া ছিল। ভারতীয় শল্যচিকিৎসার মূল ভিত্তি অবলম্বন করিয়াই পাশ্চাত্যগণ শস্ত্রচিকিৎসার উৎকর্ষ ও প্রসার করেন। এই সকল অবিসংবাদিতসত্যরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। শস্ত্রবিদ্যা ও শস্ত্রচিকিৎসা একরূপ এদেশ হইতে লোপ পাইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার কয়েকটি প্রধান হেতু দেখা যায় যে, ঔষধ চিকিৎসা যেমন ফলবতী শস্ত্র চিকিৎসা তেমন নহে। শস্ত্র চিকিৎসা

নিত্য নূতন করিয়া করিতে হয় কিন্তু ঔষধ চিকিৎসা অপেক্ষাকৃত চিরন্তন ও স্বতঃসিদ্ধ। প্রথমতঃ শল্যচিকিৎসা এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের সূচনা করিয়া দেয়। যদিও উহার ফল ভালই প্রায় হয়, তথাপি করুণ হৃদয় চিকিৎসক এবং রোগীর আত্মীয়গণের নিকট ক্রমশঃ উহা অশ্রদ্ধেয় ও অনাবশ্যক বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে। তাঁহারা উপায় নির্দ্দেশ করিতে যত্নপর হইলেন যে, শস্ত্রপ্রয়োগ ব্যতীত ঠিক সেই কার্য্যটি সাধিত হইতে পারে কি না, মানব শুধু চেষ্টা করিয়া কত অসাধ্য সাধন করিয়া আসিতেছে, সুতরাং তাঁহাদের সেই চেষ্টাও বেশ ফলবতী হইতে লাগিল, তাঁহারা দেখিলেন, শস্ত্র সাধ্য প্রায় কর্ম্মই ঔষধ প্রয়োগেও সুফল ফলিয়া থাকে। তবে যেখানে নিতান্ত শস্ত্র প্রয়োগ না করিলে নয়, অথচ সেইরূপ রোগীর সংখ্যাও কমিয়া আসিল, * তখন ঐ সমুদয় অস্ত্র চিকিৎসার ভার আর্য্য-চিকিৎসকগণ ক্রূরকর্ম্মাদের হস্তে সম্পন্ন করাইতে লাগিলেন। এ জন্যই আমরা দেখিতে পাই, আর্য্য চিকিৎসক মধ্যে একজনও আর শস্ত্র প্রয়োগ কুশল চিকিৎসক রহেন নাই। মাংসপেশী কাটিয়া ঝুলিয়া পড়িতেছে সীবনের প্রয়োজন নাই—ঔষধ বাঁধিলেন, বেশ জোড় লাগিয়া গেল। অস্থি ভগ্ন হইয়াছে, ক্ষতমধ্যে অসংখ্য নাড়ী বা নালী হইয়াছে, বিষাক্ত প্রাণী দংশন করিয়াছে, সকলটিতেই সেই ঔষধির বন্ধন, আলেপ, স্বেদ, স্বরস, সুবাস ইত্যাদিরই ভূরি প্রয়োগে সুখানুবন্ধ ও আরোগ্য দান করিয়া আসিতেছে; এই লাভটিও বড় কম নহে। এই প্রকার শস্ত্রসাধ্য ব্যাধির ঔষধি চিকিৎসার অত্যাশ্চর্য্য সুফল অনেকেই দেখিয়া আসিতেছেন, তাহা বলাই বাহুল্য। এই ঔষধি চিকিৎসার যে কত উন্নতি ও প্রসার হইয়াছিল, তাহার সম্যক্ নির্দ্দেশও দুরূহ। এই ঔষধি চিকিৎসাও কালক্রমে অনেক লোপ পাইয়া গিয়াছে। নূতন আর আবিষ্কার কতটা হইতেছে? দুঃখের সহিত বলিতে হয় এই চিকিৎসার ইতিহাস ও বিজ্ঞান রহস্য আজও নির্ণীত হওয়ার উপায় অবলম্বিত হয় নাই। ক্ষতাদির যতপ্রকার চিকিৎসা প্রচলিত আছে আপাতদৃষ্টিতে একটিও তাহার আয়ুর্ব্বেদ সম্মত বলিয়া ধারণা হয় না? কিন্তু সূক্ষ্ম গবেষণায় ইহা আয়ুর্ব্বেদ সম্মত চিকিৎসা বলিয়াই এক সময়ে ঘোষিত হইবে, সেদিন কবে আসিবে?

* দেশে যুদ্ধ বিগ্রহের ও অন্যান্য সাহসিক কর্ম্মের, নিতান্তই অভাব ছিল, যাহাতে সচরাচর অভিঘাতাদির বাহুল্য ঘটিত না।

আর একটী কথা—ঔষধ সাধ্য ক্ষতাদি চিকিৎসায় শস্ত্রপ্রয়োগের এবং শস্ত্র সাধ্য চিকিৎসায় ঔষধ প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু? অনেক ক্ষতরোগ এমন আছে যাহা কেবল শস্ত্র প্রয়োগে বা কেবল ঔষধ প্রয়োগেই আরোগ্য হইতে পারে, যেমন একটী ব্রণ, উহা পাকিয়া উঠিলে উপযুক্ত অস্ত্রপ্রয়োগে অথবা কেবল ঔষধ প্রয়োগে আরোগ্য হইতে পারে। আবার এমন কতক ক্ষত-ব্রণাদি দেখা যায় যাহাতে ঔষধ ও শস্ত্র প্রয়োগ উভয়টিরই নিতান্ত প্রয়োজন হয়। সেই সেই স্থলে কি বুঝিতে হইবে যে অস্ত্র প্রয়োগ বা ঔষধি প্রয়োগের ভ্রম-প্রমাদই অন্যান্য অপেক্ষার হেতু? নতুবা একটি দ্বারাই সিদ্ধ হইত। কে বলিতে পারেন যে, অস্ত্র চিকিৎসার প্রয়োজন নাই বা ঔষধ চিকিৎসা অগ্রাহ্য? আর্য্য-চিকিৎসক এবং অধিকাংশ চিকিৎসক সম্প্রদায়ের বদ্ধমূল ধারণা—শস্ত্রচিকিৎসা বরং পরিত্যাগ করা যায়, তথাপি ঔষধ পরিত্যাগ চলে না। এইরূপ ধারণার ফলেই শস্ত্র চিকিৎসা সমধিক লোপ পাইয়া ঔষধি চিকিৎসা তৎস্থলাভিষিক্তা হইয়াছে। পাশ্চাত্যগণ শস্ত্রচিকিৎসার প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াও ঔষধ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। আমাদের মনে হয়, ভারতীয়গণ যেমন ঔষধি চিকিৎসার প্রাধান্য বিস্তার করিতে যাইয়া অস্ত্রচিকিৎসা ভুলিয়াছিলেন, তেমনি পাশ্চাত্যগণ অস্ত্রচিকিৎসার বাহাদুরী লইতে গিয়া ঔষধি চিকিৎসার প্রতি অনাদর করিয়া আসিতেছেন। অনেকেই বিদিত আছেন যে আজকাল প্রধান ২ অস্ত্রচিকিৎসা বিশারদগণ শরীরস্থ যে কোন ব্যাধিই কেবল অস্ত্রোপচার দ্বারা আরোগ্য করিতে উন্মুখ হইয়া পড়িয়াছেন। অবশ্য তাঁহারা এবিষয়ে কতকটা সফলকামও হইয়াছেন বলিয়া মনে করেন। যে সকল ব্যাধিতে কোন কালে কেহ অস্ত্র প্রয়োগের নাম ও স্মরণ করিতনা সে সমুদয় ব্যাধিও এখন অস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা আরোগ্য করিতেছেন। ইহা যেমন বিস্ময়ের বিষয়, ঠিক তেমনি আবার কতকগুলি ব্যাধি আছে যেখানে ঔষধ চিকিৎসার কল্পনাও কেহ করিতে পারেন না, এমন রোগ সকলও অত্যাশ্চর্য্য রূপে কেবল ঔষধ প্রয়োগেই সত্বর নিরাময় করিতেছেন, এসকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় চিকিৎসার যুগ পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। চিকিৎসা ব্যাপারের দৈনন্দিন উন্নতি মানব সমাজকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে বলিতে হয়। এখন কথা এই, চিকিৎসা ক্ষেত্রেও বিশেষ

প্রতিদ্বন্দ্বিতা বড়ই তীব্র, এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের বিজ্ঞান কে স্বীকার করিতে ও পরাঙ্মুখ। কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবে এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতি ভক্তি রাখিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয় উভয়টা উভয়ের অনুকূল এবং অতি প্রয়োজনীয়। কোনটিকেই বাদ দিলে চলিবেনা। ঔষধ পক্ষপাতী তুমি বলিতে পার উপযুক্ত ঔষধ জুটাইতে পারিলে উহার কাছে আর কোন প্রক্রিয়ার প্রয়োজন নাই। শস্ত্রবিশ্বাসী বলিতে পারেন, তেমন উপকরণ সম্পন্ন অস্ত্র চিকিৎসা নিস্ফল হয় না, দৈবাৎ যে বিপরীত দাঁড়ায় তাহা অন্য কারণে, কিন্তু ইহা যে বিষম ভুল তাহা বলাযায়। আজ তুমি মস্তবড় সার্জ্জন আছ হস্ত দগ্ধ ব্যক্তির হাত খানা কাটিয়া দিয়া অবিলম্বে তাহার আরোগ্য সম্পাদন করিয়া দিলে,জানুসন্ধির অস্থি বিকৃত বা স্থানচ্যুত হইয়াছে তৎক্ষণাৎ কাটিয়া ক্ষত শুকাইয়া দিলে,স্বীকার করি সে শীঘ্রই যন্ত্রণার হাত হইতে অব্যাহতি পাইল কিন্তু তাহার যে চিরযন্ত্রণা কারী অভিনব ব্যাধি সৃষ্টি করিয়া দিলে তাহার আর কি উপায় হইতে পারে? আজ ডাক্তার যেখানে কোন রোগীর হস্তপদ কাটিতে উদ্যত, রোগী হয়তঃ তখন তথা হইতে কোন প্রকারেমুক্ত ও ঔষধ চিকিৎসার শরণাপন্ন হইয়া অবিলম্বে অবিকল দেহে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, এরূপ দৃষ্টান্ত কি সামান্য? শস্ত্রচিকিৎসাকেও মান্য করি, শস্ত্রচিকিৎসা পূর্ণতা লাভ করুক, কিন্তু ভ্রাতৃগণ ঔষধ চিকিৎসার অনাদর করিতে শিখিওনা; জানিও ঔষধচিকিৎসাই সর্ব্বোপরি প্রাধান্য লাভ করিবে।

ঔষধি চিকিৎসারও অনেক দোষগুণ না আছে এমন বলা যায় না, তবে এই চিকিৎসাটি যেমন সুলভ ও সরল অন্য কোনটিই তেমন নহে। শস্ত্র-চিকিৎসা বহু আয়োজন ও অনুষ্ঠান সাপেক্ষ, রাজানুমোদন, রাজসাহায্য ও সমধিক প্রয়োজনীয়। শস্ত্র প্রয়োগ করিতে যে রাজ অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে তাহা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকারও বলিয়া গিয়াছেন। যেহেতু উহাতে পদে পদে প্রাণ হানি ঘটিবার সম্ভবনা রহিয়াছে উপযুক্ত সাহায্যের অভাবও এদেশ হইতে শস্ত্রচিকিৎসা লোপের একটি কারণ। একটি অঙ্গ দুর্ব্বল হইলে যেমন অন্য অঙ্গটির শক্তি বাড়ে তেমনই শস্ত্রবিদ্যার বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই ঔষধি চিকিৎসার অভ্যুদয় হইতে হইতে থাকে। ঔষধি চিকিৎসা যেমন সুলভ তেমনই অমোঘ কার্য্যকরী। পরন্তু বিপদের আশঙ্কাও কম আমাদের দেশে

অশিক্ষিত কত নরনারী যে এই চিকিৎসার বলে কত অসংখ্য রোগীর চিকিৎসা করিয়া আসিতেছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এই চিকিৎসা শিক্ষা করিতে হইলে এখন তাহাদেরই শরণাপন্ন হইতে হইবে। কবিরাজগণ প্রায়শই ক্ষত রোগীকে হয় ডাক্তারের নিকট অথবা এই নিম্ন শ্রেণীর লোকদের শরণ লইতে উপদেশ দিয়া থাকেন। একেত আয়ুর্ব্বেদের অঙ্গ হইতে শস্ত্রচিকিৎসা লুপ্ত হইবার উপক্রম অপর দিকে ঔষধি চিকিৎসারও যেটুকু উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল,তাহাও হস্তচ্যুত ও অধুনা লুপ্ত হওয়ার পথে আসিয়াছে। যে ঔষধি চিকিৎসা আয়ুর্ব্বেদের এক গৌরব স্তম্ভ তাহার প্রতি কথনই উপেক্ষা বাঞ্ছনীয় নহে। ঔষধি চিকিৎসার লোপের অপর কারণ ঔষধির অভাব, দেশের বন জঙ্গল ক্রমশঃ ধ্বংস হইয়া যাওয়ায় পূর্ব্বের মত আর ঔষধি মিলিতেছেনা। পরিচয়ের অসুবিধা দ্রব্যের অভাব, ভেষজগুপ্তি প্রভৃতি বহুবিধ কারণই বিদ্যমান দেখা যায়। এক দিকে যেমন ঔষধি ক্ষেত্র ও ঔষধ পরিচয় আবশ্যক অন্য দিকে প্রয়োগ কুশলতাও কম নহে। প্রত্যেক বস্তুর ভিন্ন ২ অংশে, ভিন্ন ২ গুণ আবার একই অঙ্গের প্রয়োগ নানাবিধ, যেমন একটি পত্রের মসৃণ দিক ক্ষত আরোগ্য করে রুক্ষ অংশ ক্ষত বৃদ্ধি করে, একটি পচন শীল একটি ভরণশীল, এই সকল শিক্ষাও বিশেষ প্রয়োজনীয়। যাহার কাছে যেটুকু শিক্ষনীয় আছে, তাহার নিকট হইতেই সেটুকু সযত্নে শিখিয়া লইতে হইবে। মান করিলে, গর্ব্ব করিলে প্রতিপত্তি হানীর আশঙ্কা করিলে চলিবেনা ; আজ সকলে সমক্ষেত্রে সমভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া আত্মপর ভুলিয়া আমাদের একার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে। গ্রামে গ্রামে পথে পথে জঙ্গলে জঙ্গলে পর্ব্বতে পর্ব্বতে ঘুরিয়া বিশেষজ্ঞ ও বিবিধৌষধি খুঁজিতে হইবে। আমরা অস্ত্রপ্রয়োগ যতটা না করিয়া, পারি ততটাই সিদ্ধির পথ। অস্ত্র প্রয়োগ এবং ঔষধি চিকিৎসার তুলনা নিত্য নিয়ত করিয়া উভয়ের বিচার করিতে হইবে। একদেশদর্শী হইলে চলিবেনা। ঔষধি চিকিৎসার যেটুকু বিজ্ঞান বিধৃত রহিয়াছে তাহারও নব ২ পরীক্ষা পর্য্যালোচনা চাই, যে গুলি বিজ্ঞানের বহির্ভূত বলিয়া চলিয়া আসিয়াছে তাহার ও বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার করিতে হইবে। এজন্য বহু সময়, ভূরি প্রয়োগ ও বহুল শ্রম আবশ্যক হইবে। সকলেরই স্ব স্ব ক্ষমতানিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। যিনি আয়ুর্ব্বেদানুরাগী, যিনি পরদুঃখে বিগলিতচিত্ত এবং মৎসহীন

তিনিই অবিলম্বে একার্য্যে ব্রতী হইবেন। একার্য্যে তেমন আয়োজনের ও আবশ্যক নাই, কেবল হৃদয়ের বল ও সারল্যই আয়োজন লইতে হইবে। সতের সাধু ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

স্বাস্থ্য-তত্ত্ব।

নশ্বর জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়া মানব চাহে কি? অনন্ত আকাঙ্ক্ষা বুকে লইয়া মানব কত সুখের আশায় দেহ মন নিয়োজিত করে—সৌধ অট্টালিকা রাজী, অপরিমেয় ধন দৌলৎ, অসংখ্য দাস দাসী, বিলাসোপযোগী যাবতীয় কাম্য বস্তু সকলই লাভ করিবার জন্য আমরা সকলেই ব্যস্ত। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন না থাকিলে অভীপ্সিত বিষয় লাভ ত ঘটেই না, আবার যিনি প্রভূত ধনের অধিকারী, তিনিও ভগ্ন স্বাস্থ্য হইলে কিছুতেই সুখের আস্বাদন লাভ করিতে পারেন না। এমন যে প্রধান আকাঙ্ক্ষিত স্বাস্থ্য, তৎপ্রতি কাহারও বিশেষ দৃষ্টি আছে বলিয়া মনে হয়না। আর বিশেষ দৃষ্টি থাকিলেই বা হইবে কি? পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে দেশের যে অবস্থা ছিল, এখন আর তাহা নাই; তখনকার লোকে যে প্রকার আহার করিয়া দীর্ঘজীবী হইত, অধুনা তাহা কল্পনাতেও আসেনা। কথিত আছে উলা গ্রামের রঘুনাথ (মুনকে রোঘো—ডাক নাম) একমণ (?) চাউলের অন্ন একটা আদৎ পাঁঠা এবং তদুপযোগী তরকারী মিষ্টান্নাদি আহার করিতে পারিত। অনেক ধনবান ব্যক্তি তাহাকে আদর করিয়া খাওয়াইতেন—একবার উলার বাবুদের বাটী ডাকাইত পড়ে—রঘুনাথ এক বৃহৎ ঢেঁকী ঘুরাইয়া ডাকাইতের দলকে পরাস্ত করিয়াছিল। আজিও উলায় রঘুনাথের বংশের কতিপয় ব্যক্তি বিদ্যমান আছেন। কিন্তু হায়, কালের বিসদৃশ গতিতে উলা আজি শ্মশান—ম্যালেরিয়ায় যাবতীয় ব্যক্তিই জড়—জড়—আর বাবুদের সে শ্রীছাঁদ নাই, তাদৃশ অর্থাগম, ধূমধাম কিছুই নাই মামলা করিয়া অনেকেই সর্ব্বস্বান্ত—অনেকে বাস্তুভিটাত্যাগ করিয়া কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় বঙ্গের

শরণ লও। অমর না হইলেও দীর্ঘজীবী হইতে পারিবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রীআশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায়।
ঢাকা।

পল্লী-চিকিৎসক।

নবম পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সু—দাদের ২।১টা ঔষধ বলিবে না? -

হ—হাঁ দাদা, বলিব বই কি।

রোগস্থান চুলকাইয়া করবী বৃক্ষের কস দিলে দদ্রু সারে।

কালকাসিন্দের পাতার রস ও গন্ধক সমপরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে বাটিয়া লাগাইলে রোগ আরোগ্য হয়। 'এলাইচ' বীজ বা পত্র বাটিয়া একটু নিশাদল সহ মিশাইয়া দদ্রুতে দিলে রোগ ভাল হয়। 'এলাইচ' এর অপর নাম দাদমারী।

ঘুটের ছাই দিলে বা তুলসী পাতা ও লবণ একত্রে পিসিয়া দাদে দিলে ভাল হয়।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ত্রিশতী প্রসারণী তৈলের গাদ মর্দ্দন করিলে মহিষা দাদ অতি সত্বর আরোগ্য হয়।

সোহাগার খৈ শ্বেতচন্দনসহ মিলাইয়া লাগাইলে অথবা শ্বেত ধুপ, সোহাগা, ফিটকারী ও গন্ধক সমপরিমাণে চূর্ণ করিয়া কেরোসিন তৈল সহ মিশাইয়া রোগস্থানে লাগাইলে সহজে সকল প্রকারের দাদ আরোগ্য হয়।

সমপরিমাণ সোহাগার খৈ, ফিটকারীর খৈ ও আমলাসার গন্ধক গুড়া করিয়া একত্রে মিশাইবে এবং তৎসহ অল্পপরিমাণ মিছরির গুড়া মিশাইয়া স্যাৎসেতে স্থানে ১০।১২ ঘণ্টা কাল রাখিবে। উক্ত মলম দদ্রুস্থানে মালিশ করিলে রোগ সহজে বিনষ্ট হয়।

লোহগন্ধ, মৈন্ত কর্পূর ঘৃত সহ পাক করিয়া মলম করিয়া লইতে হয়। উক্ত মলম কোচ্দাদের মহৌষধ।

আজ এই পর্য্যন্তই থাক।

সু—দেখ দাদা, তুমিই ত বলিয়াছ ওঝাদের পদে ২ বিপদের আশঙ্কা আছে। তাঁহারা ত আত্মসারণ মন্ত্রও জানে, সঙ্গে ২ তাহার ২।১টা আমাকে শিখাও না কেন?

হ—আচ্ছা, শিখুন।

"অজপা অমাপা ও সিন্ধু বিন্দু হেম্‌রি ভাই।
আজ অবধি আমার মরণ নাই॥"

শুইতে, উঠিতে বিপদ বা ভয় উপস্থিত হইলে উক্ত মন্ত্র একবার পড়িতে হয় ও মন্ত্রশেষে বুকে ফু (ফুৎকার) দিতে হয়; এইরূপে ক্রমান্বয়ে তিনবার করিতে হয়। ইহাতে বিপদ ও ভয় কাটিয়া যায়।

যখন আপনি আত্মরক্ষা, আত্মসারণ বা শরীর বন্ধ নামক মন্ত্রাদি জানিতে উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন তখন আজ আরও একটী বলিয়া অদ্যকার তরে শেষ করিব এই শুনুন।

"উকু ধেনু কুইরা,
মুই কুণ্ডলী দিলাম সর্ব্বশরীর জুইড়া।
জাগ বসুমতি, তুমি আমার মা,
আমারে যে ধরিয়া খাইতে আসে
তারে ধরিয়া খা।
দোহাই গুরুর দোহাই মুরুসিদের।
সিদ্ধি গুরু শ্রীরামের আজ্ঞা।
মা ডাকিনীর বরে,   যদি আমার জ্ঞান লরে,
ঈশ্বর মহাদেবের জটা ছিড়্যা
পার্ব্বতীর পায়ের তলে পড়ে।"

উক্ত মন্ত্র তিনবার পাঠ করিতে হয় এবং প্রতিবারেই মন্ত্রশেষে শরীরে ফু দিতে হয়। এরূপ করিলে বিঘ্ন ভয় দূর হয়।

এখন তবে আসি।

সু—আচ্ছা, যাও ; এর পর তোমার গমন সম্বন্ধে আমার নিষেধ করিবার আর কি থাকিতে পারে। (ক্রমশঃ)

শ্রীগোপীনাথ দত্ত—শিক্ষক।

উপেক্ষিত লতা গুল্মাদি।

৪। শঙ্খ পুষ্পী ও ঢোল কল্মী।

ভাবপ্রকাশে শঙ্খপুষ্পী, শঙ্খাহ্বা, মাঙ্গল্যকুসুম নামে অভিহিত এবং শঙ্খ পুষ্পী সারক, মেধাজনক, বৃষ্য, মানস রোগহন্ত্রী, রসায়ন, কষায়, উষ্ণ বীর্য্য, স্মৃতি-কান্তি-বলপ্রদ, ত্রিদোষঘ্ন, অপস্মার, ভূত দোষ, অলক্ষ্মী, কুষ্ঠ, ক্রিমি ও বিষ নাশক গুণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজনির্ঘণ্টুতে সুপুষ্পী, শঙ্খাহ্বা, কম্বুমালিনী, পীতপুষ্পী, কম্বুপুষ্পী, মেধ্যা, মল বিনাশিনী, কিরিটীশঙ্খ কুসুম, ভূলগ্না, শঙ্খমালিনী নামে উল্লিখিত হইয়াছে এবং হিমত্ব, তিক্তত্ব মেধা ও স্বর জনকত্ব, গ্রহভূতাদি দোষনাশকত্ব, বশীকরণসিদ্ধিপ্রদত্ব গুণ শঙ্খপুষ্পীতে আছে। রাজবল্লভীয় দ্রব্য গুণেও শঙ্খ-পুষ্পীর গুণ তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, মেধাজনক, ক্রিমি ও বিষাপহ এই পাঁচটী ধৃত হইয়াছে।

কোন কোন আধুনিক গ্রন্থে দেখা যায় শঙ্খপুষ্পীর ভাষা নাম শঙ্খা হুলী ও ডানকুনী কিন্তু এই দুই নামে পরিচিত কোন বৃক্ষ বা লতা আমাদের এই প্রদেশে আছে এরূপ শ্রুতিগোচর হয় নাই। শঙ্খপুষ্পীর পরিবর্ত্তে একপ্রকার লতার ব্যবহার দেখা যায। এই লতা প্রায়শঃ জলসমীপস্থ ভূমিতে জন্মে এবং বৃক্ষ গুল্মাদি আশ্রয় করিয়া বর্দ্ধিত হয। পত্র কলম্বী পত্র সদৃশ কিন্তু কলম্বী পত্র অপেক্ষা কিছু বৃহৎ এবং বৃন্তসন্নিকর্ষে কিছু চৌড়া।

পুষ্প শ্বেত বর্ণ, কলম্বী পুষ্প সদৃশ। বৃন্ত অপেক্ষা পুষ্প লাল, দীর্ঘ যুক্ত-দল। ফল কলম্বী ফল তুল্য কিন্তু তদপেক্ষা বৃহৎ। বীজ পক্বাবস্থায় কৃষ্ণবর্ণ, অনেকে ইহাকেই কালাদানা বলেন কিন্তু ব্যবহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ঢোল কলমীর রস, উন্মাদে, বায়ুবিকৃতি রোগে ব্যবহার দেখিয়াছি এবং অধুনাও ব্যবহারে যথেষ্ট উপকার দেখা যায়। শঙ্খপুষ্পীর আকৃতি কিরূপ, তাহা

নিশ্চয়রূপে বলা যায় না। শঙ্খের ন্যায় আবর্ত্ত বিশিষ্ট শ্বেত বর্ণ পুষ্পীকে শঙ্খপুষ্প বলাই সঙ্গত। শঙ্খপুষ্পীর অর্থগত সাদৃশ্য ঢোলকল্মীতে সম্পূর্ণ দৃষ্ট না হইলেও অনেকটা আকৃতি শঙ্খপুষ্পীর তুল্য। ব্যবহারে দেখা যায় ঢোলকল্মীতে শঙ্খপুষ্পীর গুণ মধ্যে কষায়, মেধাজনক, মানসরোগহর, অপস্মার ও ভূতাদি দোষনাশিকা শক্তি আছে। ক্ষেত্রানুসারে ব্যবহার করিলে অন্যান্য গুণও আবিষ্কার হওয়া অসম্ভব নহে। আকৃতি ও গুণ পর্য্যালোচনা করিলে ঢোলকল্মীকে শঙ্খপুষ্পী বলা ভ্রমজনক নহে। যে হেতু শঙ্খপুষ্পীর পরিবর্ত্তে ঢোলকল্মী ব্যবহৃত হওয়ায় গুণাগুণ দৃষ্ট হইতেছে।

কবিরাজ—শ্রীকুমুদনাথ সেন ব্যাকরণতীর্থ বৈদ্যরত্ন।
নাটোর (রাজসাহী)

জীব যন্ত্রে আয়ুর্ব্বেদের বিশেষত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

হেয় বর্জ্জন উপাদেয় গ্রহণ রূপ সহজ সংস্কারদ্বয় লইয়াই জীব, জ্ঞানের উচ্চসীমায় উপস্থিত হয়। ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদই বল আর নিউটনের মাধ্যাকর্ষণই বল সকলই হেয় বর্জ্জন এবং উপাদেয় গ্রহণের ফল। যে ব্যক্তি যতদূর উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট কার্য্য করুক না কেন সকলেরই মূলে সহজ সংস্কার-ত্রয়ই হেতু। যদিও অনেকে হেয় গ্রহণ ও উপাদেয় বর্জ্জন করিতেছে তথাপি তাৎকালিক ভ্রমশিক্ষা প্রসূত সংস্কারে তাহার নিকট হেয়ই উপাদেয়।

সেই হেয় বর্জ্জন উপাদেয় গ্রহণোপায় যে প্রকার বাহ্য জগতে কালক্রমে ঘর, দরজা, কামান, বন্দুক, জুতা, ছাতি, আয়ুর্ব্বেদ, ভূগোল, জ্যোতিষ প্রভৃতি বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া জীবকে জীবন সংগ্রামে জয়ী রাখিতেছে: অভ্যন্তরেও আবার আমাদিগের অগোচরে সর্ব্বদাই হেয় বর্জ্জন উপাদেয় গ্রহণ কর্ম্ম প্রবলতর ভাবে চলিতেছে। মনে কর তোমার অগোচরে খাদ্যদ্রব্যের সহিত কোন অপকারক পদার্থ পাকস্থলীতে প্রবিষ্ট হইল; তুমি পায়সান্ন যে রূপ ভক্তি ভাবে গ্রহণ করিয়াছ, অজ্ঞাতসারে তন্মিশ্রিত শঙ্খবিষও সেইরূপ

ভাবে গ্রহণ করিয়াছ। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই পাকস্থলীর স্নায়ুরূপ ডিটেক্‌টিভ পুলীশ উক্ত অপকারক পদার্থের আমাশয়ে প্রবেশ সংবাদ মস্তিষ্ক রূপ হেড্‌ কোয়াটারস্থ আমাশয় বিভাগের প্রধান কর্ত্তাকে জানাইয়া দেয়। জানিবা মাত্র তিনি তাহার ইচ্ছানুরূপ আদেশ স্নায়ুসূত্র দ্বারা তার করিয়া আমাশয় রক্ষক পেশীগণকে জানাইয়া দেয়। যেই হুকুম প্রাপ্তি, অমনি তাহাকে তাড়াইবার চেষ্টা। তাহারই মঙ্গলময় ফল, বমন। চক্ষু ধূলি সংলগ্ন হইলে তৎক্ষণাৎ জলস্রাব হইয়া ধূলি পটলকে দূর করিবার চেষ্টা প্রভৃতিও ঐ একই নিয়মের অধীন। বাহিরে যেরূপ শত্রু দমনের জন্য তদনুসারে আমরা নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্র, মশারি, ঘট, কলস, কস্তুরীভৈরব প্রভৃতি জীবন সংগ্রাম চালাইবার যন্ত্র নানা প্রকার শিল্পীর নিকট হইতে প্রাপ্ত হই, শারীর যন্ত্রমধ্যে প্রবিষ্ট অপকারক পদার্থকে উচ্ছিন্ন করিবার জন্যও আবার নানাপ্রকার রচনা কৌশল দেখিতে পাই।

বাহ্যজগৎ হইতে আমরা যাহাকিছু মশল্লা সংগ্রহ করি সকলই তন্তুর ভোগে লাগাই, চাল, ডাল, ঘি, ময়দা হইতে আরম্ভ করিয়া যাহাকিছু বল না সকলই তন্তুর সেবার জন্য। অথবা তন্তুই ইহার একমাত্র সেবক।

এই তন্তু নিচয়ের আহার গ্রহণ চেষ্টা এত বলবতী যে ইহার বিন্দুমাত্র বিরাম নাই, সর্ব্বদাই কৈশিকনাড়ী নিঃস্রুত রক্তরস প্রকৃতি দেবী তাহার মুখের কাছে ধরিয়া আছেন। তন্তুগণ, সেই সকল শরীরের পোষণোপযোগী রক্ত রস হইতে যথা প্রয়োজনীয় খাদ্য অবিশ্রাম গ্রহণে কখনও মন্দাগ্নির ভয়ে কুণ্ঠিত হয় না। ইহাই হইল আমাদিগের অগোচর সাধিত তন্তুগত উপাদেয় গ্রহণ চেষ্টা। এই রক্ত রস হইতে যথাযথ উপাদেয় উপাদান গ্রহণ করিয়া নবতন্তু নির্ম্মাণ, আত্মপোষণাদি জীবন যাত্রা নির্ব্বাহক ব্যাপার সাধনকালীন মিস্ত্রির গাদের ন্যায় এমন কতগুলি অপকারক পদার্থ প্রস্তুত হয় যাহা শরীর মধ্যে রহিয়া গেলে আর কিছু মাত্র জীবন সম্ভাবনা থাকে না। যেমন কলেরায় "ইউরিমিয়া"।

সেই প্রকৃতিকর কৌশল যথান্যস্ত প্রাপ্ত শক্তি তন্তুনিচয় বৃক্ক (Kidny) ফুসফুসাদি রূপে অধিষ্ঠিত হইয়া আপনাদিগেরই দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ-প্রচেষ্টোৎপন্ন ইউরিয়া "কার্ব্বন" (অঙ্গারাম্ল) প্রভৃতি নিজের ও অন্যান্য তন্তুদিগের মলবাহিনী

মেথরবৃত্তি অবলম্বনে মুহূর্ত্তের নিমিত্তও বিরত রহিতেছে না। ইহাই হইল শরীরতন্তুর অগোচব সাধিত হেয় বর্জ্জন প্রচেষ্টা।

হেয়বর্জ্জন উপাদেয় গ্রহণ প্রচেষ্টার ন্যায়, তন্তুগত উপেক্ষণীয় ভাবের ও দৃষ্টান্ত প্রাচুর্য্যের অভাব নাই। কারণ সর্ব্বদেহ সম্পদাকর রক্ত রস হইতে মাংস অস্থি প্রভৃতি আপন ২ তন্তুপোষণোপযোগী বস্তু গ্রহণ করিলেও তাহার নিকট যে স্নায়ু মজ্জা প্রভৃতির পোষণোপযোগী পদার্থ ত্যাগ করিয়া কেবল তাহাদেরই ভোগে লাগিবার যোগ্য ফস্‌ফেট্‌ প্রভৃতি লইয়া রক্ত রস তাহার নিকট উপস্থিত হইবে এরূপ কোন প্রমাণ নাই। কারণ অস্থি সংসর্গ পতিত রক্ত-রসের সহিত মাংস সংসর্গ পতিত রক্ত-রসের রাসায়নিক তুলনায় ে. .রূপ পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। ইহা দ্বারাই প্রতিপন্ন হয় যে, অস্থি প্রভৃতি তন্তুনিচয় পরস্পরের বিশেষ খাদ্যের উপর বাহ্যজগতের ন্যায় উদাসীনতা প্রদর্শন করিয়া থাকে। নতুবা অস্থি, মজ্জা, স্নায়ু প্রভৃতির উপাদানের মধ্যে কিছুই পার্থক্য থাকিত না। ইহাই হইল স্বাভাবিক জীবন ব্রত। কারণ যতদিন এই উপাদেয় গ্রহণাদি তন্তুগত সংস্কার অক্ষুণ্ণ থাকিবে, ততদিনই স্বাস্থ্য-সম্ভাবনা। তাই বলিয়া যে শারীরতন্তুগণ কেবল নির্ব্বাধ জীবনব্রত সাধনোপযোগী ক্ষমতা লইয়া মাত্র নিত্যশত্রু কার্ব্বন, ইউরিয়া প্রভৃতি আপনাদিগের কৃত নির্দ্দিষ্ট মলাপ-নোদনে সমর্থ, উহা নহে। বাহিরে যেরূপ কোন অভিনব শত্রু আসিয়া আমা-দিগের পাড়ায় পড়িলে আমরা নানাপ্রকার নূতন উপায় উদ্ভাবন করতঃ তাহার নাশ সাধনে উদ্যোগী হই, অন্তর্জ্জগতেরও সেইরূপ কোন আগন্তুক শত্রু আসিয়া পড়িলে তাহাকে দূর করিবার জন্য, আমাদিগের অগোচরে অর্জ্জুনের প্রতি দ্রোণাচার্য্যের ন্যায় পক্ষপাত করিয়া পূজনীয়া শ্রীমতী প্রকৃতি শিক্ষয়িত্রী আপনার ক্রীড়াভূমির আদর্শপ্রিয় অন্তর্জ্জগৎ শিষ্যকে অভিনব শত্রুসংহারিণী অভিনব উপায় শিক্ষা দিতে কিছুমাত্র ত্রুটী করেন নাই। এই শিক্ষাপ্রভাবেই মঙ্গলকর বমনাদি প্রবৃত্তি; ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

প্রকৃতি দেবী যেদিন জীবদেহের যে অংশ সৃজন করিয়াছেন, সেই দিন সেই মুহূর্ত্তেই সেই অংশকে আবশ্যকানুযায়ী অল্পাধিক জীবনসংগ্রাম চালাইবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। তাই শরীরের প্রত্যেক সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্মাংশ সমষ্টিগত চৈতন্যরাশি একত্রিত হইয়াই এই মহাজীবনের উৎপত্তি। এই হস্ত, পদ, নাক

মুখাদিযুক্ত মহাজীবনের স্বাস্থ্য, সমগ্র শরীরগত পরমাণু সমষ্টির স্বাস্থ্যসাপেক্ষ। তাই কোন স্থানের বিকৃতি হইলে অল্পাধিক সমস্ত শরীরের বিকৃতি অবশ্যম্ভাবিনী যদিও আমরা অত্যল্পকালমাত্র দৈহিক পরিবর্ত্তনের ফলস্বরূপ কখন ২ কোনরূপ সারা অনুভব না করিয়া থাকি, তথাপি তাহাতে যে অননুভাব্য যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কেননা বহু শারীরতন্তুবিকারে যখন সমগ্র শরীরে বহু বিকার দৃষ্ট হয়, তখন গণিত শাস্ত্রের অভ্রান্ততা থাকিলে অত্যল্প বিকারে অত্যল্প সারাপ্রাপ্তি সম্পূর্ণরূপে সম্ভব। আমাদিগের বাহ্যজগতে যেরূপ সমাজ বন্ধন আছে, তান্তব জগতেও সেইরূপ। বাহিরে এক গৃহস্থের মধ্যে কাহাকেও আঘাত করিলে যেরূপ আঘাতকারীকে শাস্তি দিবার নিমিত্ত সকলে উদ্‌গ্রীব হই, উহারাও সেইরূপ হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে একতাবন্ধন এরূপ দৃঢ সূত্রে আবদ্ধ যে, ইহার নিকট একতা সর্ব্বস্ব বাহ্যজগতের প্রবল শক্তিকেও হার মানিয়া লইতে হয়। আমাদিগের সমাজ মধ্যে যেরূপ অনির্দ্ধারিতরূপে আত্মীয়স্বজনের রক্ষণ ও নাশন প্রচেষ্টা বিকল্পিতরূপে দেখা যায়; শারীর-তন্তুদিগের মধ্যে কিন্তু সেরূপ কখনও হয় না। তাহারা প্রকৃতি শিক্ষয়িত্রীর অদৃশ্য বেত্রাঘাতের ভয়ে, সকলেই সর্ব্বদা জীবনরক্ষণানুকূল ব্যাপার সাধনে তৎপর। ইহাদের একতা সূত্রের বন্ধন এরূপ দৃঢ় না হইলে হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ ইত্যাদি এক একটী যন্ত্রের বিকৃতি জন্মিলে তাহার সেবায় সমস্ত তান্তব জীবনকে আত্মবলীদান দিতে হইত না। বলুন দেখি এক একটী মহাজীবনে কি কখন কেহ পরের জন্য এরূপ আত্মবলিদান দিতে দেখিয়াছেন? প্রকৃতি ক্ষিত্যাদি পরমাণু লইয়া জীবদেহকে নিজ হাতে নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে জীবন সংগ্রাম ক্ষমতা দানে যেরূপ কল্যাণময়ী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, অপর দিকে ইহার নিষ্ঠুরতার অন্ত নাই। "বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্" এই কালিদাসের উক্তির প্রতি একটুও দৃক্‌পাত না করিয়াই, আপনার রচনাকৌশলের অপরিসীমতার পরিচায়ক জীবদেহকে তথাবিধ গঠন ও ক্ষমতা দিয়াছেন বলিয়া জরাদিরূপে চতুর্দ্দিক দিয়া তাহাকে কৃতনির্দ্দিষ্টভাবে প্রলয়ের দিকে টানিতে একটুও তাহার লীলাকেবলা হাস্যময়ী মূর্ত্তির পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে না। এই কৃতনির্দ্দিষ্ট মরণ পরিণামের অধীনতা-পাশচ্ছেদী জীব এখন পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় নাই। যদিও "এমিবা" নামক এক প্রকার জীব আছে, যাহারা বাস্তবিক

অমর। কিন্তু তাহাদিগের সেই অমরত্ব অস্বাভাবিক মৃত্যু সম্বন্ধে নয়; স্বাভাবিক মৃত্যু সম্বন্ধে। তাই এমিবা কীটকে অগ্নিতে নিক্ষেপ কর, যাঁতায় নিষ্পিষ্ট কর তাহা হইলে দেখিবে তাহার পক্ষেও মরণ পরিণাম অপরিহার্য্য। কাযেই উহারা অশ্বত্থামার ন্যায় অমর নহে। উহাদের অমরত্ব নির্ব্বাধ জীবন সংগ্রাম-ব্রতের উপর প্রতিষ্ঠিত।

মানবের ন্যায় ইহাদিগের নিত্য মৃত্যুপরবশতা না থাকিলেও একদিন যখন সমগ্র জগৎ নিরাকার বা জীবশূন্য ছিল, তখন হিমালয় হইতে বালুকা কণা বা উৎকুণ হইতে এমিবা পর্য্যন্ত সকলেরই শূন্য পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। তাই বলিতে ছিলাম যে,—জগতের যাবতীয় জীবই মৃত্যুর অধীন। প্রকৃতি একদিকে যেমন আহার নিদ্রাদি সহজ সংস্কার দান করিয়াছেন, অপর দিকে জল, বায়ু, তেজ, খাদ্য প্রভৃতি দিয়া তাহার অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন। নতুবা যদি বৃত্তি দিয়া তাহার চরিতার্থতার উপায় না দিতেন তাহা হইলে বোধ হয় তাহার আদরের জীবলীলা-পরিপূর্ণ সংসার এতক্ষণে শূন্যে মিশাইয়া যাইত। তাই বলিতে ছিলাম প্রকৃতি কল্যাণময়ী। পক্ষান্তরে তিনিই আবার কলেরা, প্লেগ, বসন্তাদিরূপে সর্ব্বদা জীবকে সহস্র হস্তে সংহারের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন।

শিক্ষা প্রদান বিষয়ে প্রকৃতি তন্তুতে দ্রোণার্জ্জুন-সম্পর্ক থাকিলেও সংগ্রামের বেলায় বিপরীত। এই গুরুশিষ্য সংগ্রামের সহিত তুলনায় দ্রোণার্জ্জুন-সংগ্রাম নগণ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ প্রকৃতিরূপ দ্রোণ তাহার অর্জ্জুন-স্বরূপ প্রিয় শিষ্য অন্তর্জগতের সহিত দ্বন্দ্বকালে দ্রোণের ন্যায় আপনার ধ্বংস-কারিণী সমগ্র শক্তি ব্যয় করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। বাস্তবিকই রণাঙ্গণে, অর্জ্জুনের প্রতি দ্রোণের ন্যায়, যদি প্রকৃতি দেবী তাহার প্রিয় শিষ্যের সহিত ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় মৃত্যু্যণব্দ অভিধানে ঠাঁই পাইত না।

জীব যন্ত্র প্রস্তাবে জিজ্ঞাসু ব্যক্তি মাত্রেরই অন্তঃকরণে জীবত্ব জাতির ব্যাপ্তিসীমা নির্দ্দেশাকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইলেও আজকালকার দিনে তাহার উত্তর দেওয়া বড় সহজ নয়। প্রকৃতির তর্জ্জনী-সংলগ্ন অস্থিসঞ্চালিত-মাংস-পুত্তলিকা গুলিকে আমরা সাধারণতঃ জীব বলিয়া, তাহারই প্রভাবে মানব হইতে কীটাণু

পর্য্যন্ত ইহার বিষয় মনে করিয়া থাকি। কারণ ইহারা সকলেই আত্মহিতজনক উপাদেয় গ্রহণ এবং হেয় ত্যাগক্ষম। মোট কথায় বলিতে গেলে হেয়বর্জ্জন উপাদেয় গ্রহণ যখন সুখদুঃখমূলক তখন যাহার সুখ দুঃখ আছে, তাহারাই প্রকৃতি রশ্মিচালিত জীব। অতএব যাহাতে সুখ দুঃখ দেখিব তাহাকেই জীব বলিব। কিন্তু যখন পরের সুখ দুঃখ পরের প্রত্যক্ষ নয়, তখন ইহা অনুমান সিদ্ধ। এই ব্যাপ্তি জ্ঞানের প্রতি হেতু, মাংসপেশীর খিচুনী বিশেষ। যখন আমার দুঃখের মুখখিচুনীর ভাব তোমার মধ্যে দেখি তখন তুমিও আমার মত দুঃখ সেই সময় পাও। আর আমার সুখের সময়ের খিচুনী দেখিলে তখন তুমিও আমার মত সুখ পাও। এই অনুমানের উপর নির্ভর ব্যতীত অন্যজীব দূরে থাকুক, স্বজাতীয়ের সুখ দুঃখ ও প্রত্যক্ষ করিতে পারিনা। ইহার উপরেই নির্ভর করিয়া আমরা নরাদি কীটানু পর্য্যন্ত কাহাকেও আঘাত করিলে বা উপাদেয় বস্তু দিলে তাহারা ত্যাগেচ্ছা বা গ্রহণেচ্ছা বোধক সারা দেয়,তাহাদিগকেই জীব বলিব।

মহাত্মা ভারত-গৌরব জগদীশ চন্দ্র কিন্তু তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা বলে জঙ্গম জগতের ন্যায় পার্থিব ও উদ্ভিদ জগতেরও সুখ দুঃখ মূলক উপাদেয় গ্রহণ হেয় বর্জ্জনের চেষ্টা ভঙ্গী দেখাইয়া, জীবত্ব প্রমাণে জগৎস্তম্ভিত করিয়াছেন।

জীবযন্ত্রের সীমানির্দ্দেশ করিতে গেলে অনেক চিন্তা করা আবশ্যক। যদিও বর্ত্তমান যুগে জগদীশ চন্দ্রের পূর্ব্বে কেহ ইহা ধারণা করিতে পারেন নাই ; তথাপি তাঁহার আবির্ভাবের বহু শতাব্দী পূর্ব্বের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উক্ত মতের সমর্থন দেখিতে পাওয়া যায়।

সুশ্রুত সংহিতায় পুরুষ লক্ষণ করিয়াছেন "পঞ্চ মহাভূত শরীরি সমবায়ঃ পুরুষঃ" শারীর স্থানের প্রথম অধ্যায়ে এই পুরুষের গুণ বর্ণনা করিতে গিয়া যে সমস্ত লক্ষণ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার দিকে একটু মনোযোগ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে সাধারণ সংস্কারানুগত জীবত্বের ব্যাপ্তি সীমা ছাড়াইয়া উহা বৃক্ষ প্রস্তরাদিতে ব্যাপ্ত হইয়াছে যথাঃ—"তস্য সুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষৌ প্রযত্নঃ প্রাণাপানাবুন্মেষনিমেষৌ বুদ্ধির্মনঃ সংকল্পো বিচারণা স্মৃতির্বিজ্ঞানমধ্যবসায়ো বিষয়োপলব্ধিশ্চ গুণাঃ।"

এখন সহজেই বুঝিতে পারেন ঐ সমস্ত লক্ষণ দ্বারা শাস্ত্রকার জঙ্গম জগত্ মানবাদি মাত্রকে লক্ষ্য করেন নাই ; যদি করিতেন তাহা হইলে স্থাবর জঙ্গম প্রভেদ নির্ণায়ক গতিশক্তিটার উল্লেখ করিতে ভুলিয়া যাইতেন না। (এখানে গতি শব্দে কিন্তু সমুদয় শরীরের সহিত স্থান পরিবর্ত্তন, উন্মেষ নিমেষাদি গতি নহে) লক্ষ্য করিয়া দেখুন আমরা সাধারণ সংস্কারানুসারে যে চলৎশক্তি মাত্রকে জীবত্ব প্রভেদক প্রত্যক্ষ প্রধান লক্ষণ বলিয়া মনেকরি জীবযন্ত্র লক্ষণে কিন্তু তাহার উল্লেখ করিয়াই গ্রন্থকার অনুমানসিদ্ধ সুখদুঃখাদিরই উল্লেখ করিয়াছেন যাহা জগদীশ সিদ্ধান্তের অনুকূল। কারণ গ্রন্থকার যদি একমাত্র তথাবিধ গতির কথা উল্লেখ করিতেন, তাহা হইলেই বর্ত্তমান যুগের জীবের ন্যায়, ঋষি যুগেরও জীব নির্দ্দেশ ক্ষমতা বলিতে পারিতাম। কিন্তু যখন তাহা না করিয়া এমন সমস্ত লক্ষণ উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা সারা দেওয়া বস্তু মাত্রকেই লক্ষ্য করিতে পারে, তখন তাহাদিগের চিত্তে যে জড় জগতের চৈতন্য সম্বন্ধে ধারণা হয় নাই, এরূপ বলিতে সাহস করা যায় না।

ইংরাজী ভাষায় জীবনের লক্ষণ করিয়াছেন "Union of soul & body is called life" এই লক্ষণই ভাবপ্রকাশের "শরীর জীবয়ো র্যোগো জীবনমিতি কথ্যতে" জীবনলক্ষণের সমানার্থক। তাই বলিয়া ইংরেজী soul বা ভাবপ্রকাশের জীব শব্দে "একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়" এই শ্রুতি কথিত নিরবকাশ পরমাত্মা নহে এ soul বা জীব শব্দের প্রতিপাদ্য গোতমসূত্রের "ইচ্ছাদ্বেষ প্রযত্নসুখদুঃখজ্ঞানানীতি আত্মনো লিঙ্গম্।" ইচ্ছা দ্বেষাদিযুক্ত জীবাত্মা। এই জীবাত্মা যাহাতে থাকিবে তাহাতে ইচ্ছা দ্বেষাদি দেখা যাইবে। কিন্তু উহা দেহ ছাড়িয়া গেলে যে মৃত জীব থাকিবে উহাও কিন্তু পরমাত্মা ছাড়া নহে।

তাই বলিতেছিলাম এখানে Soul বা জীব শব্দে পরমাত্মা নয় জীবাত্মা। গোতম লিখিত আত্মার ছয়টি লক্ষণের মধ্যে ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ দুঃখ জ্ঞান এই পাঁচটী অনুমেয়, এই অনুমানের প্রতি হেতু প্রযত্ন। কারণ আমরা প্রযত্ন বিশেষ দেখিয়াই অপর জীবের সুখ দুঃখ নিরূপণ করি। অতএব জীবত্ব নিরূপক হেতুর উল্লেখ সামান্য মাত্র উন্মেষ নিমেষ দ্বারাই সারিয়া যখন সুখ দুঃখাদির উল্লেখ করিয়াছেন, তখন অবশ্য বুঝিতে হইবে যাহা চলাচল করিতে না পারিয়া সুখ দুঃখাভিব্যঞ্জক সারা দিতে পারে। এরূপ বৃক্ষ প্রস্তরাদিরও জীবত্ব,

আয়ুর্ব্বেদ সম্মত। আয়ুর্ব্বেদ ভিন্ন অন্য চিকিৎসিত শাস্ত্রে জীবত্ব ব্যাপ্তি সীমা-ভাস প্রদান করা দূরে থাকুক তৎপ্রণেতৃগণ চিকিৎসাধিকৃত পুরুষ বিচারেরও প্রয়োজনহীনতা মনে করিয়া, প্রথমেই রোগতত্ত্বাদি নিবন্ধ করিয়াছেন। পূজ্যতম আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র কিন্তু জীবত্ব ব্যাপ্তির সীমা পর্য্যন্ত নির্দ্ধারণে ক্রটী করেন নাই।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কবিশেখর।
পোঃ কেওরা, বরিশাল।

সংবাদ।

ক্ষতরোগে শর্কা প্রয়োগ।—এতদিন ডাক্তারেরা ঘা হইলে, ঘা বোরিক লোসন দিয়া ধৌত করিয়া বোরিক য়্যাসিড, বোরো আইডোফর্ম্ম বা অন্য কোন ঔষধ দিতেন। লাহোরের সিভিল ও মিলিটারী গেজেট লিখিয়াছেন, কোন একজন ফরাসী ডাক্তার ক্ষতে চিনি প্রয়োগ করিয়া নাকি বেশ ফল পাইতেছেন। ইঁহার মতে দুই প্রকারে চিনি ব্যবহার করা যায়। প্রথমতঃ অল্প জলে অধিক চিনি মিশ্রিত করিয়া ঐ জলে ঘা ধৌত করিতে হয়। ঘা উত্তমরূপে ধৌত করা হইলে, ঐ চিনিমিশ্রিত জলে লিণ্ট ভিজাইয়া ঐ লিণ্ট দ্বারা ক্ষত আচ্ছাদন পূর্ব্বক অয়েলড্‌সিল্ক তদুপরি স্থাপন করিয়া তূলা ও ব্যাণ্ডেজ ব্যবহার করিলেই হইল। এই প্রণালীতে কোন কষ্টই অনুভূত হয় না। সিল্কও ঘায়ের সহিত লাগিয়া যায় না। সুতরাং ঐ সকল পরিবর্ত্তন করিতেও কোন কষ্ট বোধ হয় না। দ্বিতীয়তঃ চিনির জল দ্বারা ঘা ধৌত করিয়া গুঁড়া চিনি ঘায়ের উপর দিয়া তৎপরে সিল্ক প্রভৃতির দ্বারা বাঁধিলেও চলে। পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

---

* এ সংখ্যায় স্থানাভাব বশতঃ আগামী সংখ্যায় শেষ হইবে।

"প্রাণো বা অমৃতম্ ।" (শ্রুতিঃ)

আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ।

(স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন ও চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র)

"আয়ুঃ কাময়মানেন ধর্ম্মার্থ সুখসাধনম্ ।
আয়ুর্ব্বেদোপদেশেষু বিধেয়ঃ পরমাদরঃ ॥" বাগ্‌ভট।

৩য় বর্ষ | আশ্বিন ১৩২২ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রবন্ধ।

৭। আয়ুর্ব্বেদোক্ত ও নব্য মতানুযায়ী বিষচিকিৎসা।

বিষ চিকিৎসা বলিলে আমরা দুইটি দিক্ বুঝিয়া থাকি। একটি—বিষজ-প্রাণীর দংশনজনিত চিকিৎসা ও যে কোন বিষ ভক্ষণ জন্য বিকার প্রতিষেধ। অপরটি হয়েছে বিবিধ বিষপ্রয়োগে রোগ-প্রতিক্রিয়া। বিষয় দুটি কিন্তু পরস্পর নিরপেক্ষ। বিষয়দ্বয়ের স্বতন্ত্র আলোচনা হওয়াই বাঞ্ছনীয় বটে, তবে আজ আমরা একপ্রবন্ধেই উভয়টির সংক্ষেপ আলোচনা করিতেছি :—

প্রথম—বিষ শরীরস্থ হইয়া যে বিকার ও মৃত্যু ঘটায় এবং তাহা হইতে রক্ষার উপায় বিষয়েই বলা যাইতেছে। অসংখ্য নরনারী প্রতিবর্ষে নানাপ্রকার বিষাক্ত প্রাণীর দংশনে এবং নানাবিধ স্থাবর ও জঙ্গম বিষ ভক্ষণে মানবলীলা পরিহার করে। মানব স্বভাবজ রোগের ন্যায় এই সকল বিষাদি দ্বারা ও সমুৎপন্ন দুঃখ-দেহান্তকারী ভয়ানক আগন্তু বিপদুদ্ধারেরও অনেক উপায়

আবিষ্কার করিয়া সমাজের কল্যাণ সাধন করিয়া আসিয়াছেন ও আসিতেছেন। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে দোষসমুৎপন্ন ও বিষসমুৎপন্ন ব্যাধির চিকিৎসা অতি সুন্দর ভাবেই বর্ণিত আছে, তবে অধুনাতন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ বিষচিকিৎসা তেমন আদরের সহিত গ্রহণ করেন নাই, কাযেই উহা নিম্ন শ্রেণীর লোকদের বিষয়ীভূত হইয়া রহিয়াছে। অস্ত্র চিকিৎসার যেমন অনাদর বিষ চিকিৎসাও সেই প্রকার। ইহার একটি কারণ এই মনে হয় যে, দোষজ ব্যাধির ন্যায় বিষ-জাদি ব্যাধির সম্ভাব নগণ্য বলিলেই হয়। ইহা সহজেই প্রতীতি হয় যে, মোটের উপর চিকিৎসকের হাতে দোষজ ব্যাধির প্রতিকারার্থ যত রোগী আসে বিষজাদি ব্যাধি তত্তুলনায় নগণ্য। বস্তুতঃ দোষজ চিকিৎসা ও বিষাদি চিকিৎসা একই ব্যক্তির হাতে থাকা বড় সুবিধাজনকও হয় না। অস্ত্র চিকিৎসার ন্যায় বিষ চিকিৎসা করাও কঠোর-ক্রূর হৃদয় মনুষ্যের সাধারণত। করুণমনাঃ ভিষক্‌গণ এই সকল চিকিৎসা হইতে সর্ব্বদাই দূরে থাকিয়া ভাল করিয়াছেন কি মন্দ করিয়াছেন, তাহা বলার প্রয়োজন নাই। এখন দেখিতে হইবে বিষজ রোগের প্রতিকারে আমরা কতটা অগ্রসর হইতে পারি। অধুনা চিকিৎসকগণ এই চিকিৎসা একেবারেই করেন না বলিলে অন্যায় হয় না। বিষাক্ত প্রাণী দংশন করিলে অথবা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বা অনবধানতা প্রযুক্ত বিষ কাহারও শরীরস্থ হইলে লোক হয় অশিক্ষিত বিষবৈদ্যের (রোজা) অথবা ডাক্তারেরই শরণাপন্ন হয়। কবিরাজ কেহ ডাকেও না বা তাঁহারা এসব ক্ষেত্র হইতে দূরেই থাকেন। বিষ-বৈদ্যগণ এ বিষয়ে অনেকটা কৃতকার্য্যতাও প্রদর্শন করিয়া থাকে তাহা কাহারো অবিদিত নহে। তাহাদের প্রধান সম্বল মন্ত্র, দ্বিতীয় ঔষধি। ডাক্তারগণ মন্ত্রতন্ত্রের ধার ধারেন না। তাঁহারা অস্ত্রপ্রয়োগ ও ঔষধ চিকিৎসার দ্বারাই কতকটা ফল দর্শাইয়া থাকেন। আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবিষয়ে আজও যথেষ্ট সফলতার পথে পৌছিতে পারেন নাই। তবে তাঁহাদের চেষ্টার বিরাম নাই। নিত্য নূতন আবিষ্কার ও পরীক্ষা চলিতেছে, তাহাও অনেকে দেখিতে-ছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের নূতন আবিষ্কার ও পরীক্ষাত দূরের কথা, যাহাছিল তাহাও লোপ পাইতে বসিয়াছে এবং অনেকটা লোপ পাইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদীয় সমুদয় চিকিৎসাশাস্ত্রেই অল্পবিস্তর বিষচিকিৎসা দৃষ্ট হয়, তবে তাহা যে সম্পূর্ণ একথা সাহস করিয়া কেহ বলিতে পারেন না। আর একটি

বড় অভাব দেখা যায় এই, কোন জাতীয় বিষ অসতর্কতা অথবা অবিমৃষ্যকারিতা বশতঃ দেহস্থ হইলে তৎপ্রতিকার বিষয়ে আমরা বড়ই হতাশ হইয়া পড়ি, তখন সকলকেই ডাক্তারের শরণ লইতে হয়। যদিও এদেশসমুৎপন্ন বিষের লোক-পরম্পরা কতক কতক ঔষধ প্রচলিত আছে, তাহাও অতি তুচ্ছ; পরন্তু উহা শাস্ত্রাসিদ্ধ নহে। এক কথায় বলিতে গেলে কবিরাজগণ বিষবিষয়ক পঠন পাঠন আলোচনা কর্ম্মকুশলতা বিষয়ে একেবারেই অনভিজ্ঞ ও অসহায়। এখন কর্ত্তব্য—এসকল চিকিৎসার উদ্ধারের উপায় নির্দ্ধারণ। এজন্য প্রথমে যথেষ্ট আলোচনা আবশ্যক হইবে। দ্বিতীয়—দেশে যত প্রকার বিষবৈদ্য আছে—তাহাদের এবং পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের সাহায্য গ্রহণ করা, ইহা ভিন্ন কেবল শাস্ত্রের দোহাই দিয়া চলিলে মোটেই কার্য্য সম্পন্ন হইবে না। যা' আমাদের লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে অথচ আমাদের প্রয়োজনীয় তাহা যে প্রকারেই হউক সংগ্রহ করিতে হইবে। ইহা দ্বারাই আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি হইবে। ডাক্তার এবং দেশীয় বিষ চিকিৎসকগণের চিকিৎসা প্রণালীতে অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হয়। দেশীয় চিকিৎসকগণ বিষের দ্বারা মৃত-বিগতসংজ্ঞ ব্যক্তিকেও পুনরুজ্জীবিত করিয়া থাকে, ইহা কম আশ্চর্য্যের বিষয় বা অবিশ্বাস্য নহে। কিন্তু পাশ্চাত্য মতের চিকিৎসকগণ এই প্রকার হতচেতন বা মৃত ব্যক্তির চৈতন্য সঞ্চার করিতে প্রায়ই সমর্থ নহেন। তথাপি তাঁহারা কতক কতক বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছেন সন্দেহ নাই। পাস্তুরের ক্ষিপ্ত কুকুরাদি বিষের চিকিৎসার উল্লেখ করা যায়। আশা করা যায় তাহারা অবিলম্বে অধিকতর সফল মনোরথ হইবেন সন্দেহ নাই। ধন্য তাঁহাদের অধ্যবসায় ও উৎসাহ। অনেকেই অবগত আছেন, আমেরিকাগত জনৈক চিকিৎসকপ্রবর আলিপুর চিড়িয়াখানায় সর্প-দষ্টের প্রতিকারে পরীক্ষা ও প্রযত্ন পরায়ণ হইয়া সামান্য অনবধানতার ফলে সর্পদষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন, তাহার মৃত্যুতেও গৌরব ও সমাজের কল্যাণ নিহিত আছে, তাঁহার প্রদর্শিত পন্থানুসরণে আরও কতলোক যে অগ্রসর হইয়া তথ্য আবিষ্কারে মনোযোগী হইবেন, তাহাও নিঃসন্দেহে বলা যায়। আর আমরা শুধু শুভকার্য্যে কোন বিপৎ পাতের সূচনা দেখিলেই চিরতরে সে পন্থা পরিত্যাগ করিয়া থাকি। লোকের হিতের নিমিত্ত জীবনপাতও সার্থক। একটি কথা—এসকল কার্য্যে চিরকালই রাজানুমোদন আবশ্যক, আমাদের

প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট বৈজ্ঞানিক তথ্যাবিষ্কারের জন্য যথেষ্ট সুযোগ দিয়া থাকেন তাহা বলাই বাহুল্য। এসব আবিষ্কারও পরীক্ষার্থ যারপর নাই সাবধান হওয়াও আবশ্যক। বৃথা সাহস সর্ব্বদাই কর্ম্মবিধ্বংসী এবং অনর্থকর। বিষ চিকিৎসায় একদিকে যেমন বৈজ্ঞানিক সত্য গ্রহণ যোগ্য অপর দিকে মন্ত্রৌষধিও একবারে অগ্রাহ্য নহে। যে মন্ত্রৌষধি বৈদিক যুগ হইতে মানবের কত কল্যাণ সাধন করিয়া আসিতেছে তাহা কিছুতেই অবহেলার যোগ্য নহে। হে পরমার্থবিৎ পরম কুশল কবিরাজবৃন্দ তোমরা, একবার উদ্বুদ্ধ হইয়া ঘরের জিনিষ ও বাহিরের জিনিষ চিনিয়া লও।

দ্বিতীয় প্রকার বিষচিকিৎসা অর্থাৎ বিষপ্রয়োগে দোষজরোগপ্রতিকার। এই প্রথাটি যে ঠিক কোন্ সময় হইতে এদেশে প্রচলিত আছে, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ নাই। বৈদিক চিকিৎসাগ্রন্থে যদিও আমরা বিষ ব্যবহারের উল্লেখ দেখিতে পাই, কিন্তু তাহা অধুনা প্রচলিত বিষ চিকিৎসার মত নহে। তান্ত্রিক-যুগ হইতে বিষচিকিৎসার বিশেষ প্রচলন হইয়াছিল দেখা যায়। আজকাল বিষ চিকিৎসা অতি সামান্যই হইয়া থাকে। পাশ্চাত্যগণও আজকাল বিষ চিকিৎসার অনেকটা পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা যেমন বিষের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ উভয়রূপ প্রয়োগ করিয়া থাকেন এদেশীয় চিকিৎসকগণ সেরূপ না করিয়া শুধু আভ্যন্তরিক প্রয়োগেই সিদ্ধহস্ত। কোন তীব্র জান্তবই হউক অথবা পার্থিব বা উদ্ভিজ্জই হউক,উহা নানা বিধিব্যবস্থা সহযোগে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। উপযুক্ত বিষচিকিৎসা বস্তুতঃ মন্ত্রশক্তির ন্যায় কায করিয়া থাকে। বিষ-হত ব্যক্তি যেমন মন্ত্রৌষধের ফলে চেতনা পাইয়া থাকে, সেরূপ গতাসুপ্রায় অনেক উৎকট রোগের হাত হইতে বিষচিকিৎসা অদ্ভুতরূপে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকে। তবে এই চিকিৎসাও বড় কঠিন, যার তা'র কর্ম্ম নহে; আর যথেষ্ট সতর্কতাও আবশ্যক হয়। এই চিকিৎসা তেমনটা শাস্ত্রসিদ্ধ নহে, পরম্পরাগত শিক্ষাসাপেক্ষ মাত্র, এই চিকিৎসারও ক্রমশঃ অনাদর হইয়া পড়িয়াছে। ইহারও তথ্যানুসন্ধান অতীব প্রয়োজন। এজন্য আজকাল যাঁহারা এইরূপ চিকিৎসা করিয়া থাকেন বা এই চিকিৎসায় অভিজ্ঞ, তাহাদের সাহায্য সমধিক কার্য্য সাধক হইবে। পাশ্চাত্য মতাবলম্বিগণ কিরূপ প্রথাবলম্বনে বাহ্য বা আভ্যন্তরিক বিষ প্রয়োগে রোগ প্রতিক্রিয়ায় যত্নবান হয় তাহাও

বিশেষ দ্রষ্টব্য, চিকিৎসা বিষয়ে সামান্য সুযুক্তি সুবিচারও বর্জ্জনীয় নহে। পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং আয়ুর্বেবদ পারদৃশ্ব ব্যক্তিগণ এবিষয়ে নিশ্চয়ই উদাসীন থাকিবেন না।

জীব যন্ত্রে আয়ুর্বেবদের বিশেষত্ব।



জীবের মরণানুকূল অবস্থা বিশেষের নাম রোগ। উহা শারীর, মানস, আগন্তুক, স্বাভাবিক এই চারি প্রকারে বিভক্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে তোমার ছিদ্রানুসন্ধানে ব্যস্ত। যেই উহা তোমার বিধিলঙ্ঘনরূপ ছিদ্র প্রাপ্ত হইবে, অমনি খল মশকের মত ম্যালেরিয়াদি রূপে প্রকৃতির আদেশে তোমার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া উহার পাতন চেষ্টা করিবে। এই পাতন চেষ্টার প্রতিকূলাচারী তন্তুনিচয় প্রকৃতি দত্ত শিক্ষা প্রভাবে অভিনব উপায় অবলম্বন করতঃ যতক্ষণ সংগ্রাম করিয়া রোগ বিষের সর্ববিধ্বংস প্রভাবকে অভিভূত রাখিতে পারিবে ততক্ষণই জীবন আশা। হোমিওপ্যাথ বলেন যে, শরীরগত রোগোৎপাদক হেতুকে দূর করিবার নিমিত্ত যে শারীর তন্তুর প্রচেষ্টা বমনবিরেচনাদি তাহাই রোগ। তাই তিনি রোগকে সাময়িক শুভকর মনে করিয়া প্রতিকূল ঔষধের পরিবর্ত্তে অনুকূল সমলক্ষণকারক দ্রব্যপ্রয়োগ করতঃ জীবনী শক্তির সাহায্যে ব্যাধি আরোগ্যের উপদেশ দিয়া থাকেন। এলিওপ্যাথ কিন্তু বলেন, উহা বিষপ্রবেশের ফল; বিষ নাশ করিতে না পারিলেও তজ্জন্য লক্ষণাদি চিকিৎসা দ্বারা প্রশান্ত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য মনে করিয়া রোগবিষ ও লক্ষণের প্রতিকূলাবস্থা আনয়নকারক দ্রব্যপ্রয়োগের উপদেশ দিয়া থাকেন। এখন আমরা গবেষণা দ্বারা দেখিয়া শুনিয়া কিছুই বুঝিতে পারি না। আমরা মাত্র দেখিতে পাই যে, কোন রূপ রোগবিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে সর্বত্রই তাহার কতগুলি নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্তু প্রকাশিত লক্ষণগুলি বিষপ্রভাব অভিভবের হেতু স্বরূপ বা বিষের জীবননাশানুকূল শক্তির বিকাশ, ইহার উত্তর কিছুই দিতে পারি না। যদি ও এই উভয় মতেই জীবন নিয়ম স্বীকৃত; তথাপি এইস্থানে ইহাদিগের মধ্যে ভীষণ দ্বন্দ্ব। একের মতে রোগ বিষ-পীড়িত

শারীরতন্ত্রর কল্যাণকর ইঙ্গিত মাত্র, তাই তিনি জীবনীশক্তি নষ্ট না হয় এইরূপ ভাবে শক্তিযুক্ত করিয়া, সমধর্ম্মী ঔষধ প্রয়োগে রোগ নিবৃত্তির উপদেশ দিয়া থাকেন। অপরের মতে উহা রোগোৎপাদক বিষের অমঙ্গলকর প্রভাব। বিষ যখন শারীর বিকার সাধন না করিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রাণনাশক হইতে পারে না তখন বিষনাশক ঔষধ আবিষ্কৃত থাকুক বা না থাকুক, অমঙ্গলকর বিষের অমঙ্গল দেহনাশকারী লক্ষণগুলিকে যতদূর চাপিয়া রাখা যাইবে ততই মঙ্গল। এইরূপে নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত প্রাণ রক্ষা করিতে পারিলেই শুভ আশা।

"বৃদ্ধা হ্রাসয়িতব্যাঃ ক্ষীণা বর্দ্ধয়িতব্যাঃ সমাঃ পালয়িতব্যাঃ" এবং "সামান্য-মেকত্বকরং বিশেষস্তু পৃথক্ত্বকৃৎ" একথা এলিওপ্যাথ হোমিওপ্যাথ সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, কে বলিবে যে শরীর সমধর্ম্মী দ্রব্যোপযোগে শরীর পোষণ এবং শরীর বিধর্ম্মীলঙ্ঘনাদি উপযোগে শরীরক্ষয় হইবে না। কিন্তু সেই একদিন জগতের চিরস্মরণীয় দিন, যেদিন হানিমানের মনে রোগ শারীরতন্ত্রর মঙ্গলময় চেষ্টাভিব্যঞ্জক তরঙ্গ বলিয়া ধারণা হইল সেই দিনই এই অমীমাংস্য স্থূল সংস্কারবিরোধী সমবিধান বিকাশের সূত্রপাত। কিন্তু আজ সেই সমবিধান প্রবর্ত্তক হানিমান্ এজগতে নাই ;—তিনি আত্মাবিষ্কৃত শরীর তন্ত্রর মঙ্গলময়ী প্রচেষ্টাপ্রভাবে মরণকে আলিঙ্গন করিলেও শিষ্যপ্রশিষ্য পরম্পরা তৎসূচিত সিদ্ধান্ত উত্তরোত্তর পরিপক্কতা লাভে বিরুদ্ধ-বিধান পরিপূর্ণ জগতের সহিত দ্বন্দ্বে আপন পতাকা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিয়া যাইতেছে।

উভয়ের যে স্থানে বিরোধ সে স্থান আমার নগণ্য কল্পনার নিকট অমীমাংস্য বলিয়া প্রতীত হয়। কেন না যখন দেখিতে পাই, অপকারক পদার্থ আমাশয়াদি গত হইলে, যে বমনাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা জীবন রক্ষার অনুকূল আমাশয়গত তন্তু প্রচেষ্টার মঙ্গলময় ফল, তখন জ্বরাদি যে তথাগত ফল না হইবে ইহা কেহই সাহস করিয়া বলিতে পারে না। তাই আজ হোমিওপ্যাথিক নাম বিরুদ্ধ বিধান কোলাহল পরিপূর্ণ আকাশ ভেদ করিয়া আমাদের কর্ণপটহে আঘাত করিতেছে।

পক্ষান্তরে এলিওপ্যাথ বলিতেছেন যে, বমনাদি সমগ্র রোগই শারীর-বিষের ধ্বংসসাধিনী প্রচেষ্টা ; দেখিতেও পাই বমনাদি এক একটী লক্ষণ বৃদ্ধি পাইয়াই প্রাণনাশ করিতে পারে।

যখন উভয় পক্ষই যুক্তি দেখাইয়া আপন সিদ্ধান্ত অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন, তখন কাহাকে সত্য বা কাহাকে মিথ্যা বলিব কিছু স্থির করিতে পারি না। কারণ লোকচক্ষুর অগোচরে দেহতন্ত্র ক্ষুধাতৃষ্ণাদির অভিব্যঞ্জক নিত্য নৈমিত্তিক আজীবন যে সাড়া দিয়া আসিতেছে, উহাই বা কোন্ ভাবে প্রযুক্ত, যখন ইহার উত্তর দিতে আমরা অক্ষম তখন অপ্রত্যাশিত রোগরূপ লক্ষণ নিকরের উদ্দেশ্য নিরূপণ করিব, এমন কি সাধ্য থাকিতে পারে?

যদি কেহ উহা নিরূপণ করিতে সক্ষম হইতেন, তাহা হইলে আজ বহুযুগের বিবাদ মীমাংসা হইয়া যাইত এবং বোধ হয় সঙ্গে সঙ্গে উভয় মত মিশ্রিত হইয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এমন একটী বস্তুর উৎপত্তি হইত, যে সেই অমূর্ত্ত বস্তু-প্রভাবে মর অমর হইয়া দাঁড়াইত। আর তাহা দেখিয়া সিদ্ধান্তকারীর পূর্ব্ব-বর্ত্তী বড় ২ এলিওপ্যাথ হোমিওপ্যাথগণ করিতেন কি না কাতন্ত্র দুর্গসিংহের "চ", "বা", "তু", "হি"র মত আপনারাই আপনাদিগের গ্রন্থের অর্, ইট্, এণ্ড প্রভৃতি ইংরেজী অব্যয়ের নানারূপ ব্যাখ্যা করিয়া, নব সিদ্ধান্ত কারীর অনুকূল মতই পোষণ করিতেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এখন পর্য্যন্ত সেই সিদ্ধান্তকারীর জন্ম হয় নাই; তাই এই বিরোধ।

আমরা যখন বিরুদ্ধ ও সম এই দুইটী পরস্পর বিসদৃশ বিধানে রোগারোগ্য রূপ সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মবিরোধী এক ফল প্রাপ্ত হই, তখন ইহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে, রোগসম্বন্ধে যথাপ্রযুক্ত বিরুদ্ধ সম উভয়বিধ ঔষধই পরম শত্রু। এই স্থানে বৈজ্ঞানিক যদি এই বলিয়া আমাকে নিরস্ত করিতে প্রয়াসী হন যে, জগতের সর্ব্বত্রই যখন দেখিতে পাই "সামান্যমেকত্বকরং বিশেষস্তু পৃথক্ত্বকৃৎ" তখন রোগসম্বন্ধে যে তাহার অন্যথা হইবে তাহা কখনও সম্ভবে না।" তাহা হইলে তাহাকে সত্যসংলগ্ন জলের বিশেষত্ব স্মরণ করিতে বলিয়াই মুক্ত হইতে পারি।

(১) সম-বিরুদ্ধবাদী উভয় পক্ষেরই যখন রোগারোগ্যকারিতা দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

(২) যখন পরস্পর পরস্পরের ত্যাজ্য রোগী আরোগ্য করিতেছেন।

(৩) যখন এলিওপ্যাথিক শাস্ত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি নিজ ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়া হোমিওপ্যাথ সাজিয়া বেড়াইতেছেন।

(৪) যখন প্রত্যক্ষভাবে উভয়েরই উপকারিতা আপামর সাধারণের স্বীকৃত। তখন এই প্রত্যক্ষীকৃত মতদ্বয়ের মধ্যে কোনটীই অস্বীকার করিবার সাধ্য নাই।

তাই হানিমানের আবির্ভাব হইবার বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ঋষিবর উভয় মতই সত্য বলিয়া জ্বলন্ত অক্ষরে আয়ুর্ব্বেদে ঘোষণা করিয়াছেন। তাই এলিওপ্যাথ্ যাহা'র পক্ষপাতী হোমিওপ্যাথ্ তাহার পক্ষপাতী না হইলেও আয়ুর্ব্বেদ উভয়েরই পক্ষপাতী বলিয়া তাহা সমস্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানের আকর এবং পৃথক্ পৃথক্ এলিওপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ চিকিৎসায় যাহা আরোগ্য হয় না, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় তাহা আরোগ্য হয়। ইহাই আয়ুর্ব্বেদের বিশেষত্ব।

ঋষিবর যোগাঞ্জন যুক্ত দিব্যনেত্রে জীব-যন্ত্রের বিশেষত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া, অম্লান বদনে নিম্নলিখিত উভয়মত সমর্থক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন :—

"হেতুব্যাধি বিপর্য্যস্ত বিপর্য্যস্তার্থকারিণাম্।
ঔষধান্ন বিহারাণামুপযোগ সুখাবহম্॥
বিদ্যাদুপশয়ং ব্যাধেঃ। স হি সাত্ম্যমিতি স্মৃতঃ॥"

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কবিশেখর।
পোঃ কেওরা, বরিশাল।

উপেক্ষিত লতা গুল্মাদি।

——:০)*(০:——

৫। পদ্মকাষ্ঠ ও পাইয়া কাষ্ঠ।

পদ্ম কাষ্ঠ স্বনাম খ্যাত সদ্গন্ধ বিশিষ্ট বণিক দ্রব্য বিশেষ। পদ্মক, পদ্মগন্ধি, পীতক, মালেয়, শীতল, হিম, শুভ, কেদারক, রক্ত পাটলাপুষ্প সন্নিভ। পদ্মবৃক্ষও পদ্মবাচক শব্দ পদ্ম কাষ্ঠের নামান্তর। শীত, তিক্ত, রক্তপিত্ত, মোহ, দাহ, জ্বর, ভ্রান্তি, বিস্ফোট, বিসর্প, কুষ্ঠনাশক, বাতল, লঘু, গর্ভসংস্থাপক, রুচ্য, বমি, ব্রণ, তৃষ্ণা নাশক, এই কয়টী গুণ রাজবল্লভীয় দ্রব্যগুণ ও ভাবপ্রকাশে উল্লিখিত হইয়াছে। আমাদের দেশে স্থলপদ্ম নামে এক প্রকার পুষ্পবৃক্ষ দেখা যায়। সম্ভবতঃ উহাই আয়ুর্ব্বেদোক্ত পদ্ম চারিণী। যেহেতু পদ্মচারিণী স্থলকমল নামেও আয়ুর্ব্বেদে অভিহিত হইয়াছে।

(পদ্মের নামান্তর কমল) পদ্মচারিণীর গুণ তিক্ত, শীত, বমন, রক্তপিত্ত মেহ ও ভূতাদিসার নাশক, অনুষ্ণ,কষায়, কফ,বাত,মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী শূল, কাস, শ্বাস ও বিষাপহ। পদ্মকাষ্ঠ ও স্থল পদ্মের (পদ্ম চারিণী) গুণ আলোচনায় দেখা যায় শীত, তিক্ত, রক্তপিত্ত, মেহ ও বমিনাশক গুণ উভয়েরই আছে, কিন্তু ভূতাদিসার নাশক, কফবাত মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী শূল কাস শ্বাস বিষাপহ গুণ স্থল পদ্মের (স্থল কমল) আছে, পদ্মকাষ্ঠে নাই। পক্ষান্তরে দাহ,জ্বর,ভ্রান্তি, বিস্ফোট, বিসর্প কুষ্ঠনাশক, বাতল, লঘু, গর্ভসংস্থাপক শক্তি পদ্মকাষ্ঠের আছে, স্থল-পদ্মের নাই। আয়ুর্ব্বেদেও পদ্মকাষ্ঠ ও পদ্মচারিণী (স্থল পদ্ম) পৃথক্ রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং স্থলপদ্ম পদ্মকাষ্ঠ নহে ইহা বলা অসঙ্গত নহে।

আমাদের দেশে সারবান্ নিম্ব পত্রাপেক্ষা বৃহৎ তদাকৃতি পত্রবিশিষ্ট এক প্রকার বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, সাধারণে পাঁইয়া কাষ্ঠ বলে। যদিচ পত্রাদি পদ্মসদৃশ নহে, তথাপি ইহার সারভাগ ব্যবহারে শীতলত্ব জ্বরাদি নাশকত্ব শক্তি বিদ্যমান আছে, পরীক্ষিত হইয়াছে। পদ্মকাষ্ঠের সম্পূর্ণ গুণ ইহাতে আছে কিনা পরীক্ষার বিষয়। তথাপি পদ্ম কাষ্ঠের অপভ্রংশে পাঁইয়াকাষ্ঠ হইয়াছে ধারণা করা অসম্ভব নহে। দ্বিতীয়তঃ শীতলাদি গুণও আছে দেখা যাইতেছে সুতরাং পাঁইয়া কাষ্ঠকে পদ্মকাষ্ঠ বলা ভ্রম, ইহা নিশ্চয় বলা যায় না প্রাচীন চিকিৎসকগণ পদ্মকাষ্ঠ স্থলে স্থলপদ্ম ও পাঁইয়া কাষ্ঠ উভয়ই ব্যবহার করিতেন। বস্তুতঃ কোনটী পদ্ম কাষ্ঠ বিচার্য্য বিষয় হইলেও স্থলপদ্ম আয়ুর্ব্বেদে পৃথক্ ধৃত হওয়ায় ও গুণাদি দৃষ্টে পাঁইয়া কাষ্ঠ পদ্ম কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা ভ্রম বা বিপদ্ জনক নহে। বিশেষতঃ বণিকদত্ত পদ্মকাষ্ঠ যাহা সম্পূর্ণ অপরিচিত (অর্থাৎ সাধারণে যাহাকে কেরাসিনের কাঠবলে) কাষ্ঠ ব্যবহার করা কোন মতে বিধেয় নহে।

কবিরাজ—শ্রীকুমুদনাথ সেন ব্যাকরণতীর্থ বৈদ্যরত্ন।
নাটোর (রাজসাহী)

———

আয়ুর্ব্বেদের গৌরব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আয়ুর্ব্বেদের অরিষ্ট লক্ষণ এক অপূর্ব্ব বিষয়, আজ এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিত হইল :—

মৃত্যুর পূর্ব্ব লক্ষণগুলির নামই অরিষ্ট। ব্যক্তিমাত্রেরই অরিষ্ট চিহ্ন জানা উচিত। অরিষ্ট অনেক প্রকার তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে বর্ণন করিলাম।

১। যে ব্যক্তি মূত্র বা বিষ্টা বমন করে অথবা রক্ত বর্ণ ও শুভ্র বর্ণ রস বমন করে সে ব্যক্তির দশ মাস মাত্র আয়ু অবশিষ্ট আছে।

২। কোন কারণ নাই অথচ যদি চিরস্থূল ব্যক্তি হঠাৎ কৃশ হয়, চির কৃশ ব্যক্তি যদি হঠাৎ স্থূল হয়, অজ্ঞাত কারণে যদি কাহারও প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয় তবে জানিবে যে সেই ব্যক্তির জীবন আর ৮ মাস মাত্র অবশিষ্ট আছে।

৩। কপোত, রক্তপাদ পক্ষী, গৃধ্র, কাক, প্যাঁচা কি অন্য কোন মাংসাশী পাখী অকস্মাৎ মস্তকোপরি পতিত হইলে জানিবে সে ব্যক্তি ছয় মাসের বেশী বাঁচিবে না।

৪। বহু কাক একত্রিত হইয়া যাহাকে তাড়না করে, বানরেরা যাহাকে ধুলি বর্ষণ করিয়া ব্যথিত করে বা আপনার ছায়া উপযুক্তরূপে দেখিতে পায় না, সে চারি মাসের বেশী বাঁচিবে না।

৫। মেঘ নাই অথচ দক্ষিণ দিকে বিদ্যুৎ চমকিতে কিংবা রামধনু উঠিতে দেখিলে, দুই কিংবা তিন মাস মাত্র বাঁচিবে।

৬। ঘৃতে, তৈলে, আদর্শে কিংবা জলে যদি আপনার নির্ম্মস্তক কায়া দৃষ্ট হয়, তবে সেই ব্যক্তি এক মাসের বেশী বাঁচিবে না।

৭। যাহার শরীর হইতে অগ্নিগন্ধ কি শবগন্ধ নির্গত হয়, সেই ব্যক্তি এক মাসের কিছু বেশী বাঁচিবে।

৮। স্নান করিবামাত্র যাহার বুকের জল তৎক্ষণাৎ শুকাইয়া যায় সে ব্যক্তি দশ দিন মাত্র জীবিত থাকিবে।

৯। যে ব্যক্তি কর্ণদ্বয় চাপিয়া অভ্যন্তরস্থ প্রাণ-নির্ঘোষ শুনিতে পায় না, চক্ষু চাপিলে চক্ষুর জ্যোতিঃ দেখিতে পায় না সেও বেশীদিন বাচিবে না।

১০। দীপ নির্ব্বাণের গন্ধ পায় না, রাত্রিতে অগ্নি দেখিয়া ভয় পায়, পর নেত্রে আত্মপ্রতিবিম্ব দেখিতে পায় না এরূপ ব্যক্তি শীঘ্রই মরিবে।

১১। স্বভাবের বৈপরীত্য ও শরীর বিপর্য্যয় দেখিলে, তাদৃশ ব্যক্তির মৃত্যু নিকটবর্ত্তী।

১২। মুখ রক্তবর্ণ হইয়াছে কিন্তু জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ তাহার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী।

১৩। নাসিকা বাঁকিয়া গিয়াছে, কর্ণদ্বয় নত অর্থাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, বাম চক্ষে নিঃসারে জল ঝড়িতেছে সে ব্যক্তি নিশ্চয় মরিবে।

১৪। এক অহোরাত্র বাম নাসিকায় অখণ্ডভাবে শ্বাস বহিলে, আয়ুঃ তিন বৎসরে শেষ হইবে।

১৫। অনবরত দুই দিন রবি নাড়ীতে শ্বাস বহিলে এক বৎসরের মধ্যেই মরিবে।

১৬। দশ দিন পর্য্যন্ত নাসিকার দুই রন্ধ্র দিয়া সমানরূপে শ্বাস বহিলে দেড় মাসের বেশী বাচিবে না।

১৭। শ্বাস বায়ু যদি নাসা পথ ত্যাগ করিয়া মুখ দিয়া বাহির হয় তবে শীঘ্রই মরিবে।

১৮। যাহার শরীর হইতে এককালে রেত, মল, মূত্র ও হাঁচি নির্গত হয় সে শীঘ্রই মরিবে।

১৯। আসন্নমৃত্যু ব্যক্তি জিহ্বা, নাসাগ্র, ভ্রূমধ্য এবং নেত্রজ্যোতি বা চোকের পুতুল দেখিতে পায় না।

২০। যে ব্যক্তি এক রঙে অন্য রঙ দেখে এবং এক রসে অন্য রস অনুভব করে সে ছয় মাসের মধ্যে মরিবে।

২১। যাহার কণ্ঠ, ওষ্ঠ, দন্ত, জিহ্বা ও তালু সর্ব্বদাই শুষ্ক বলিয়া বোধ হয়, যাহার রেত, করতল ও নেত্রপ্রান্ত নীল বর্ণ হইয়াছে এরূপ ব্যক্তি ছয় মাস অন্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিবে।

২২। উত্তমরূপ স্নান করিলেও যাঁহার হৃদয়, হস্ত ও পদ তৎক্ষণাৎ শুকাইয়া যায় সে তিন মাস বাচে।

২৩। আসন বদ্ধ করিয়া নিশ্চলভাবে বসিলেও যাহার শরীর বিশেষতঃ হৃদয় সবেগে কাঁপিয়া উঠে সে চারি মাস মাত্র বাচিবে।

২৪। সর্ব্বদাই বুদ্ধিভ্রংশ হয়, সর্ব্বদাই বাক্য স্খলিত হয়, সর্ব্বদাই রৌদ্র দর্শন হয়, রাত্রে দুই চন্দ্র, দিবায় দুই সূর্য্য, দিবসে নক্ষত্রব্যূহ ও রাত্রে তারকা বর্জ্জিত আকাশের চতুর্দ্দিকে ইন্দ্রধনু, পর্ব্বতোপরি গন্ধর্ব্বনগর এবং দিবসে পিশাচ এই সকল দেখিলে বুঝিবে মরণ নিকট।

২৫। ধুলায় ও সকর্দ্দম মৃত্তিকায় চলিয়া গেলে যাহার পদচিহ্ন (পদাগ্র-ভাগের) খণ্ডিত দৃষ্ট হয় সে সাত দিনের বেশী বাঁচিবে না।

২৬। ভোজন করিয়া উঠিতে না উঠিতে যাহার ক্ষুদ্বোধ হয়, হৃদয় কাতর হয় এবং দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ করে, তাহার মৃত্যু নিকট।

২৭। দৃষ্টি ঊর্দ্ধ হইয়াছে অথচ সুস্থির নহে, রক্তবর্ণ হইয়াছে অথচ বিবর্ত্তিত হইতেছে, মুখের উষ্মা নষ্ট হইয়াছে এবং নাড়ীও শীতল সে ব্যক্তির মরণ কাল আগত।

২৮। নির্ম্মল শুভ্র বস্ত্রকে যে রক্তবর্ণ বিবেচনা করে তাহার জীবন সে পর্য্যন্ত।

২৯। যে ব্যক্তি দেববিমান, ধ্রুব, শুকতারা চন্দ্রপ্রতিবিম্ব ও অরুন্ধতী (সপ্তর্ষি মণ্ডলস্থ নক্ষত্র কেহ বলেন ভ্রূবিন্দু) দেখিতে পায় না সে ব্যক্তি এক বৎসরের বেশী বাচিবে না।

৩০। যে ব্যক্তি সূর্য্যমণ্ডলকে সহস্রমুখ রশ্মি শূন্য অর্থাৎ কিরণধারা ব্যাপ্ত না দেখে এবং বহ্নিমণ্ডলকে সূর্য্যতুল্য দেখে সে ব্যক্তি একাদশ মাসের পর জীবিত থাকে না।

৩১। কোন নারী রক্ত বস্ত্র কিম্বা কৃষ্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া হাসিতে হাসিতে আমাকে দক্ষিণ দিকে নিয়া যাইতেছে এরূপ স্বপ্ন দেখিলে মৃত্যু নিকট।

৩২। অকস্মাৎ কোন ভয়বহ ভূত, প্রেত, পিশাচ, যমদূত কি কোন বিকট সত্ত্ব অথবা গন্ধর্ব্বনগর কিম্বা সুবর্ণ বৃক্ষ দেখিলে নয় মাস জীবিত থাকিবে।

৩৩। উলঙ্গ সন্ন্যাসী হাসিতেছে, নাচিতেছে, ক্রূর দৃষ্টিতে চাহিতেছে, বিভ্রান্ত হইতেছে এরূপ স্বপ্ন দেখিলে মৃত্যু নিকট।

৩৪। গর্ত্তে পড়িলাম আর উঠিতে পারিলাম না, অন্ধাগারে গেলাম আর দ্বার রুদ্ধ হইল এরূপ স্বপ্ন দেখিলে মৃত্যু নিকট।

৩৫। অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলাম, জলে ডুবিলাম কিন্তু বাহির হইতে কিম্বা উঠিতে পারিলাম না এরূপ স্বপ্ন দেখিলে বুঝিবে আয়ুঃশেষ হইয়াছে।

৩৬। ভয়ানক কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ অস্ত্র উদ্যত করিয়া মারিতে আসিতেছে কি প্রস্তরাঘাতে বধ করিতে আসিতেছে, এরূপ স্বপ্ন দেখিলে সেই দিনই মৃত্যু হয়।

অরিষ্টজ্ঞ ব্যক্তি আপনার মৃত্যুর কাল জানিতে পারেন। মহাত্মা বুদ্ধদেব মৃত্যুর সময় জানিয়া আনন্দ প্রভৃতি প্রিয় শিষ্যদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে অস্ত্রচিকিৎসার অত্যন্ত উন্নতি হইয়াছিল। ধনুর্ব্বেদ পাঠে জানা যায় যে, সৈন্যদিগের সঙ্গে সমরক্ষেত্রে বৈদ্যগণও প্রেরিত হইতেন। সেই কালেও কামান ও বন্দুক প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র যুদ্ধের সময় ব্যবহার হইত; কিন্তু বহুলোকের প্রাণনাশ হইত বলিয়া এই সকল আগ্নেয়াস্ত্র খুব কম ব্যবহার করিত। সৈন্যদিগের শরীরে গুলি প্রবেশ করিলে বৈদ্যগণ খুব দক্ষতার সহিত তাহা বহির্গত করিয়া রোগীকে আরোগ্য করিতেন। পরবর্ত্তী কালে বৈদ্যগণ অস্ত্রচিকিৎসা শিক্ষা করিতেন না। অগ্রে নাপিতগণ অস্ত্রচিকিৎসা করিত সুতরাং ইহার উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক এই চিকিৎসায় দেশীয় প্রণালী লোপ পাইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাহা হউক ইউরোপীয় অস্ত্রচিকিৎসা অত্যন্ত উন্নতি লাভ করিয়াছে, আশা করি আমাদের দেশীয় বৈদ্যগণ উহা শিক্ষা করিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবেন।

শ্রীরাজকুমার সেন।

স্বাস্থ্য-তত্ত্ব।



যতই চেষ্টা কর—যতই সাবধানে থাক, রোগ, শোক ও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মরণের হাত এড়ান মানুষের সাধ্য নহে। তবে যে কয়দিন ভব-সংসারে বাঁচিয়া থাকা যায়, রোগ পীড়িত দেহে শয্যায় পড়িয়া হা হুতাশ করা অপেক্ষা সুস্থ দেহে আমাদের সংসার কার্য্য নির্ব্বাহার্থে প্রাণপণ করাই কর্ত্তব্য। স্বাস্থ্য-নীতি মানবকে শিখায় কি? যাহাতে রোগ হইতে না পারে—যদি হয় তবে রোগ মুক্তির উপায় কি? এই সকল বিষয় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বিশদ ভাবে বর্ণিত আছেঃ—অনেক মনীষী কবিরাজ এতৎসম্বন্ধে বহুবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়া-

ছেন। আমাদের এমনই দুরদৃষ্ট যে কোনও রোগ হইবার প্রাক্কালে আমরা সাবধান হই না বা রোগ যাহাতে না বাড়িতে পারে এমন কোনও উপায়ও দেখিনা সংসারচক্রের আবর্ত্তনে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় বিব্রত হই। শেষে যখন রোগটী পাকিয়া দাঁড়ায় বা শিবের অসাধ্য হইয়া পড়ে, তখন হয় আমরা হাস পাতালে জীবন মরণের সন্ধিস্থলে অবস্থিত হই, নয়তো ডাক্তার বাবুকে বাটীতে আনিয়া স্বোপার্জ্জিত অর্থের বিনিময়ে জীবন ভিক্ষা করি। স্বর্গীয় কবিরাজ রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এই জন্যই "স্বাস্থ্য সাধন" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন ঃ——

"হ'বা মাত্র রোগ সারাবে, অল্পেরে না উপেক্ষিবে।
বহ্নি, শস্ত্র, বিষের মত, অল্প রোগেও করে হত।
যদি মান স্বাস্থ্যবিধি, বাঁচতে পার শতাবধি।
অকাল মৃত্যু কপাল দোষে, এবিশ্বাসটী সর্ব্বনেশে।"

আমাদের বাসগৃহের চারিদিকে অসংখ্য বৃক্ষ লতা গুল্মাদি বিদ্যমান, কিন্তু কোন্ গাছের কি গুণ, কোন্ পাতা বা শিকড়ে মানব দেহে কিরূপ ক্রিয়া প্রকাশ করে তাহা জানিনা বলিয়াই উক্ত কবিরাজ মহাশয় লিখিয়া গিয়াছেন ঃ——

সে কালের সব বুড়া বুড়ি জান্‌তো এমন শিকড় পাতা।
* * * ডাক্তার সাহেব লাগেন কোথা ?"

আমাদের যে রোগ হয়, সে কেবল আমাদেরই দোষে একথা বলা বাহুল্য মাত্র। সে কালের লোক আমাদের অপেক্ষা স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘায়ু ছিলেন, ইহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন ? বলিতে কি, দেব দ্বিজ ভিষক্ ভেষজে বিশ্বাস হারাইয়াই আজি আমাদের এই দুর্দ্দশা।

"প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাক্ষরদ্বয়ম্।
আপদস্তস্য নশ্যন্তিস্তমো সূর্য্যোদয়ে যথা।"

কয়জনে দুর্গানাম লইয়া প্রাতরুত্থান করেন জানিনা, তবে আমাদের বিশ্বাস সুস্থদেহী ব্যক্তি যদি প্রত্যহ প্রভাতে দুর্গানাম লইয়া গাত্রোত্থান করেন এবং শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রাদি আবৃত্তি করিয়া মনটীকে পবিত্র রাখিতে পারেন, দ্বিজজনোচিত ষট্‌কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও আয়ুর্ব্বেদের বিধি ব্যবস্থা মানিয়া চলিতে পারেন, তবে

সহজে কোনও ব্যাধি শরীরে প্রবেশ করিতে পারেনা। প্রভাতে শয্যাত্যাগ, শৌচাদি ক্রিয়া, মুখাদি প্রক্ষালনান্তে অন্ততঃ এক ঘণ্টাকাল ঈশ্বর চিন্তায় মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য। পরে অবস্থানুসারে যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া ভ্রমণে বাহির হওয়া উচিত। "নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি" "প্রাতঃকৃত্যাদি" বিশদ ভাবে লিপিবদ্ধ করিতে গেলে প্রবন্ধের আয়তন দীর্ঘ হইয়া পড়িবে আশঙ্কায় বিরত রহিলাম—কেবল কিরূপ আহার বিহারাদি দ্বারা আমরা স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারি তাহাই বলিব। অধুনা সকল দ্রব্যের মূল্যই অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে, কাজেই মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে "ছোলা ভিজা" আদা ও লবণ একত্র প্রাতে উদরস্থ করাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। ছোলা ভিজা পুষ্টিকর, রুচিকর ও বলকারক ইহা কাহারই অবিদিত নাই। অবস্থানুসারে মোহনভোগ রুটী, তরকারী, পরেটা ইত্যাদিও খাওয়া চলে—কিন্তু মিছরী, মাখন—ছোলা ভিজার মত উপকারী খাদ্য অন্য কিছু দেখা যায় না। ভ্রমণে ক্লান্ত হইয়া বিশেষরূপ ক্ষুধার উদ্রেক হইলে আহার করা কর্ত্তব্য। অনেক অফিসের অনুরোধে ক্ষুধার উদ্রেক না হইলেও তাড়াতাড়ি আহার করেন—আহারান্তেই দৌড়িয়া যান—তাহার ফলে অজীর্ণাদি নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া শেষে জলসাগু জলযোগ করিতে বাধ্য হইয়া পড়েন। একটী সুপক্ক আম্রভক্ষণ করিয়াও যিনি পরিপাক করিতে না পারেন তাঁহার জীবন ধারণে ফল কি? যদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিশুদ্ধ দুগ্ধ ও ঘৃত পাওয়া যায়, তবে মৎস্য মাংসাদির জন্য লালায়িত হইবার কোনও প্রয়োজন দেখা যায় না। উত্তম গব্যঘৃত প্রতিদিন একছটাক মাত্রায় অন্নের সহিত ভোজন করিলে আয়ুর্ব্বৃদ্ধি হয় একথা শাস্ত্রে উক্ত আছে। শুধু আতপ তণ্ডুলের অন্ন কাঁচকলা ও আলুভাতে এবং যথেষ্ট পরিমাণে গব্যঘৃত সৈন্ধব লবণ সহযোগে খাইয়া দেখ কি তৃপ্তি! কি আরাম!! দেহমন যেন পবিত্রতার আধার হইয়া পড়ে। মটরের দাইল ভিজাইয়া বাটিয়া ভাতের সহিত সিদ্ধ করিয়া খাও দেহের পুষ্টি সাধন অবশ্যম্ভাবী। জিহ্বা সংযত করিয়া শুধু যে সকল আহার দ্বারা আমাদের শরীর ও মন উভয়ই পরিপুষ্ট হয় এরূপ আহার গ্রহণই বুদ্ধিমানের কার্য্য। বৃহৎ রোহিৎ মৎস্যের বৃহৎ মস্তকটি ভক্ষণ করা বা মাংসাদির যোগাড় করা প্রত্যহ ঘটিয়া উঠেনা; যাহা সম্ভব অথচ উপকারী তাহাই বাছিয়া লইতে হয়—আহার তো আর এক দিনের নয় যে

যতপার খাইয়া লও—বাঁচ আর মর। রসিক কবি পরিহাস ছলে লিখিয়া গিয়াছেন ঃ—

"ভাইরে ! ফলার তুমি যখনি পাইবে,
পেট ফেটে ম'রে যাও তথাপি খাইবে।
মরিলে জনম লাভ হবে বার বার—
কিন্তু বারে বারে কোথা পাইবে ফলার ?"

ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে অনেকে স্ব গৃহে সামান্য ভোজনেই পরিতৃপ্ত হন, কিন্তু পরের গৃহে নিমন্ত্রণ হইলে ভোজনের পাতে বসিয়া ২০।২৫ খানা মাছই হয়ত উদরস্থ করিলেন !! শাক, শুক্ত, ডালনা হইতে পায়স, পিষ্টক—মিষ্টান্নাদি নানা দ্রব্যের সমবায়ে উদর মধ্যে যে তীব্র জ্বালা অনুভূত হয়—অনেকে উঠিতে পারেন না, ৩।৪ জনে ধরাধরি করিয়া বাটী লইয়া যাইতে হয়—এ সকল ব্যাপার অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। ইহাতে যে কেবল নিমন্ত্রণকারীর ব্যয়বাহুল্য ঘটে তাহা নহে, নিজেরও সর্ব্বনাশের পথ যথেষ্ট প্রসারিত হয়। ঔদরিকগণ প্রায়ই দীর্ঘজীবী হয় না ; রসনার তৃপ্তি সাধন করাইতে গিয়া নিজেই অকালে শমন সদনে প্রেরিত হয়। অনেকের ভোজন লিপ্সা এতই বেশী যে দিবারাত্রিই তাহাদের মুখবিবরে কোনও না কোনও দ্রব্য লাগিয়াই আছে। একজন মরিবার সময়ও ৩।৪টী রসগোল্লা খাইয়া মরিয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। তাহার পুত্র উহার কানে ২ উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে "বল বাবা—গঙ্গানারায়ণ ব্রহ্ম" মুমূর্ষু রোগী খাবি খাইতে ২ বলিল—"অত কথা ব'ল্‌তে পারবো না রে বাবা—দুটো রসগোল্লা দাও তো খাই।" পুত্র চাহিয়া দেখে প্রকাণ্ড মুখব্যাদান—সঙ্গে ২ ইহলোক হইতে অন্তর্দ্ধান !! তাই বলিতেছিলাম লোভ সম্বরণ করিতে না পারিলে দীর্ঘায়ু হওয়া অসম্ভব। প্রত্যহ একই জিনিষ ভোজন করা যেমন অবৈধ, অপরিমিত আহার করাও ততোধিক দোষাবহ। অবশ্য "হজমী বড়ী" "হজমি গুলি" "হজমা" প্রভৃতি নানাপ্রকার ঔষধ এতদর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু সাধ করিয়া ঐ সকল ভক্ষণ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। পাকস্থলী ক্রিয়াশীল রাখ, নিজের অন্যান্য অবয়ব সর্ব্বদা পরিচ্ছন্ন রাখ, খাঁটী সরিষার তৈল স্নান কালে উত্তমরূপে সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন কর—অবস্থায় কুলাইলে চাকর দ্বারা তৈল সহযোগে শরীরটী উত্তমরূপে মলাইয়া লও—যাহাতে

নিয়মিত কোষ্ঠশুদ্ধি হয় সেজন্য অন্ততঃ একটী হরীতকীও প্রত্যহ ভোজন কর—দেখিবে তোমার শরীর বহুদিন নীরোগ থাকিবে। অকারণে বা সামান্য কারণে ঔষধ সেবন বিধেয় নহে। শৌচান্তে ও ভ্রমণান্তে হস্ত পদ মুখাদি প্রক্ষালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রায়ই দেখা যায় অনেকেই খোঁস-পাঁচড়া, দদ্রু প্রভৃতি কুৎসিৎ রোগে আক্রান্ত; কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় উহাদের অনেকেই স্নান করে না—কেহ বা গাঁজা সেবী, (?) জলের নামে ভয় পায়—কাহারও নাড়ীতে জ্বর লাগিয়াই আছে। অপরিচ্ছন্ন ব্যক্তির নিকট বসা দূরের কথা, তাহাদের গায়ের বাতাস পর্য্যন্ত আমাদের পক্ষে অহিতকর। অনেকে বিনা কারণে যথাতথা থুথু ফেলিয়া থাকে, নিশ্চয় জানিবে তাহাদের অন্তিমকাল নিকটবর্ত্তী। অবশ্য কাস রোগ হইলে কিম্বা বুকে শ্লেষ্মা জমাট বাঁধিলে সেই সকল অনিষ্টকর দ্রব্য শরীর হইতে বাহির করিয়া ফেলাই কর্ত্তব্য—কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় অকারণে অনেকে যে কোনও স্থানে প্যাঁচ্ ২ করিয়া থুথু ফেলে—সেই থুথু মাড়াইতেও ঘৃণাবোধ হয়—অনেক স্থলে যে মাড়ায়, সেও ঐরূপ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া থাকে। আহার সম্বন্ধে যাহা লিখিলাম, তদ্ব্যতীত সুনির্ম্মল বায়ুসেবনও আমাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল। প্রত্যহ ফাঁকা বা খোলা ময়দান বা নদীতীরে ২।৩ ঘণ্টা উন্মুক্ত বায়ু সেবন করিলে জীবনীশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

দুর্গন্ধময় পঙ্কিল জলে যেমন মৎস্যাদির স্থিতি অসম্ভব, পূতিগন্ধময় সঙ্কীর্ণ স্থানে বাস করাও তেমনি আমাদের পক্ষে দুরূহ। সুদীর্ঘকাল বাচিয়া থাকিতে চাহিলে স্বাস্থ্যনীতি তো মানিতেই হইবে—অধিকন্তু মনকে সংযতও রাখিতে হইবে। কাম, ক্রোধ ও লোভ—প্রধানতঃ বর্জ্জনীয়। ক্রোধে মানুষের বলক্ষয়, আয়ুঃক্ষয় উভয়ই ঘটিয়া থাকে, কামুক ব্যক্তিরাও অপরিমিত শুক্রক্ষয়ে দীর্ঘজীবী হইতে পারে না। অতিশয় ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিতে ২ শেষে গরমী, পারার ঘা, ধাতুদৌর্ব্বল্য—ধ্বজভঙ্গাদি রোগাক্রান্ত হইয়াও অনেকে চিরদিনের মত পৃথিবী ত্যাগ করিয়া গিয়াছে—এ সকল দেখিয়া শুনিয়াও অনেকের চৈতন্যোদয় হয় না, ইহা বড়ই আক্ষেপের কথা। এ সম্বন্ধে যথাসম্ভব আলোচনা আগামী সংখ্যায় করিবার ইচ্ছা রহিল। "স্বাস্থ্যতত্ত্ব" লিখিতে বসিয়া অনেক অবান্তর কথা আসিয়া পড়িয়াছে, সুধীগণ মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীআশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায়, ঢাকা।

পল্লী-চিকিৎসক।

দশম পরিচ্ছেদ।

সু—ঠাকুর্দ্দা, আজ কোন্ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে চাও ?

হ—আজ সর্দ্দি কাস কফ রোগ সম্বন্ধে ২।৪ টী কথা বলিতে চাই।

সু—আচ্ছা, বলিয়া যাও।

হ—সুপক্ক কামরাঙ্গার ফল অগ্নিদগ্ধ করিয়া চিনিসহ প্রত্যহ প্রাতে একটী সেবন করাইলে ৩ দিনে উক্ত রোগ উপশম হইয়া যায়। বাসকের নির্জ্জল রস ২ তোলা পিপুলচুর্ণও মধুসহ পান করিলে কাসী আরোগ্য হয়।

লবণ ও আদা কফ কাসের সহজ ঔষধ। ভূই টলার পাতার রস লোহা-দাগ করিয়া পান করিলে কাস দূর হয়।

বাসক পাতার রস, রামতুলসীর পাতার রস (অভাবে সাধারণ তুলসী পাতার রস) ও আদার রস প্রাতে ও বিকালে পান করিলে কাস কফ সারিয়া যায়।

কলা (করবী) গাছ কাটিলে যে কষ বাহির হয় উহা একঝিনুক পরিমাণে প্রাতে ও বৈকালে পান করিলে কাসী সহজে সারে।

পোড়া লেবু কাসের উৎকৃষ্ট ঔষধ। অল্প আগুণে যে পর্য্যন্ত লেবুটী গরম না হয়, ততক্ষণ পোড়াইবে। উক্ত লেবুর রসের সহিত সমপরিমাণ মধু মিশ্রিত করিয়া ইহার এক চামচ ঈষদুষ্ণ করিয়া পান করিলে ভয়ঙ্কর কাসির যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

শুষ্কলঙ্কা (মরিচ) তৈলের বাতির শিষে পোড়াইয়া প্রস্তর পাত্রে পূর্ব্বদিন রাত্রি কালে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। পরদিন অতি প্রত্যুষে উহা পান করিলে কাসি আরোগ্য হয়।

গোলমরিচ ও চূলার মাটী একত্র বাটিয়া অঙ্গুলী দ্বারা গ্রহণ করতঃ 'আলাজি' বা "আলাজিহ্বা" ঘষিয়া দিলে কাসী কমিয়া যায়।

গরম দুগ্ধে তাল মিশ্রি ফেলিয়া উহা গলিলে সেই দুগ্ধ পান করিলে কাসীর উপশম হয়।

কাস রোগাক্রান্ত ব্যক্তি গরমজল ব্যবহার করিবে। যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চলিবে।

সু—এইত গেল সাধারণ কাসির কথা। শ্বাস কাস বা হাঁপানীর দুই একটা ঔষধ বলনা।

হ—এই—শুনুন,——

আদার রসে মধু মিশাইয়া সেবন ও তৈলে কিঞ্চিৎ লবণ মিশাইয়া হৃদয়োপরি মালিশ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

এক তোলা সোহাগা জলে ভিজাইয়া তাহাতে একখানা ব্লটিং (চোষ) কাগজ উপর্য্যুপরি সিক্ত ও শুষ্ক করিয়া রাখিয়া দিবেন। হাঁপের সময় সেই ব্লটিং কাগজ খানা অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া উক্ত ধূম নাসারন্ধ্রে আকর্ষণ করিলে তৎক্ষণাৎ হাঁপানি বন্ধ হয়, বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

শামুকের পেটা, একটা কলায় ভরিয়া দিনে একবার করিয়া ২।৩ দিন খাইলে সারে।

নিসিন্দার মূল চাউল সহ অথবা শয়ন কালে পিপুলচূর্ণ ও সৈন্ধব লবণ ও আদার রসের সহিত কিছুদিন খাইলে শ্বাস কাস দূরহয়।

একটী আরশুলার পাগুলি ছিড়িয়া কলার ভিতর ভরিয়া প্রাতে ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত খাইলে আরোগ্য হয়।

আটটী আরশুলা এক সের জলে মন্দ জ্বালে সিদ্ধ করিয়া /৹ এক পোয়া থাকিতে নামাইয়া চারিপুরুল কাপড়ে ছাকিয়া সমপরিমাণ রেক্‌টী ফাইড্ স্পিরিট্ মিশাইয়া বোতলে রাখিবেন। হাঁপরোগী এক কাচ্চা জলে একফোটা পরিমাণে উক্ত ঔষধ দিবসে তিনবার করিয়া সেবন করিলে হাঁপ আরোগ্য হয়।

তুলসী গাছের ঘুংরী পোকা তাম্র মাদুলীতে করিয়া গলায় দিলে বালকদের হাঁপ আরোগ্য হয়।

চৈ, চিতা, পিপুলমূল ও গিমে শাক প্রত্যেকের অর্দ্ধতোলা লইয়া অর্দ্ধ সের জল দিয়া জ্বাল দিতে ২ যখন এক ছটাক অবশিষ্ট থাকিবে, তখন উহা নামাইয়া লইয়া হাঁপের সময় তিন দিবস উক্ত ঔষধ এক ছটাক মাত্রায় সেবন করিলে আর হাঁপ ধরিবে না।

পাকা কলার মধ্যে করিয়া ৮।১০ ফোটা ছাগপিত্ত খাওয়াইলে ভাল হয়।

মেটে পাত্রে /।০ এক পোয়া জল ভালরূপ সিদ্ধ করিয়া পরিষ্কার একটী পিত্তলের পাত্রে ঢালিয়া উহাতে তিনটী তেলাপোকা জীবিতাবস্থায় ছাড়িতে হইবে। পরে অপর একটী পাত্রদ্বারা ঢাকিয়া দিয়া উহার দুইঘণ্টা অন্তর ভালরূপ ছাকিয়া একটী শিশিতে ভরিবেন।

পূর্ণিমা বা অমাবস্যা তিথির পূর্ব্বদিন অর্থাৎ চতুর্দ্দশী দিন সন্ধ্যাবেলা ঐ ঔষধটুকু সম্পূর্ণ একবারে খাওয়াইবেন। যদি ঐ এক দিনে না সারে; তবে "জ্যো" উপলক্ষে—পঞ্চমী, একাদশী, পূর্ণিমা বা অমাবস্যার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যা বেলা খাওয়াইবেন। ইহাতে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হওয়া যায়। প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ।

সু—ও ঠাকুদ্দা, একটা ডাক্তারি ঔষধ আছে—তার নাম "ক্লেরো ফরম্"। উহার ঘ্রাণ লইয়া অনেকে হাপানী রোগের হাত হইতে মুক্তিলাভ করে। সোরার ধূমে রোগীর বাসগৃহ আচ্ছন্ন রাখিলে পীড়ার আক্রমণ হয় না।

পীড়ার আক্রমণকালে জলসহ অল্পমাত্রায় স্পিরিট্, ব্রাণ্ডি, হুইস্কি, জিন প্রভৃতি সুরা সেবনে পীড়ার অনেকটা উপশম হয়।

হ—গলা খুস্‌খুসে কাসিতে গোলমরিচ, কাবাবচিনি, যষ্টিমধু ও তালমিশ্রি এক সঙ্গে মুখমধ্যে রাখিলে উহা নিবৃত্তি হয়।

আগরকরা ও বচ চিবাইয়া মাঝে ২ খাইলেও উহা সারে।

কাসী, ঘরঘরানি, বালসা, ঘুংড়ি প্রভৃতিতে—রামতুলসীর পাতার রস শুঙ্ক শামুকের ভিতর করিয়া গরম করতঃ সন্ধ্যাকালে রোগীকে খাওয়াইলে ভাল হয়।

অখণ্ড পান একটা, লবঙ্গ ১টা, জায়ফল এক আনা, যমানী এক আনা, জল এক তোলা—এই কয় দ্রব্য পিষিয়া প্রদীপের তাপে উষ্ণ করিয়া সেবন করাইলে ২।৩ দিনে ভাল হয়।

হ—কাচা হরিদ্রার রস এক ছটাক, কিছু মিশ্রিসহ অগ্নিসন্তাপে পাক করিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ থাকিতে পান করিলে তৎক্ষণাৎ শ্বাস কষ্ট দূর হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীগোপীনাথ দত্ত, শিক্ষক।
রাজাবাড়ী ঢাকা।

আহরণ।

কাঞ্চনগণ্ড জাতক।

(নীতি বিষয়ক)

[শাস্তা জেতবনে জনৈক ভিক্ষুকে উপলক্ষ করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রবস্তীবাসী কোন ভদ্রলোক শাস্তার মুখে ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া রত্নশাসনে * শ্রদ্ধাযুক্ত হন এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। যে সকল আচার্য্য ও উপাধ্যায়ের উপর তাঁহার শিক্ষাবিধানের ভার বিন্যস্ত হইয়াছিল তাহারা তাঁহাকে অল্প সময়ের মধ্যে বহুবিষয় শিখাইবার চেষ্টা করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। এইটি প্রথম শীল, এইটী দ্বিতীয় শীল, ইত্যাদি বলিয়া তাঁহারা দশশীল ব্যাখ্যা করিলেন; † কোন্‌গুলি চুল্লশীল, কোন্‌গুলি মধ্যমশীল, কোন্‌গুলি মহাশীল, তাহা বুঝাইতে লাগিলেন, প্রতিমোক্ষসংবরশীল, ইন্দ্রিয়সংবরশীল, আজীব পরিশুদ্ধসংবরশীল, প্রত্যয়প্রতিসেবনশীল এ সকলও প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিলেন না। ক্রমাগত এই সকল উপদেশ শুনিয়া ঐ ভিক্ষু ভাবিতে লাগিলেন "শীল ত দেখিতেছি অশেষ প্রকার; আমি কখনই ইহাদের সমস্তগুলি প্রতিপালন করিয়া চলিতে পারিব না। তাহাই যদি না পারিলাম, তবে ভিক্ষু হইয়া ফল কি? অতএব আমার পক্ষে পুনর্ব্বার গৃহী হওয়াই ভাল। গৃহী হইলে আমি দানাদি পুণ্যকার্য্য করিতে পারিব। স্ত্রী পুত্রেরও মুখ দেখিতে

---

* উৎকৃষ্ট শাসন অথবা ত্রিরত্ন শাসন। শাসন = ধর্ম্ম।

† দশশীল, অহিংসা, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচার্য্য ইত্যাদি। বৌদ্ধদিগের শীলস্কন্ধ তিন অংশে বিভক্ত:—চুল্ল, মধ্যম ও মহান্। চুল্লশীল বলিলে যে সকল সদাচার সহজেই প্রতিপালন করা যায় সেইগুলিকে বুঝায়, যেমন অহিংসা, অচৌর্য্য ইত্যাদি। মহাশীল বলিলে দৈবগণনা প্রভৃতি গর্হিত বৃত্তির পরিচয় বুঝায়। সর্ব্ববিধ গর্হিত বৃত্তির পরিহার অনেকের পক্ষে সুকর নহে, এই জন্যই এই সকল নিয়ম মহাশীল নামে অভিহিত। মধ্যমশীলগুলি রক্ষা করিয়া চলা তত সহজও নহে, তত কঠিনও নহে। প্রতিমোক্ষ শব্দে বিনয়পিটকের অন্তর্গত ভিক্ষুদিগের প্রতিপাল্য নিয়মাবলী বুঝিতে হইবে। ইন্দ্রিয়সংবরশীল—ব্রহ্মচর্য্যসংক্রান্ত নিয়মাবলী। অজীবপরিশুদ্ধসংবরশীল = যাবজ্জীবন বিশুদ্ধমার্গে বিচরণসংক্রান্ত নিয়মাবলী। প্রত্যয়প্রতিসেবনশীল = ভিক্ষুদিগের প্রত্যহ অর্থাৎ চীবর খাদ্য শয্যা ও ভৈষজ্য এই চতুর্ব্বিধ ব্যবহার্য্য বস্তুসংক্রান্ত নিয়মাবলী।

পাইব।" অনন্তর তিনি আচার্য্য ও উপাধ্যায়দিগকে বলিলেন, "মহাশয়গণ! আমি শীলব্রত সম্পাদনে অসমর্থ; আমার প্রব্রজ্যা বিফল; কাজেই পুনর্ব্বার গার্হস্থ্যরূপ হীনাশ্রমে প্রবেশ করিব স্থির করিয়াছি; আপনারা যে চীবর ও ভিক্ষাপাত্র দিয়াছিলেন তাহা প্রতিগ্রহণ করুন।" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "যদি এইরূপই সঙ্কল্প করিয়া থাক, তবে দশবলের নিকট বিদায় লইয়া যাও।" অনন্তর তাঁহারা এই ভিক্ষুকে লইয়া ধর্ম্মসভায় দশবলের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

তাঁহাদিগকে দেখিয়া শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা এই ভিক্ষুকে ইঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও এখানে আনয়ন করিলে কেন?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "ভগবন্! এই ভিক্ষু সমস্ত শীল রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে না বলিয়া পাত্র ও চীবর ফিরাইয়া দিতে চাহিয়াছেন; তাই আমরা ইঁহাকে আপনার নিকট লইয়া আসিয়াছি।" ইহা শুনিয়া শাস্তা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা ইহাকে এককালে এতগুলি শীল শিক্ষা দিতে গেলে কেন? ইঁহার যতদূর শীল রক্ষার শক্তি আছে, ততদূরই রক্ষা করিবেন; তাহার অতিরিক্ত কিরূপে রক্ষা করিবেন? অতঃপর যেন তোমাদের এরূপ ভ্রম না ঘটে। এই ব্যক্তি সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য তাহা আমি নির্ণয় করিয়া দিতেছি।" অনন্তর তিনি সেই ভিক্ষুর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "তোমায় একসঙ্গে বহু শীল অভ্যাস করিতে হইবে না; তুমি তিনটী শীল রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে কি?" "হাঁ ভগবন্, আমি তিনটী শীল পালন করিতে পারিব।" "বেশ কথা। তুমি এখন হইতে কায়দ্বার, বাক্যদ্বার এবং মনোদ্বার এই তিনটী পাপ প্রবেশপথ রক্ষা করিয়া চল। কায়ে কখনও কুকার্য্য করিও না, মনে কখনও কুচিন্তা করিও না, বাক্যে কখনও কুকথা প্রয়োগ করিও না। তুমি হীন গার্হস্থ্যদশায় প্রতিগমন করিও না, এখানে অবস্থিতি করিয়া উক্ত শীলত্রয় পালন করিতে থাক। এই উপদেশ লাভ করিয়া ভিক্ষুর বড় আনন্দ হইল, তিনি "হাঁ ভগবন্, আমি এই শীলত্রয় পালন করিব" বলিয়া শাস্তাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক আচার্য্য ও উপাধ্যায়দিগের সহিত স্বীয় আবাসে ফিরিয়া গেলেন। শীলত্রয় পালন করিতে করিতে তাঁহার মনে হইল, "আচার্য্য ও উপাধ্যায়গণ আমাকে এত শীলের কথা বলিলেন; কিন্তু তাঁহারা কেহ বুদ্ধ নহেন বলিয়া এই তিনটী শীলের মর্ম্মও আমার হৃদয়ঙ্গম

করাইতে পারিলেন না। কিন্তু সম্যক্‌সম্বুদ্ধ নিজের অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে পাপদ্বার নিরোধক তিনটীমাত্র নিয়মদ্বারা আমাকে সর্ব্বশীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। অহো! শাস্তা আশ্রয় দিয়া আমার কি উপকারই না করিলেন!" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে কতিপয় দিনের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়া তিনি অর্হত্ত্বে উপনীত হইলেন। যখন ভিক্ষুরা এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন তখন তাঁহারা একদিন ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে লাগিলেন, অহো বুদ্ধের কি অদ্ভুত ক্ষমতা! যে ব্যক্তি শীলরক্ষা করিতে পারিবে না ভাবিয়া হীনাশ্রমে প্রতিগমন করিতেছিল তাহাকে তিনি তিনটী মাত্র নিয়মদ্বারা সর্ব্বশীল শিক্ষা দিলেন এবং অর্হত্ত্ব প্রদান করিলেন।" ইহা শুনিয়া শাস্তা কহিলেন, "অতি গুরুভারও খণ্ডশঃ বহন করিলে লঘু হইয়া থাকে। পুরাকালে পণ্ডিতেরা অতি বৃহৎ একখণ্ড সুবর্ণ পাইয়া প্রথমে উহা উত্তোলন করিতে পারেন নাই; শেষে উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া অনায়াসে লইয়া গিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন।]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কোন গ্রামে কর্ষকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এক দিন এক ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেছিলেন, সেখানে পূর্ব্বে একটা গ্রাম ছিল। সেই গ্রামের এক শ্রেষ্ঠী উরুপ্রমাণ স্থূল চতুর্হস্ত দীর্ঘ এক কাঞ্চনখণ্ড মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বোধিসত্ত্বের লাঙ্গল সেই কাঞ্চনখণ্ডে প্রতিহত হইল। বোধিসত্ত্ব মনে করিলেন মৃত্তিকামধ্যে বিস্তৃত কোন কোন বৃক্ষমূলে তাহার লাঙ্গল আবদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু খনন করিয়া দেখেন ইহা কাঞ্চনখণ্ড। উহাতে ময়লা লাগিয়াছিল; তাহা তিনি সযত্নে ছাড়াইয়া রাখিলেন। অনন্তর সমস্ত দিন ক্ষেত্রকর্ষণ করিয়া সূর্য্যাস্তের পর বোধিসত্ত্ব যুগ ও লাঙ্গল এক পাশে রাখিয়া দিয়া ঐ কাঞ্চনখণ্ড লইয়া গৃহে ফিরিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু তিনি উহা তুলিতে পারিলেন না। তখন তিনি ঐ স্বুবর্ণ দ্বারা কি কি কাজ করিবেন বসিয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলেন এবং স্থির করিলেন, "এক অংশ দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিব, এক অংশ মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া রাখিব, এক অংশ লইয়া বাণিজ্য করিব এবং এক অংশ দ্বারা দানাদি পুণ্যকার্য্য করিব।" অনন্তর তিনি সেই কাঞ্চনখণ্ডকে চারি টুকরা করিয়া কাটিলেন এবং এক একটী করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন। ইহার পর বোধিসত্ত্ব

দানাদি সৎকার্য্যে জীবনযাপন পূর্ব্বক কর্ম্মানুরূপ ফলভোগার্থ দেহত্যাগ করিলেন।

কথাশেষে শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া এই গাথা পাঠ করিলেন ;—

পূর্ণানন্দ চিত্ত আর পূর্ণানন্দ মন,
নিয়ত কুশল কর্ম্ম নির্ব্বাণকারণ,
ভবপাশ মুক্ত সেই সাধু সদাশয়,
ধর্ম্মযুদ্ধে জয়ী সদা জানিবে নিশ্চয়।

[সমবধান—তখন আমিই ছিলাম সেই কর্ষক, যে কাঞ্চনখণ্ড লাভ করিয়াছিল।]

(সাহিত্য সংহিতা হইতে) শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ, এম এ।

আয়ুর্ব্বেদবাণী।

আয়ুর্ব্বেদ ও বাঙ্গালা সাহিত্য।

আয়ুর্ব্বেদ যে ভাবে আমাদিগকে জীবন যাপন করিতে বলিয়াছেন, তাহা যে বিজ্ঞান-সম্মত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ শাস্ত্র ঋষিগণের গভীর গবেষণার ফল। ইহাতে স্বাস্থ্যরক্ষার যে সমুদয় বিধি-নিষেধ আছে, সেইগুলি মানিয়া চলিলে অকালমৃত্যু আমাদের দেশ হইতে চলিয়া যাইবার সম্ভাবনা। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদের স্বাস্থ্য-বিধান তেমন বিস্তৃতভাবে সাধারণের সহজবোধ্য ভাষায় জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয় নাই। আয়ুর্ব্বেদোক্ত মূল্যবান ঔষধগুলি অপেক্ষাও এই বিধান ও নীতি-মালার মূল্য অনেক অধিক। বাঙ্গালা সাহিত্যে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান-ঘটিত পুস্তকের একান্ত অসদ্ভাব, যে দুই চারিখানি আছে, সেগুলি ইংরেজী স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের তর্জ্জমা। একের স্বাস্থ্যবিজ্ঞান অপরের স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের তর্জ্জমা হইলে যেরূপ বিভ্রাট ঘটে, তাহা সকলেই লক্ষ্য করিতেছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের এই বিভাগের পুষ্টিসাধন করিতে হইলে আমাদের দেশীয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞানকেই গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহা আয়ুর্ব্বেদের অভ্যন্তরেই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। বাঙ্গালার সাহিত্যিক বা সাহিত্যানুরাগী কবিরাজ-গণের দৃষ্টি এদিকে নিপতিত হইলে আমরা আনন্দিত হইব। "অর্ঘ্য"

"প্রাণোবা অমৃতম্ ।" (শ্রুতিঃ)

আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ।

(স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন ও চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র)

"আয়ুঃকাময়মানেন ধর্ম্মার্থ সুখসাধনম্।
আয়ুর্ব্বেদোপদেশেষু বিধেয়ঃ পরমাদরঃ॥" বাগ্‌ভট।

৩য় বর্ষ } কার্ত্তিক ১৩২২ { ৭ম সংখ্যা।

উপনিষদের প্রাণ-বিজ্ঞান।

উপনিষদ—ব্রহ্মবিদ্যা,আত্মাই ব্রহ্ম, আবার যেখানে প্রাণ সেখানেই আত্মা। প্রাণ ভিন্ন পরমাত্মার কি উপলব্ধি হয়? পরমাত্মাকে-ব্রহ্মকে বিদিত হইতে হইলে পূর্ব্বেই প্রাণকে প্রণিধান করা আবশ্যক। প্রাণ কি প্রাণের অস্তিত্ব কোথায়? ইহা কোথা হইতে আসে, আর কোথায় বা চলিয়া যায়? চৈতন্য মাত্রকেই আমরা প্রাণ সংজ্ঞায় অভিহিত করি, চৈতন্যের চির অভাবকেই আমরা প্রাণহীন বা মৃত বলি, প্রাণই অমৃত, প্রাণই পালনীয়, আহার্য্য জিজ্ঞাস্য, সেব্য, ভোক্তা, গন্তা স্রষ্টা, পাতা ইত্যাদি। এক কথায় বলিতে গেলে প্রাণই-ত্রিলোক জগৎ, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের হেতুভূত। সর্ব্বত্রই প্রাণের খেলা, প্রাণের মায়া,প্রাণের বিচার, প্রাণেরই আধার। সর্ব্বত্র আমরা প্রাণের পবিত্র প্রেম-বৈচিত্র্য বিলোকনে বিমুগ্ধ হইয়া উঠি, হর্ষ-শোক ভুলিয়া যাই; অথবা তাহাতে অভিভূত হই; নিত্য নব ২ বলে বলীয়ান হই কিংবা অসার অপদার্থ

হইয়া পড়ি। হে প্রাণ প্রাণী হইয়াও আজ তোমাকে আমরা সম্যক্ বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ নহি। তোমার অতুল মহিমা! তোমাকে নমস্কার। কোথায় তোমার আরম্ভ কোথায় পরিণতি, একবার বলিয়া দেও।

ধর্ম্মশাস্ত্র, জ্যোতিষ,বিজ্ঞান, দর্শন,তন্ত্র, রসায়ন আয়ুর্ব্বেদ ধনুর্ব্বেদ প্রভৃতি সকলের মধ্যেই প্রাণের কথা জগৎ যেমন প্রাণময়,জগৎ জুড়িয়া তেমনি প্রাণের কথা। উপনিষদেও প্রাণের কথা আছে, সম্প্রতি উপনিষদের বরপুরুষ ব্রহ্মকে প্রাণকে কিরূপ বুঝিয়াছিলেন এবং বর্ণন করিয়াছিলেন তাহারই আভাস কিঞ্চিৎ এস্থলে দিতে প্রয়াস পাইব। পাঠকগণ আপাতত উপনিষদে যে টুকু প্রাণের কথা বলা হইয়াছে,অন্ততঃ সহজ দৃষ্টিতে বুঝাযায়,তাহাই দেখিবেন। ব্রহ্ম-বিদ্যা ও পরমপুরুষকে জানিবার জন্য যে প্রয়াস তাহা পরে করিলে ও পারেন। আমরা আদৌ প্রাণকে বিজ্ঞানকে শতায়ুকে বুঝিতে পারি না বা চেষ্টা করিনা কিন্তু ব্রহ্মকে বিদিত হওয়ার জন্য বিভোর হইয়া পড়ি। আগে দেখিতে হয় প্রাণ কি, বিজ্ঞান কি ও শতায়ু লাভের উপায় কি এসকল জানিতে পারিলে ব্রহ্মকে পরমাত্মা পরম পুরুষকে পরিজ্ঞাত হইতে কি কষ্ট হয়? ঋষিগণ প্রাণকেই পূর্ব্বে বুঝিয়াছিলেন। তাঁহারা শতায়ু লাভ করিতে পাপ রোগ হইতে বিমুক্ত থাকিতেই নিয়ত চেষ্টা করিতেন। প্রথম দেহাত্মাকে গ্লানি রহিত না করিতে পারিলে,চিত্তের মলিনতা; ব্যাধি-কলুষ দূর করিতে না পারিলে সেই পরম পুরুষকে, জীবের একতম আরাধ্য মুক্তি বা চিরানন্দ পদকে কি লাভ করা যায়? অপনারা দেখিবেন উপনিষদ সর্ব্বাগ্রেই পাপের কথা, শতায়ুর কথা এবং অত্মঘাতীর অনন্ত দুঃখ বা নরকের কথাই বলিয়াছেন।

এই চরাচর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ বিভূতি, পরম ঐশ্বর্য্য পূর্ণ। ইহাদের যিনি কর্ত্তা—বিভু তিনিও পরিপূর্ণ সুতরাং পরিপূর্ণতা হইতে যাহার আরম্ভ তাহার উত্থান পরিণামও পূর্ণ। সার বস্তু হইতে যাহার উৎপত্তি পরিণাম ও তাহার সার। স্থূল কথা পূর্ণতা হইতেই আরম্ভ পূর্ণতাই শেষ। যে পর্য্যন্ত পূর্ণতা প্রাপ্ত না হয় সে পর্য্যন্ত বিশ্রান্তি কোথায়? পূর্ণের পথে বাঁধা বিপত্তিই রোগ, শোক, মোহ, দৈন্য, মৃত্যু! জগৎ অবিশ্রম পূর্ণতার পথে ছুটিয়া চলিতেছে, কা'র সাধ্য তা'কে বাঁধা দেয়। যে তাহার গতির পথে দাঁড়াইবে এমন কি মনন মাত্র করিবে তাহারই মৃত্যু নিশ্চয়। যাও সেই পূর্ণতার পথে

পূর্ণতা লাভ করিতে সেই শিবধাম, স্বর্গরাজ্য চিরনিবৃত্তি ও পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হইবে। যে পূর্ণতা হইতে উদ্ভূত হইয়া ছিলে সেই পূর্ণতাকেই প্রাপ্ত হইবে—মুক্তি লাভ হইবে।

ঋষি গাইয়াছেন :——

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরিঃ ওঁ॥

অতঃপর ঈশোপনিষৎ বা বিভূতি বিজ্ঞান বলিতেছেন :——

মানব জগতীতলে উপস্থিত হইয়া বিবিধ ঐশ্বর্য্য পূর্ণ এ ভূমণ্ডল অবলোকন করিয়া স্বভাবতঃই আপন কর্ত্তব্য গুলি বিস্মৃত এবং আত্মসুখে মত্ত হইয়া জগতের বিপুল ঐশ্বর্য্য নিজস্ব মনে করিয়া, তাহারই একান্ত ভোগে অভিলাষী হয়।

এই জগতীতলে যা কিছু স্থাবর জঙ্গম বস্তু জাত দেখিতে পাওয়া যায়,তৎসমুদয়েই ভগবান পূর্ণরূপে বিরাজমান; অর্থাৎ এই সমুদয় ঐশ্বর্য্যই তাঁহার, তোমার আমার ইহাতে কি অধিকার রহিয়াছে? সুতরাং ত্যাগের সহিত অনাসক্ত ভাবেই ইহা ভোগ করিতে হইবে। কাহারও সম্পত্তিতে তোমার লোভ করিবার অধিকার নাই এবং তাহা করিওনা আত্মসুখের জন্য অন্যকে বঞ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হইওনা। এইরূপ কর্ম্মদ্বারাই তোমাকে শতবৎসর জীবন ধারণ করিয়া ভগবানের আদেশ পালন করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন তোমার অন্য কোন কর্ত্তব্য নাই। তুমি কখন ও পরপীড়া, পরস্ব হরণাদি কর্ম্মে লিপ্ত হইবেনা।

উপনিষদঃ—ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্॥
কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥*

আত্মহত্যা যে মহাপাপ, অনন্ত নরক ইহা সর্ব্বত্র এক বাক্যে স্বীকৃত। অনেকেই জগতের—দেহের নশ্বরত্ব অনুমান করিয়া দেহের প্রতি আত্মার প্রতি

* বাক্যের গৌরব হানি ভয়ে পাদটীকায় সন্নিবেশিত হইলনা,মূলের তাৎপর্য্য প্রকাশই আমাদের অভিপ্রেত। সঃ

অনাদর ও হিংসা করিয়া অকালে দেহ পাত করিতেও কুণ্ঠা বোধ করেনা কিন্তু সাবধান! আত্মহত্যা করিবার, অথবা আত্মাকে দুঃখ দিবার ক্ষমতাও তোমার নাই। মনে করিওনা অত্মহত্যা করিলে সকল দুঃখ অবসান হইবে, তাহা নহে।

যে সকল ব্যক্তি আত্মহত্যা করে তাহাদের পরিণাম কেবল সেখানেই নহে, পরন্তু সে সকল আত্মঘাতীর আত্মা এমন স্থানে যাইয়া পতিত হয়,যে স্থান চিরঅন্ধকারময়; অনন্ত দুঃখ তথায় বিকট মূর্ত্তিতে বিদ্যমান। জগত প্রকাশ-মান সূর্য্যের সেখানে কোন কালেও গতি হয় না।

উপনিষদঃ—অসূর্য্যা নাম ত লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥

এই যে পরমাত্মা ইনি নির্ব্বিকার নিশ্চল অদ্বিতীয় এবং মন হইতেও বেগ শালী ইনি ইন্দ্রিয়গণের অতীত হইয়া বিদ্যমান আছেন। স্থির হইয়া ও সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী। বায়ু ইহারই শক্তি সহকারে বর্ষণাদি যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া জগৎপ্রাণ রূপে প্রতিভাত হন।

সেই পরম পুরুষ সতত ক্রিয়াশীল অথচ নিষ্ক্রিয়, সর্ব্ববস্তু হইতেই পৃথক্ অথচ সমস্তের মধ্যেই বিদ্যমান তিনি যেমন সকলের অন্তরে আছেন তেমন বাহিরেও আছেন।

উপনিষদঃ—অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি॥
তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥

যিনি আপন আত্মাতে সমুদয় বস্তুজাতের সত্ত্বা উপলব্ধি করেন অথবা সকলের প্রতি আত্মবৎ ব্যবহার করেন, আর সর্ব্বভূতেই আপনাকে দেখিতে পান, অর্থাৎ সকলের সহিত আত্মার অভেদ জ্ঞান অনুভব করিতে পারেন, তিনি কখনও অপরকে তুচ্ছ করিতে পারেন না,নিজেও অভিভূত হন না।

যে সময় এই জ্ঞান উপস্থিত হয় যে সর্ব্বভূতে যে, আত্মা আমাতেও সেই আত্মা তখন আর তাহার কোন প্রকার মোহ বা শোক আসিতে পারে না যে হেতু এক ভিন্ন যখন দুই এর অভাব তখন কে কাহার জন্য শোক বা মোহ প্রাপ্ত হয়?

উপনিষদ :—যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥
যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥

মানব শোক মোহাদিগ্রস্ত হইয়াই আপন মোক্ষ পথের বাঁধা জন্মাইয়া থাকে। অভীষ্ট স্থানে পৌছাইবার পক্ষে এই সকলই মহা অন্তরায়। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহাদের দ্বারা অভিভূত হইবেন না।

পরমাত্মা সকলের বীজভূত হইয়া সমুদয় উৎপাদন করিতেছেন কিন্তু তাঁহার বিশিষ্ট কায়া নাই পরন্তু সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম, তিনি দুঃখ বর্জ্জিত সুতরাং স্নায়ু রহিত, নিত্যশুদ্ধ, অতএব পাপবিহীন। তিনিই কাব্যকর্ত্তা, বিদ্বান্, সর্ব্ব-গুরুরূপে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। তিনি স্বয়ম্ভু, তাঁহার উৎপত্তির কারণ তিনিই। চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাহারই রূপ, কেবল উপাধিমাত্র ভেদ। অনন্ত কাল ব্যাপিয়া কেবল তিনিই আছেন এবং সমুদয় সুশৃঙ্খলা সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন।

উপনিষদ :—স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ
শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥

এসকল বিদিত হইয়াও যাহারা অবিদ্যাকে-অজ্ঞানতাকে, পাপকে, ব্যাধিকে প্রশ্রয় দেয় তাহারা ঘোর তমসাচ্ছন্ন লোক প্রাপ্ত হয়। আর যাহারা পরমাত্মাকে বিস্মৃত হইয়া কেবল জ্ঞানের উপাসনা করে তাহাদেরও সেই অন্ধতামিস্র গতিলাভ হইয়া থাকে।

অবিদ্যার ফল এবং বিদ্যার ফল যে পৃথক তা। পণ্ডিতগণ বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যা এবং অবিদ্যা উভয়কে যিনি সম্যক্‌রূপ বিদিত হইতে পারিয়াছেন, তিনি অবিদ্যার প্রভাবে মৃত্যুকে অবহেলা করিয়া বিদ্যা দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকেন।

অন্যদেবাহু র্বিদ্যয়ান্যদেবাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে॥
বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥

এইরূপ যাহারা অপদার্থ ও অজ্ঞানতার সেবা করে, আর যাহারা কেবল সম্পদের—আত্মসুখের অভিলাষী হয়, তাহারাও ঘোর অন্ধতামিস্রে পতিত হইয়া থাকে। এস্থলেও জ্ঞানিগণ সম্পদ ও বিনাশের উপাসনার ফল পৃথক্ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন! কিন্তু উৎপত্তি ও বিনাশকে যাঁহারা একই ভাবে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহারাই মৃত্যুকে পরাভব করিয়া সম্ভূতিরূপ অমৃত লাভ করিয়া থাকেন।

উপনিষদ :—অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
তত্তো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ॥
অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে॥
সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে॥

সত্যস্বরূপ—জ্ঞানমূলক যে বস্তু তাহা হিরণ্ময় পাত্র দ্বারা অর্থাৎ লোভনীয় বিষয় দ্বারা নিয়ত আবদ্ধ রহিয়াছে। অতএব হে পূষণ! সত্য উদঘাটন কারিন্! তুমি সেই সত্য বিষয়—মুখ্যজ্ঞান লাভার্থ ঐ আবরণ উন্মোচন কর, আমরা চরিতার্থ হই। হে অংশুমালিন্ সূর্য্য! তুমিই একমাত্র মুখ্য জ্ঞান ও কর্ম্ম তুমিই জগৎ সৃষ্টির কারণ প্রজাপতি, তুমি জগৎ পালন কর, তুমিই এক মাত্র আরাধ্য। তুমিই কিন্তু আবার উগ্ররশ্মি যমরূপে সমুদয় সংহার করিয়া থাক। তোমার প্রলয়কারী তেজ সম্বরণ কর, উহাকে বড় ভয় করি। তোমার সেই কল্যাণতম মধুর আকৃতিকেই ভজনা করিতেছি। এই যে আমি এই পুরুষরূপে বিদ্যমান, ইহা তোমারই মধুর দান স্বরূপ, অন্য কিছু নহে। এই যে অমৃতময় জগৎপ্রাণ অনিল, এই যে শরীরান্তর্বর্ত্তী মুখ্য প্রাণ অমৃতস্বরূপ বায়ু, আর এই যে দেহ, যাহা এক সময় তোমারই তীব্র রশ্মিদহনে দগ্ধীভূত হইয়া ভস্মে পরিণত হইবে, তাহাও আমি বুঝিতে পারিতেছি।

উপনিষদ :—পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ।
তেজো যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি॥
বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর॥

হে অগ্নি, তুমি নিখিল জ্ঞান ও কর্ম্ম সকল বিদিত আছ, অতএব পূর্ণৈশ্বর্য্যের সুপথ আমাদিগকে প্রদর্শন কর এবং বিঘ্নস্বরূপ কুটিল পাপদুঃখ সকল হরণ কর, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি।

উপনিষদ ঃ—অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্

বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।

যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো

ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম॥

ওঁ পূর্ণমদঃ ইত্যাদি ঈশোপনিষৎ বলা হইল। (ক্রমশঃ)

আয়ুর্ব্বেদের গৌরব।

——ঃ০]৹[০ঃ——

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ঋষিগণ সোমরস অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং বেদে ইহার গুণ বর্ণন করিয়া অনেক সূক্ত রচনা করিয়াছেন। জানিনা সোমলতা কোথায় জন্মে এবং এখন কেহ উহা চিনেন কি না। বেদে লিখিত আছে মুজবান পর্ব্বতে সোমলতা জন্মে। যদি কেহ সংগ্রহ করিতে পারেন তবে সোমরস প্রস্তুত করিয়া দেখিতে পারেন। বেদে সোমরস কি প্রকার প্রস্তুত করিতে হয়, ঋক্ বেদের ৯ম মণ্ডলের ৬৭ সূক্তে বর্ণিত আছে, তাহা নিম্নে লিখিতেছি। প্রথমে সোম লতা-রূপে থাকে, তাহার দুইটী করিয়া পত্র বক্রভাবে অবস্থিত থাকে। প্রস্তর দ্বারা সেই লতা নিষ্পীড়িত হইলে রমণীগণ অঙ্গুলি দ্বারা তাহা চট্কাইয়া রস বাহির করেন, পরে সেই রস জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া মেষলোম নির্ম্মিত ছাঁকনি দ্বারা ছাঁকা হয়। সে ছাকনি কলসের মুখে স্থাপিত হয়, অঙ্গুলি দ্বারা উপরের রস সঞ্চালিত করা হয়, সুতরাং ছাকা শোধিত রস কলসের ভিতর পড়ে। সেই শোধিত ছাকা রস ক্ষীর বা দধির সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করা হয়। ক্ষরণশীল সোমরস শুভ্র বর্ণ অথবা ঈষৎ হরিত বর্ণ বা পিঙ্গল বর্ণ বলিয়াও কোন কোন স্থলে বর্ণিত হইয়াছে। গোচর্ম্মের পাত্রে এই সোমরস স্থাপিত হয়। উপরোক্ত ৯ মণ্ডলের ৬৬ সূক্তের ২৯ ও ৩০ ঋকে বর্ণিত আছে, এই যে সোমরস ইনি গোচর্ম্মের উপর প্রস্তরের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন, ইনি

আনন্দ লাভের জন্য ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছেন। হে ক্ষরণশীল সোম! তোমার যে অতি চমৎকার রস, যাহা স্বর্গ হইতে আহরণ করা হইয়াছিল, তদ্দ্বারা আমাদিগের প্রাণ দান কর এবং আমাদিগকে আনন্দিত কর।

আয়ুর্ব্বেদে যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসার যেরূপ উন্নতি হইয়াছিল এরূপ কোথায়ও হয় নাই। গেলেনের (gelon) পরবর্ত্তী কাল হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই রোগ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশে বিশেষ কোন আলোচনা হয় নাই। আয়ুর্ব্বেদ অনুসারে চারি প্রকারে ক্ষয় রোগ উৎপন্ন হয়। প্রথমতঃ শক্তির অতিরিক্ত কার্য্য করিলে যথা অতিযুদ্ধ, অত্যন্ত অধ্যয়ন, অত্যন্ত ভার বহন, অত্যন্ত ভ্রমণ, অতিরিক্ত লঙ্ঘন এবং বেশী সন্তরণ ইত্যাদি করিলে। দ্বিতীয়তঃ বেগধারণে যথা লজ্জা, ঘৃণা বা ভয় হেতু মল মূত্রাদির বেগ ধারণ করিলে। তৃতীয়তঃ ক্ষয় হেতু—যথা ঈর্ষা, উৎকণ্ঠা, ভয়, ক্রোধ ও শোক, অতি কর্ষণ, অতিরিক্ত মৈথুন, অনশন ইত্যাদি করিলে শুক্র ও ওজোধাতুর ক্ষয়ে দেহ স্নেহ ক্ষীণ হওয়াতে। চতুর্থতঃ বিষম ভোজন দ্বারা—দেশ কাল শরীরাদির বিসম (অনুপযুক্ত) বিবিধ অন্নপানাদি ভোজন দ্বারা।

পাশ্চাত্য দেশে ধাত্রীবিদ্যার অত্যন্ত উন্নতি হইয়াছে। রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করিবার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বিত হয় তাহা অতীব প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। রোগ হইলেই বেতনভোগী ধাত্রী দ্বারা সেবা শুশ্রূষা করান হয়। ভারতবর্ষেও রোগীর সেবা শুশ্রূষার জন্য ধাত্রীগণ নিযুক্ত হইত। কিন্তু সাধারণতঃ আত্মীয় কুটুম্ব নারীগণই সেবা শুশ্রূষা করিতে ব্রতী হইতেন। এই জন্য অর্থ ব্যয় করিয়া ধাত্রী নিযুক্ত করিবার কোন প্রয়োজন হইত না। এখনও ভারতবর্ষে নারীগন কেবল দয়া ও মায়ার দ্বারা পরিচালিত হইয়াই সেবা শুশ্রূষা করিয়া থাকেন। অর্থগ্রহণ করিয়া সেবা করা অসম্মান মনে করেন। মহাভারতে বর্ণিত আছে যে মাতৃমূর্ত্তি ও মূর্ত্তিমান স্নেহ লইয়া সুভদ্রা দেবী রোগীর ও আহতের সেবা শুশ্রূষার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। চরকে উক্ত আছে ভিষক, দ্রব্য, পরিচারক ও রোগী এই চতুষ্টয় সম্পূর্ণ গুণযুক্ত হইলেই রোগ প্রশমন হয়। পরিচারকের গুণ—উপচারজ্ঞতা (সর্ব্ববিধ কার্য্যাভিজ্ঞতা) দক্ষতা, রোগীতে অনুরাগিতা ও আত্মপবিত্রতা। ইতি—

শ্রীরাজকুমার সেন।

পল্লী-চিকিৎসক।

দশম পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সু—এই যে সময়ে ২ গ্রামের সব ছেলেপিলের এক সময়ে কাস হইতে দেখা যায়, ডাক্তারদের মতে যাহা 'হুপিং কাফ্' বলিয়া অভিহিত হয় তাহার ঔষধ জান কি ?

হ—এই শুনুন,—সুপারী যখন পাকিতে থাকে, তখন বাদুরে উহা চুষিয়া খায়। এই 'বাদুর চোষা' বা 'বাদুর ছোলা' সুপারী সংগ্রহ করিয়া মধ্যদেশে ছিদ্র করিয়া একটী সূত্লী দ্বারা গলায় দিলে উক্ত কাস সহজে সারিয়া যায়। ইহারই নাম কাসের 'সুপারী পড়া।'

একটী রসুন সূতাদ্বারা গলদেশে বাঁধিয়া দিলে কাসি দূর হয়। ইহা ছেলে-পিলের কাসের মহৌষধ।

সু—এইবার সর্দ্দি সম্বন্ধে কিছু বল।

হ—সর্দ্দি হইলে তিন দিবস পর্য্যন্ত মস্তকে তৈল দিতে নাই।

সর্দ্দি হইলে শয়ন কালে প্রজ্বলিত প্রদীপের তপ্ত তৈল পায়ের তলাতে মালিশ করিলে সহজেই সর্দ্দি গাঢ় হয়। পরদিন ইক্ষুগুড়ের সরবৎ পান করিলে উহা তরল হইয়া উঠিয়া যায়।

ঘৃতের সহিত মরিচের গুড়া খাইয়া জল পান না করিলে এক দিবসেই সর্দ্দি নিবারণ হয়।

গরম ২ জিলাপি ১০।১৫ খানা খাইয়া কিছুমাত্র জল খাইতে নাই এবং রাত্রিতে শয়নকালে তৈল গরম করিয়া পায়ের তলায় মালিশ করিলে সর্দ্দি শীঘ্র শুকাইয়া যায়। অবস্থানুসারে ২।৩ দিন পরে স্নান কর্ত্তব্য।

পায়ে তৈল মাখিয়া শয়নের পূর্ব্বে তুষের অগ্নিতে পদদ্বয় সেঁকিলে সর্দ্দি সারে।

ঘোষাফল জলে ভিজাইয়া উক্ত জল ২ ফোঁটা নাকের ভিতর দিলে এক দিবসে সর্দ্দি ভাল হয়।

দোক্তা তামাকের গোড়া উত্তমরূপে ভস্ম করিয়া জলে গুলিয়া কাপড়ে

ছাকিয়া একটী মৃৎ বা প্রস্তর পাত্রে রাখিতে হয়। অনুমান ঘণ্টা দশেক পরে এই জল ধীরে ২ ঢালিয়া ফেলিলে পাত্রের তলায় লবণবৎ এক সামগ্রী পাওয়া যায়। উহা শুকাইয়া লইয়া উহার এক ধান পরিমাণ যে কোনও কাস রোগীকে প্রয়োগ করিলে বিলক্ষণ উপকার দর্শে। উহাতে সর্দ্দি পাতলা হইয়া উঠিয়া যায়,—বক্ষঃস্থলের ভার কমিয়া যায়।

উচ্ছে পাতার রস অল্প মাত্রায় সেবন করাইলে সহজে সর্দ্দি উঠিয়া যায়।

সর্ষপ তৈল গরম করিয়া কণ্ঠনালী ও বক্ষস্থলে মর্দ্দন করিলে শ্লেষ্মা উঠিয়া গিয়া রোগীর স্বাস্থ্যলাভে সাহায্য করে।

সু—সর্দ্দির প্রাক্কালে গলায় বেদনা হইলে তখন কি কর্ত্তব্য?

হ—তখন বিশেষ সতর্ক হইতে হয়। সর্দ্দির প্রতি উপেক্ষা করিয়া চলিলে উহা জীবননাশক হইয়া উঠে। একটী কাপড়ে গলা জড়াইয়া রাখা উচিত— যেন আর ঠাণ্ডা না লাগে। গরম জল অবশ্য পান করিতে হয়।

গলার মধ্যস্থলে যেখানে বেদনা অনুভূত হয়, বাহিরে সেই স্থানে কলি চূণ মাখাইলে বেদনার উপশম হয়।

তামাক পাতায় চূণ মাখিয়া কণ্ঠস্থলে উহা লাগাইয়া দিলে বেদনা সারে। অনেক স্থলে এই তামাক পাতার ক্রিয়া হেতু রোগীর মস্তিষ্ক ঘুড়ায় ও বমনোদ্রেক হয়—তখন উহা খুলিয়া ফেলিতে হয়।

সু—শিশুদের কফের ঔষধ বল দেখি।

হ—আটিয়া কলার (বিচা কলা) আফুটা ডিগ লইয়া তন্মধ্যে সৈন্ধব লবণ দিয়া আগুনের তাপ দিতে হয়। তৎপর উহা পিষিয়া অর্দ্ধ ছটাক আন্দাজ রস বাহির করিয়া খাওয়াইলে শীঘ্র কফ, কাস সারিয়া যায়, কফ তরল হইয়া বাহির হয়। দুগ্ধপোষ্য শিশুকে কম মাত্রায় খাওয়াইতে হয়।

সোরাচানের (?) পাতার রস আধ ঝিনুক আন্দাজ খাওয়াইলে শিশুদের কফ করিয়া যে ছট্‌ফটি হয় তাহা সারিয়া যায়।

দুই তোলা গব্য ঘৃত লৌহ পাত্রে লইয়া অগ্নির তাপে নিষ্ফেণ হইলে দুইটী পিপুল চূর্ণ দিলে যখন ফুটিতে থাকিবে তখন একটু জামিরের রস দিয়া পরে তাহা নামাইয়া লইতে হয়। কফাধিক্যে এই ঘৃত অল্পমাত্রায় (আধ ঝিনুক আন্দাজ) লইয়া একটু গরম করিয়া খাওয়াইলে শিশুর কফ সারিয়া যায়।

সু—সর্দ্দি ও কফ হেতু বুক কামড়াইলে তার ঔষধ জান ?

হ—সর্ষপ তৈল ঝিনুকে লইয়া তৈলের বাতির শিষে উত্তপ্ত করিয়া উক্ত তৈল বক্ষঃস্থলে মালিশ করিলে ঐ বেদনা দূর হয়।

সু—স্বরভঙ্গের ঔষধ বল না ?

হ—মটর প্রমাণ সোহাগা মুখে রাখিলে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়।

সু—ক্ষয় বা যক্ষ্মা রোগের ২।১টা টোট্‌কা বল দেখি।

হ—কথায় বলে,—"উদরী, বাদরী, যক্ষ্মা।
এই তিন রোগে যারে ধরে,
তার নাই রক্ষা ॥"

যক্ষ্মা রোগ প্রায়ই নির্দ্দোষ আরোগ্য হয় না।

চিনি, মধু ও মাখন একত্রে খাইলে অন্ততঃ দুই সপ্তাহে উহার ফল পাওয়া যায়।

শিমুলের শিকড় মধুসহ বাটিয়া খাইলে উক্ত রোগ উপশম হয়।

আজ তবে এখন আসি।

সু—কই, আজ ২।১টা মন্ত্র তন্ত্র বলিলে না ?

হ—　'আমার সুখের সংসার,
আপ্‌সা নাই আমার ;
সাই গুরু সাই, তোমরা হাজির থাকিও।
তোমার নাম করিয়া সার,
আজকার দিনের বিপদ নাই আমার,
দোহাই মহাদেবের।'

বাটী হইতে কোথাও যাত্রাকালে এই মন্ত্র তিনবার পড়িতে হয় ও প্রত্যেক বার মন্ত্রশেষে বুকে ফু দিতে হয়। এরূপ করিয়া যাত্রা করিলে বিপদ ঘটে না। ইহা একটী "শরীর বন্ধ" মন্ত্র।

সু—ঠাকুদ্দা, ৮ম পরিচ্ছেদে বর্ণিত পোড়া ঘা সম্বন্ধে ২।১টী মন্ত্র বলিবার কথা ছিল, আজ তাহা বলিবে কি ?

হ—আচ্ছা, এই শুনুন—"এ ঘরের আগুন ও ঘরে'জল।
সীতা দেবীর আগুন ব্রহ্মা রক্ষা কর।"

গাত্রের কোনও স্থান পুড়িয়া গেলে তৎক্ষণাৎ এই মন্ত্র পাঠ করিতে ২ পাঠান্তে ফুৎকার দিতে হয়। কিয়ৎকাল এরূপ করিলে জ্বালা নিবারণ হয় ও ফোস্কা পড়ে না।

এই আরও একটী শুনুন,—

"ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর
তিনে মিলে দিল বর ;
তিনের আজ্ঞা,
"অমুকের" অঙ্গের পোড়া ঘা হইল জল, হইল জল॥"

এক ঘটী জল শূন্যে স্থাপন করিয়া উক্ত জল অভিমন্ত্রিত করতঃ দগ্ধস্থানে ঐ জল ২।৩ বার লাগাইলে জ্বালা দূর হয় এবং ক্রমে ঘা' শুকাইয়া যায়।

ইহার নাম পোড়া ঘায়ের জলপড়া। "অমুকের" স্থলে রোগীর নাম উল্লেখ করিতে হইবে।

সু—আচ্ছা, ঠাকুদ্দা, এই যে পঞ্চম পরিচ্ছেদে অর্শ রোগের ঔষধ বলিবার কালে বলিয়াছিলে "তুঁতে তামা"র আংটী। ঐ তুঁতে তামাটী কি? উহা কেমন করিয়া বাহির করিতে হয়?

হ—তুঁতের ভিতর তামা আছে, উহা বাহির করিয়া লইতে হয়। উহা বাহির করিবার সহজ উপায় এই যে,—লৌহপাত্রে লেবুর রস তুঁতিয়া ভিজাইয়া রাখিলে উহা হইতে তাম্র বাহির হয়। উহাই তুঁতিয়া তামা'।

সু—হাঁ, ঠিক, এজন্যই তুঁতেকে ইংরেজীতে বলে Copper sulphate.

হ—কি জানি দাদা আমরা এত সব বুঝিনা।

এখন তবে আসি।

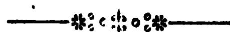
আচ্ছা, যাও। আমার কিন্তু মনে হয় যে এক নিশ্বাসে তোমার সব গুণ গুলি যদি লিখিয়া ফেলিতে পাইতাম। তুমি "যাই, যাই" বল সত্য আমার কিন্তু তোমাকে আদৌ ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না।

হ—আস্তে ২ দাদা সব হইবে অধৈর্য্য হইবেন না।

আসি তবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীগোপীনাথ দত্ত শিক্ষক
রাজাবাড়ী, ঢাকা।

স্বাস্থ্য-তত্ত্ব।



(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ভগ্ন-স্বাস্থ্য ব্যক্তির জীবন কিরূপ বিড়ম্বনাময় তাহা বিশেষ করিয়া না বলিলেও চলে একদিকে ধন,জন,যৌবনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে তৎসমুদয় ভোগের অক্ষমতা। কাজেই তদবস্থায় মানব অহরহঃ মৃত্যু কামনা করে—কেহ কেহ বা আত্মহত্যা করিয়া থাকে। শূলবেদনায় অসহ্য যাতনায় অনেকে আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া শুনা গিয়াছে। ধাতুদৌর্ব্বল্য, ধ্বজভঙ্গাদি রোগে আক্রান্ত হইলেও জীবনে স্পৃহা থাকেনা। অধুনা ঐ সকল কুৎসিৎ রোগের প্রাবল্য বেশী, কাজেই ঐ সকল রোগের ঔষধ যথেষ্ট বাহির হইয়াছে; কিন্তু শাস্ত্রীয় ঔষধ ব্যতীত অন্যান্য পেটেণ্ট ঔষধে কাহার কি উপকার হইয়াছে তাহা সঠিক বলা যায় না। মোট কথা এই যে, স্বাস্থ্যবিধি মানিয়া চলিলে মানব শতাধিক বর্ষ বাঁচিতে পারে। আমার পিতামহের ভ্রাতা বীরনগর নিবাসী রাজকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় গত পূর্ব্ব বৎসরে ১০৪ বৎসর বয়সে কাল কবলিত হইয়াছেন। তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্য কলাপ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, শুধু আহার বিহার শয়ন নিদ্রায় কালাতিপাত করিলে চলিবে না। ভগবচ্চিন্তায়ও দিবারাত্রির কতকটা সময় ব্যয়িত করা আবশ্যক। তিনি অতি প্রত্যুষে উঠিয়া সাজী ভরিয়া পুষ্পচয়ন করিতেন। লোকের বাটি বাটি ঘুরিয়া পুষ্পচয়নানন্তর স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে প্রায় ৭টা বাজিত। তিনি প্রত্যহ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া "ব্রহ্মামুরারি স্ত্রিপুরান্তকারী ভানু শশী ভূমি সুতা" প্রভৃতি মন্ত্রপাঠ না করিয়া শয্যা হইতে নামিতেন না। দন্তধাবন, মুখ প্রক্ষালনাদি শৌচক্রিয়া সমাপন ৫॥ টার মধ্যেই হইত—৭টা পর্য্যন্ত পুষ্পচয়ন করিয়া যখন তিনি ঘরে ফিরিতেন, তখন তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি ও প্রফুল্ল বদন দেখিয়া মনে হইত ঠাকুরদাদা আমার বুঝি এই বৃদ্ধ বয়সে নবযৌবন লাভ করিয়াছেন। তাঁহার ঈশ্বরানুরাগ যথেষ্ট প্রবল ছিল—যখন তখনই বলিতে শুনিয়াছি ঃ——

"ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথানিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" তিনি

বলিতেন কায়িক, বাচনিক বা মানসিক পাপ ব্যতিরেকে মানবদেহে পীড়ার সঞ্চার হইতে পারেনা। গ্রহাদির কুদৃষ্টিতে যে সকল রোগ উৎপন্ন হয় তাহা সেই গ্রহের ভোগ কাল কাটিয়া না গেলে কিছুতেই নিরাময় হয় না। শঙ্খ-রত্নাদি ধারণ মানবদেহের পক্ষে অশেষ উপকারক। আজি কাল লোকে মাদুলী, টোট্‌কা পট্‌কা ঔষধে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছে তাহার কারণ কি ? সাধারণ গৃহস্থ হইতে উকীল, মোক্তার, শিক্ষক, ছাত্র, কেরাণী প্রভৃতি সকলেই স্ব স্ব অভাব মোচনার্থে অর্থোপার্জ্জনে নিযুক্ত। গৃহের শত অভাব তাহাদের হৃদয়ে বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় জ্বালা দিতেছে। এমতাবস্থায় আয়ুর্ব্বেদীয় সমস্ত পুস্তক দূরে থাকুক একখানি মুষ্টিযোগের বহিও পড়িবার অবকাশ কোথায় ? কাযেই সামান্য একটু মাথা ধরিলে ও ৪৲ ভিজিট দিয়া ডাক্তার আনাইতে হয়। আমাদের চারিদিকে গাছ গাছড়া বনৌষধির ছড়া ছড়ি কিন্তু শুনা যায় অনেকে ধান্য বৃক্ষ চেনেন না—কাজেই আমাদের ভবিষ্যৎ কিরূপ তমসাবৃত সহজেই অনুমেয়। এলোপ্যাথিক ঔষধে অনেক সময়ে উপকার পাওয়া যায় সত্য কিন্তু সামান্য কারণে বিদেশীয় বিষে শরীর জর্জ্জরিত করা কি বুদ্ধিমানের কার্য্য ? আয়ুর্ব্বেদীয় যে সকল ঔষধের শোধন, জারণ, মারণাদি না করিয়া ব্যবহার করা চলেনা, কেবল তত্তৎস্থলেই কিন্তু বহুদর্শী কবিরাজের পরামর্শ গ্রহণ অবশ্য বিধেয়। মাথা ধরিলে কপালের দুই রগে তেজ পাতা বাটিয়া দিলে ৫ মিনিটে মাথা ধরা আরোগ্য হয়—তাই বলিয়া কি তেজপত্র কিনিতে কবিরাজ মহাশয়ের ঔষধালয়ে যাইতে হইবে ? বেণের দোকান হইতে কিনিলে কি ফল হইবেনা ? এইরূপ শত শত বিষয়ে আমরা বিবেক বুদ্ধি প্রণোদিত না হইয়া যে কোনও লোকের হাতে নিজের চিকিৎসার ভার দিয়া জীবন বিপন্ন করিয়া তুলি। আমার শরীরের আমিই চিকিৎসক—আমার শরীর কিসে ভাল থাকে, কোন্ দ্রব্য ব্যবহারে আমার শরীরের কোন্ যন্ত্র বিচলিত বা উত্তেজিত হয় সেটা তোমাপেক্ষা আমিই ভাল বুঝি। কেহ অন্নাহারে বসিয়া প্রায় আধ পোয়া গব্য ঘৃত সেবন করিয়া থাকে, আবার কেহ বা সামান্য একখানি লুচী খাইয়া বলে বুক জ্বালা করিতেছে।

রোগ হইলে বুঝিতে হইবে তোমার দেহ মন্দিরের জীর্ণ সংস্কার আবশ্যক হইয়াছে। যদি বিশ্বাসী হও, দেখিবে অবিলম্বে সে কার্য্য সমাধা হইয়া গিয়াছে।

পুরোহিত, গুরু আচার্য্য—ভট্টাচার্য্য শ্রেণীর যে সকল সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ এখনও স্বাস্থ্যবিধি মানিয় চলেন, নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ যজন যাজনাদি করিয়া থাকেন, যাঁহারা দেহ মন পবিত্র করতঃ দেবসেবায় কতক সময় অতিবাহিত করেন, সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ ও ধর্ম্মালোচনা করেন, কোনও রোগ সহজে তাঁহাদের শরীরে প্রবেশ করিতে পারেনা। ঐ সকল নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ এখনও ৮।১০ ক্রোশ পথ অনায়াসে পদব্রজে গমন করিতে সমর্থ, ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি এবং তাঁহাদের সহিত আলাপেও অনেক সময় পরিতৃপ্ত হইয়াছি। হিংসা দ্বেষাদি বর্জ্জিত সহাস্য বদন ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা এখনও ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত স্থান সমূহে স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। "তৈলাভ্যঙ্গ" যে স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল, আমরা তাহা জানিয়াও তৎপ্রতি মনোযোগ দিইনা—কেন ? সময়াভাব। ৩ ঘণ্টা ধরিয়া দেহে তৈল মর্দ্দন করা আর জাহান্নমে যাওয়া আমাদের নিকট সমান বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাড়াতাড়ি নাকে মুখে গুঁজিয়া আফিসে দৌড়ানই আমাদের জীবনের ব্রত হইয়াছে।

দৌড়ে যাও খেয়ে উঠে, যম তোমার পিছে ছুটে।

এই বাক্যের সার্থকতা কি হাতে কলমে দেখাইতে হইবে ? কত জনের যে হৃদ্‌রোগ (Heart disease) হইয়াছে, মধ্যে ২ বুক ধড় কড়্ করে—অসহ্য যাতনা হয়, তাহার কারণই ঐ। সেই জন্যই বলিতে ছিলাম, আমরা স্বাস্থ্য বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। কিরূপে দেশবাসীর দৃষ্টি এই দিকে নিপতিত হয়, তৎপক্ষে চেষ্টা করা প্রত্যেকেরই উচিত। সেকালে কুম্ভক, রেচকাদি প্রচলিত ছিল—এখন তাহা উপহাসের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন তাদৃশ স্বাস্থ্যবান্ লোক খুব কমই দেখিতে পাইবে—তবেই বুঝা গেল, লোকের ধাতু প্রকৃতি ও অভ্যাসের উপর স্বাস্থ্য অনেকটা কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকে। অর্থাভাবও আমাদিগকে অনেকটা ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে। কিন্তু প্রাত্যুত্থান, প্রভাত বায়ু সেবন, পুষ্পাদির সুগন্ধ গ্রহণ, মাল্যধারণ ভগবচ্চিন্তা ইত্যাদি ক্রিয়া সকলের পক্ষেই সম্ভব ও হিতকর।'পরকালে কি হইবে না ভাবিয়া অথবা পুণ্যের আশায় ঈশ্বরের নাম গ্রহণ কর বা না কর অন্ততঃ জগৎপিতা যে তোমাকে জগতে পাঠাইয়া তোমার সুন্দর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করিয়াছেন তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ছলেও তাঁহার নাম গ্রহণ করা বিশেষ কর্ত্তব্য।

তাহাতে মন বড়ই প্রফুল্ল হয়—নয়ন হইতে যে আনন্দাশ্রু নির্গত হয় তাহা অবর্ণনীয়। ভুক্তভোগিগণই সে সুখের অধিকারী। এক ঈশ্বরের গুণ গান করিয়া কত কঠিন রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

"যদি হয় অসাধ্য ব্যাধি, হরির নাম ভবৌষধি।"

ইহার তাৎপর্য্য কি? মর্ত্ত্যভূমিতে আসিয়া যেরূপ অর্থোপার্জ্জন করিতেছ, যেরূপ আহার বিহার পাইতেছ, আত্মীয় সজনে পরিবৃত হইয়া যেরূপ সুখানুভব করিতেছ, মনে জানিও সেই সকল সুখের দাতা জগদীশ্বর।

রোগে, শোকে সুখে সম্পদে, বিপদে, রাজদ্বারে, শ্মশানে মশানে যে অলক্ষ্য হস্ত দ্বারা তুমি সাহায্য পাইতেছ, তুমি স্বচক্ষে তাঁহাকে না দেখিলেও তাঁহার ক্রিয়া কলাপের বিষয় কি মনে ধারণ করিতে পার না? প্রশান্ত মহাসাগর আমরা দেখি নাই বলিয়া কি উহা নাই? তাই বলি—আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র মানিয়া চলিতে হইলে ঈশ্বর বিশ্বাসী হইতে হইবে। নাস্তিকের মুক্তি নাই। নিজের দেহ মন্দির মধ্যগত পরমাত্মরূপী যে ভগবান তিনিই আমার সুখ দুঃখের নিয়ন্তা, আহার বিহারাদি তাঁহারই তৃপ্ত্যর্থে সাধন করিতেছি এই ভাব সর্ব্বদা মনে রাখিতে হয়। দেহ সর্ব্বদা পবিত্র রাখিবে—মনকে শুচি রাখা অসম্ভব হইবেনা। জগতের নশ্বরত্ব যিনি উত্তম রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তিনি কখনই পাপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। দেহ মন্দির সর্ব্বদা বিধৌত রাখিলে তন্মধ্যগত চৈতন্যরূপী ভগবান আপনিই প্রসন্ন হইবেন।

সে কালে আর একালে অনেক প্রভেদ দাঁড়াইয়াছে দ্রব্যাদির মূল্য যেমন বাড়িয়া গিয়াছে পক্ষান্তরে অকৃত্রিম ঘৃত, দুগ্ধ, তৈলাদি পাওয়া অনেকটা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। বিশুদ্ধ পানীয় জলের নিতান্ত অসদ্ভাব, সেকালের মত তেমন উত্তম জলাশয় আর নাই, নূতন ২ প্রতিষ্ঠারও অভাব। বিশুদ্ধ জলের অভাবেও ব্যাধি অকালমৃত্যু লাগিয়া আছে।

লোকের রোগ হইলেও উপযুক্ত বৈদ্য আনিতে পারেনা, ভাল পথ্য ও ঔষধাদি ব্যবহার করিতে পায়না। সস্তায় মজিয়া যা তা পথ্য ও পেটেণ্ট ঔষধ সেবন করিয়া জীবনকে আরও অধিক ধ্বংসের পথে লইয়া যায়। প্রতিদিন আহারান্তে সুপক্ক পেঁপে, বেলের সরবৎ বা পাকা ফল খাইলে শরীরে রক্ত বৃদ্ধি হয় একথা সাহেবেরা বিশেষ জানেন, সেজন্য তাঁহারা যথেষ্ট অর্থব্যয়ও

করেন—আর আমরা ? ফল ভোজন করা যেন কর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়—বলিয়া মনে করি। ইচ্ছা থাকিলে আমরা সেই ফলের গাছ রোপণ করিতে পারি, কিন্তু অছিলা সময়াভাব। সারাদিন পরিশ্রমে শরীর শ্রান্ত হয়—রবিবার বা ছুটীর দিনেও আমরা সংসারিক কোনও কার্য্যে মনোনিবেশ না করিয়া আহারান্তে শয়ন করি, দিনটা কোথা দিয়া কাটিয়া যায় বুঝিতেও পারি না। মালী রাখিয়া কাজ লওয়াও অর্থব্যয় সাপেক্ষ, আমরা বস্তুতঃই দিশাহারা হইয়াছি। বন জঙ্গল কাটাইয়া এখন আমরা দেশকে সহরে পরিণত করিতে শিখিয়াছি কাজেই একটী শেফালিকা পত্র বা বিল্ব পত্র সংগ্রহ করিতে কতই না বেগ পাইতে হয়। একটু অনুসন্ধিৎসা বৃত্তি থাকিলে আমরা বুঝিতে পারিতাম সামান্য তৃণের মধ্যে কি অদ্ভুত রোগ বিনাশিনী শক্তি নিহিত রহিয়াছে। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল কিরূপে আমরা কথঞ্চিৎ রোগের আক্রমণ হইতে দূরে থাকিতে পারি, কিরূপ নিয়মে দেহযন্ত্র পরিচালিত করিলে দীর্ঘজীবী হইতে পারি আগামী বারে তাহা আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীআশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায়, ঢাকা।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় রক্ষার্থ প্রার্থনা।

——:০:——

(প্রাপ্ত)

১। পুনা মিউনিসিপালিটির তত্ত্বাবধানে আজ ২৩ বৎসর যাবৎ এক আয়ুর্ব্বেদিক ঔষধালয় সংস্থাপিত ও রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। এতদ্ব্যতীত মিউনিসিপালিটির দুইটি স্বতন্ত্র পাশ্চাত্য প্রণালীর হাসপাতালও আছে। এই দুটির সমান এমন কি কোন২ অংশে অধিকরূপে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়টিই সর্ব্ব সাধারণের সুবিধা প্রদান করিয়া আসিতেছে এবং এজন্য সর্ব্বসাধারণের অনুরাগও ইহার প্রতি বিশেষ ভাবে রহিয়াছে। ইহাও সত্য যে, ইংরেজী ধরণের হাসপাতালে যদি প্রত্যহ মোটামুটি একশত রোগী উপস্থিত হইয়া থাকে সেখানে এই আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়ে প্রত্যহ দেড়শত রোগী উপস্থিত হইয়া

ঔষধাদি গ্রহণ করতঃ সুবিধা ভোগ করিয়া থাকে। আরও দেখা যায় ঐসকল হাসপাতালে যদি দৈনিক রোগী প্রতি তিন আনা খরচ পড়ে তবে সেখানে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়ের রোগী প্রতি অড়াই আনা খরচ হইয়া থাকে। কিন্তু বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট গত ১লা আগষ্ট (১৯১৫) হইতে এই নিমিত্ত ঔষধালয়টি বন্ধ করিয়া দিয়াছেন যে, উহাতে যে সকল বৈদ্য নিযুক্ত আছে তাহারা "বোম্বে মেডিক্যাল রেজিষ্ট্রেশন এক্ট্" অনুসারে রেজেষ্টরী করা নহে। পরিতাপের বিষয় এই, বৈদ্যগণের রেজিস্টরী করিবার কোন সুযোগও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই রেজিষ্ট্রেশন এক্‌ট্ গঠিত হওয়ার সময় বোম্বাই গবর্ণর এবং কৌন্সিলের মেম্বরগণ এই মত প্রকাশ করিয়া ছিলেন যে বৈদ্য ও হাকিমগণের ইহাতে কোন সম্বন্ধ থাকিবেনা। এজন্য "নিখিল ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদ মহামণ্ডল" ২১শে জুলাই এক বিশেষ অধিবেশনে এক প্রস্তাব নির্দ্ধারণ করিয়া বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের নিকট তারযোগে উহা প্রেরণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত পুনা, বিলাসপুর, বাঁকিপুর, মুরাদাবাদ, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থান হইতে বৈদ্যগণ এবং জনসাধারণও প্রার্থনাপত্র এবং তার প্রেরণ করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদমহামণ্ডল পুনঃ ২২শে আগস্ট আপনাদের এক বিশেষ অধিবেশন করিয়া বোম্বাই গবর্ণর মহোদয়ের নিকট এক "মেমেরিয়াল" প্রেরণার্থ নিম্ন লিখিত ৫জন সদস্যের প্রতি ভারার্পণ করিয়াছেন। তদনুযায়ী নিম্ন লিখিত রূপ মেমেরিয়াল প্রেরিত হইয়াছে।

২। নিখিল ভারতবর্ষীয় "বৈদ্যসম্মেলনের" স্থায়ী সমিতির ২১শে জুলাইর অধিবেশনে মাননীয় সরকার বাহাদুরের নিকট পুনার আয়ুর্ব্বেদিক ডিস্‌পেন্‌সারীর রক্ষা এবং মেডিকেল রেজিষ্ট্রেশন এক্‌টের ১১ বিধানের আবশ্যকমত সংশোধন করণার্থ প্রার্থনা করিয়া যে একতার প্রেরণ করা হইয়াছিল, উহার প্রাপ্তিস্বীকার উপলক্ষে মাননীয় সেক্রেটারী মহোদয় ৪ঠা আগষ্ট তারিখের পত্রে জানাইয়াছেন যে, উক্ত বিষয় গবর্ণমেণ্ট সমক্ষে উপস্থিত করা হইবে। এজন্য কমিটি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।

৩। নিখিল ভারতবর্ষীয় বৈদ্যসম্মেলনের সভাসদ এবং সমস্ত ভারতীয় বৈদ্যগণ শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছেন যে পুনা সরকারের ইচ্ছা এবং পুনার কলেক্টরের আজ্ঞাক্রমে ১লা আগষ্ট হইতে পুনার আয়ুর্ব্বেদিক ঔষধালয়টি বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

৪। সমস্ত ভারতবর্ষীয় বৈদ্যগণের সন্তোষ বিধানার্থ এবং পুনার সর্ব্বসাধারণের অসুবিধা দূরীকরণার্থ এই কমিটি গবর্ণর মহোদয়ের নিকট বিনয় সহকারে প্রার্থনা জানাইতেছে যে তিনি উক্ত বিষয়ে কৃপা ও ন্যায় পূর্ব্বক বিচার করেন, আর পুনার সর্ব্বসাধারণের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ আপেট বি, এ, মহাশয় ১৮ই জুলাই পুনার সার্ব্বজনিক সভার সভাপতিরূপে যে এক প্রার্থনাপত্র প্রেরণ করিয়াছেন, সে বিষয়ে কৃপাদৃষ্টি প্রদর্শন পূর্ব্বক পুনার মিউনিসিপাল আয়ুর্ব্বেদিক ঔষধালয় যাহাতে পুনঃ প্রচলিত হইতে পারে সে বিষয়ে অনুকূল আজ্ঞা প্রদানে অশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হউন।

৫। "নিখিল ভারতবর্ষীয় বৈদ্য সম্মেলনের" স্থায়ী সভার সভাসদবর্গ ২২–৮–১৫ তারিখে এক বিশেষ অধিবেশনে পুনাবাসীর উক্ত প্রার্থনা পত্রের লিখিত বিষয়ে একমত হন এবং ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন যে,বোম্বের মেডিকেল রেজিষ্ট্রেশন এক্টের ১১ বি ধারার আবশ্যক মত সংশোধন করা হয় যেন উহা বরাবরের জন্য পরিষ্কার হইয়া থাকে, যেহেতু উক্ত এক্টের নিয়ম কেবল পাশ্চাত্য প্রণালীর চিকিৎসাকারীদের জন্যই বিধিবদ্ধ আছে,আয়ুর্ব্বেদিক অথবা অন্য কোন ভারতীয় চিকিৎসাপ্রণালীর চিকিৎসকগণের জন্য তাহার কোন সম্বন্ধ রাখা হয় নাই। এজন্য প্রার্থনা এই, সরকারবাহাদুর উদারতা প্রদর্শন পূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদিক চিকিৎসকগণকে 'রেজিষ্টার্ড' হওয়ার ক্ষমতা দান করেন।

৬। সুযোগ্য বৈদ্যগণের যোগ্যতা প্রদর্শনার্থ নিখিল ভারতবর্ষীয় বৈদ্য সম্মেলনের আয়ুর্ব্বেদিক শিক্ষাবিভাগ (আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যাপীঠ) কতিপয় বর্ষ যাবৎ তিনটী পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। উহার নিয়মাবলী এবং পাঠ্যক্রম (ইহা সরকার বাহাদুরের নিকট প্রেরিত হইয়াছে) অবলোকন করিয়া সরকার বাহাদুর যদি বুঝিতে পারেন যে, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে আবশ্যক যোগ্যতা লাভার্থ যে প্রকার শাস্ত্রজ্ঞান আবশ্যক, উহা ঠিক রীতিতেই সম্পন্ন হইতেছে। বিদ্যাপীঠের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণকে প্রমাণপত্রও (সার্টিফিকেট) যথারীতি দেওয়া হইয়া থাকে। কমিটি নম্রভাবে ইহাও বিজ্ঞাপিত করিতেছেন যে বোম্বাই প্রান্তের বোম্বাই আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়, পুনা বেদ-শাস্ত্রোত্তেজক সভা এবং বরোদা ষ্টেটের আয়ুর্ব্বেদিক পরীক্ষাসমিতির পক্ষ হইতেও এইরূপ অধিকার লাভার্থ প্রার্থনা জানাইয়াছেন।

৭। এইরূপ অবস্থায় সরকার বাহাদুর ইচ্ছা করিলে রেজিষ্ট্রেশনের নিমিত্ত ইহারই মধ্য হইতে যোগ্য বৈদ্য প্রাপ্ত হইতে পারেন। আর একটি সম্ভবপর কথা এই যে, বিহার গভর্ণমেণ্টের অনুকরণে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির শিক্ষা ও পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া উক্ত অসুবিধা দূর করিতে পারেন।

৮। আমাদের ভরসা আছে,বোম্বাই সরকার আমাদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়া উক্ত অসুবিধাগুলি দূর করিবেন যেন এই বিদ্যাটির পূর্ণ প্রচারে কোন প্রকার বাঁধা উপস্থিত না হয়। যেহেতু এ দেশের অনেক লোক শুধু ধর্ম্ম প্রবৃত্তি হইতে দেশী ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং ইহাই এদেশীয় লোকের স্বভাবের অনুকূল। অতএব সরকার উদারতা প্রদর্শন করিয়া সমস্ত ভারতবর্ষীয় বৈদ্য বিশেষতঃ পুনা এবং বোম্বাই প্রান্তের সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদ এবং আশীর্ব্বাদ ভাজন হইবেন, এই কমিটিকেও কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিবেন।

৯। উপসংহারে আয়ুর্ব্বেদ মহামণ্ডলের পক্ষ হইতে আমরা এই সকল বিষয়ে পুনঃ প্রার্থনা করিতেছি যে, উপরিলিখিত বিষয়ে সরকার বাহাদুর বিচার করিবেন।

সরকার বাহাদুরের অনুগৃহীত—

১। মেজর বামনদাস বসু আই, এম, এস,

২। কেদারনাথ চতুর্ব্বেদী বৈদ্য,

৩। জগন্নাথ প্রসাদ শুক্ল বৈদ্য,

৪। লক্ষ্মীকান্ত মণি বৈদ্য এল, এম, পি,

৫। জয়কুমার জৈনী বৈদ্য।

প্রয়াগ
২৩শে আগষ্ট
১৯১৫

আহরণ।

—*:০:*—

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অকালমৃত্যু।

বাঙ্গালায় বলি কেন,—সমগ্র ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছেন।—দুঃখের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রতিকারের কোনও প্রয়াস হইতেছে কি ?

আমাদের মনে হয়,—গ্রীষ্মপ্রধানদেশে আমরা শীতপ্রধান দেশের আচার-ব্যবহার প্রায় ষোল আনা চালাইতেছি বলিয়া আমাদের আয়ুর হ্রাস হইতেছে। ইংরেজ শীতপ্রধান দেশের লোক; তাহার দেশে দিবাভাগে কার্য্য করা প্রশস্ত ও স্বাস্থ্যের প্রতিকূল নহে; পক্ষান্তরে আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে প্রাতে ও অপরাহ্নে কার্য্য করাই স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল। এ নিয়ম আমাদের ছিল। সেকালে সকালে বিকালে পাঠশালা চলিত, কাছারী বসিত ও জমিদারী সেরেস্তায় কর্ম্ম হইত। প্রাচীনগণের মুখে শুনিয়াছি, হাট-বাজারও অনেক স্থলে দুই বেলা বসিত। মোট কথা, লোকে সকাল-বিকালে কার্য্য করিত; মধ্যাহ্নে বিশ্রাম করিত। এখনও আমাদের মধ্যে যিনি অতি বড় কর্ম্মী, তিনি আহার-বিহারে ষোল আনা ইংরেজ সাজিলেও মধ্যাহ্নে কেমন একটা আলস্যের ঘোর আসিয়া তাহাকে ক্ষণেকের জন্য আশ্রয় করে। এ পুরুষ-পরম্পরায় সংস্কার সহজে দূর হইবার নহে।

প্রতীচ্য সভ্যতার সহিত সংঘর্ষে আমাদের সমাজে প্রভূত পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে বটে,কিন্তু তাহা বলিয়া আহার-বিহারেও যে আমরা প্রতীচ্যের অনুগামী হইব, এমন কি কথা আছে? 'খাওয়া পরা'য় দেশের চালই যে ভাল এবং স্বাস্থ্যরক্ষায় ও আয়ুবৃদ্ধির সহায়ক, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।—"মানবের দেহটা অন্নেরই পরিণাম, উহা পিতৃপিতামহ ও মাতৃমাতামহাদি ক্রমে পুরুষ-পরম্পরায় অনেক দূর হইতে পরিণত হইতে২ ভূপৃষ্ঠে আবর্ত্তিত ক্রীড়া-কন্দুকের মত আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই পিতৃপিতামহাদি ও মাতৃমাতা-মহাদির আহার্য্য বস্তুই এই শরীরের উপাদান। যাবতীয় বস্তুই স্বজাতীয় বস্তুর পুষ্টিসাধন করে, যেমন জল জলের অনল অনলের, মৃত্তিকা মৃত্তিকার সংযোগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সে জন্য যাহার পূর্ব্বপুরুষ যে জাতীয় আহার্য্য বস্তু ব্যবহার করিত, তাহার শরীর সেই উপাদানভূত আহার্য্যবস্তুসেবনেই নীরোগ হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ হইবে, বিপরীত ব্যবহারে অনিষ্ট হইবে। * * *

যে দেশে যাহার জন্ম অর্থাৎ যে দেশের জল বায়ু ও মৃত্তিকা যাহার শরীরের উপাদান, তাহার পক্ষে সেই দেশজাত এবং সেদেশে চির প্রচারিত খাদ্যদ্রব্যই হিতকর, বিদেশীয় খাদ্য তাহার স্বাস্থ্য বা আয়ুবর্দ্ধক হইতে পারে না ইহা মহর্ষি চরকের উপদেশ।

এই হেতু ভারতবর্ষীয় লোকের অন্য দেশীয় খাদ্য এবং অন্য দেশীয় লোকের ও ভারতবর্ষজাত খাদ্য স্বাস্থ্যের কারণ হইবে না।"

মহর্ষি বলিয়াছেন,—

"অনভ্যাসেন বেদানামাচারস্য চ বর্জনাৎ
অলসাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্ব্বিপ্রান্ জিঘাংসাতি॥"

ইহার অর্থ এই যে, "বেদের অনভ্যাস—অর্থাৎ উদাত্ত,অনুদাত্ত, সমাহারাদি স্বরে শ্বাস-উচ্ছ্বাসের বহিষ্করণ ও বিধারণের অভাবে, নিজ নিজ সদাচার-ত্যাগ এবং সামর্থ্য সত্ত্বে অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের পরিত্যাগে যেমন আয়ুঃক্ষয় হয়, কিন্তু অন্নদোষে তদপেক্ষা আয়ুঃক্ষয় অধিক হয়, আয়ুঃক্ষয় অন্নদোষে যেমন হয়, এরূপ আর কিছুতেই হয় না।

সুতরাং দেশাচার-সম্মত অন্নই আমাদের স্বাস্থ্যের উপযোগী ও আয়ুবর্দ্ধক।

আয়ুর্ব্বেদ এই কথা পুনঃ পুনঃ নানাভাবে আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। সেই শিক্ষার বহুল প্রচার আবশ্যক।

আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রণালী কেমন হওয়া উচিত, আয়ুর্ব্বেদে তাহা উক্ত আছে। "অর্ঘ্য।"

আয়ুর্ব্বেদ-বাণী।

পুরাতনের পুনরাবর্ত্তন।

* * * * *

চিকিৎসা।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে কবিরাজী চিকিৎসাই প্রচলিত ছিল ও তাহাতেই রোগীর রোগ সারিত। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার পর হইতে পৃথিবীতে ডাক্তারি ছাড়া চিকিৎসা নাই (যেমন কানু ছাড়া গীত নাই) ইহাই লোকের ধারণা জন্মিল। সকলেরই মত হইল, কবিরাজী চিকিৎসা কি চিকিৎসা? কবিরাজী চিকিৎসার নাম হইল হাতুড়ে চিকিৎসা; কারণ কবিরাজ গাছ-পালা সিদ্ধ করিয়া লইতে বলে, তাহাদের নাইট্রিক্ অ্যাসিড্, সালফিউরিক অ্যাসিড সোডা প্রভৃতির ন্যায় জীবন্ত ঔষধ নাই। তাহারা পথ্য দেয় দুধ, ঘোল, মসূর

---

* জীবন-শিক্ষা (১৬৪ পৃষ্ঠা) পণ্ডিত জয়সেন সিদ্ধান্তভূষণ।

ডালের যূষ কাঁচাকলার ঝোল ইত্যাদি। ঘোল ও কলা, কি সর্ব্বনাশ! ও খাইলে ত রোগী সদ্য সদ্য নিউমোনিয়া হইয়া মারা পড়িবে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে অনেকেই ঠেকিয়া শিখিয়াছেন যে, আমাদের দেশে আমাদের জাতীয় চিকিৎসাই ভাল। সেই জন্য আমরা আবার কবিরাজী চিকিৎসার আদর দেখিতেছি। আর ঘোলত এখন ডাক্তারদিগের সর্ব্বব্যাধিধ্বংসকারী ভেষজ হইয়াছে।

খাদ্য।

আমাদের দেশে পুরাকালে ফল মূল ও দুগ্ধই সাত্ত্বিক আহার বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু যে দিন সাহেবেরা বলিলেন, "মাংসই মানবের প্রধান খাদ্য" সেই দিন হইতে মা ভগবতীর উপর বাবুদের অশ্রদ্ধা ও চপ্ কাট্‌লেট্ শিক্-কাবাব কোর্ম্মা কোপ্তায় আসক্তি জন্মিল। এখন সাহেব মহাশয়েরা অনেক স্থলেই আমাদের বহু পূর্ব্বস্থিরীকৃত বিষয়গুলিকে আপনাদের উর্ব্বর মস্তিষ্কের অদ্ভুত ফল বলিয়া প্রচার করিতেছেন। তাঁহারা এখন দুগ্ধকেই শ্রেষ্ঠ খাদ্য বলিয়া ডিক্রী দিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের সভ্য মহাশয়েরাও সুর বদলাইয়াছেন ও এখন দুধের জন্য মাথা কুটিতেছেন এবং গোরক্ষিণী সভায় যোগ দিতেছেন। অতঃপর আর বোধ হয়, তাঁহারা সভ্য ইংরাজী খানা—মাংস, ডিমপ্রিয় মহোদয়গণ, কলা, পেঁপেও আমরা খাইব কি? ও ত বানরে খায়। দুধ—সে আবার আমরা কি খাইব, ও ত বাছুরে খায়—বলিবেন না। এখন আবার শরীর রক্ষার জন্য অনেকে সাহেবি খানা ত্যাগ করিয়া হিন্দুর প্রকৃত খাদ্য খাইতে অভিলাষী হইয়াছেন। * *

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ("আর্য্যাবর্ত্ত")

বৈদেশিক বার্ত্তা।

——:০]॰[০:——

সার জেম্‌স্ ময়ার নামক কোন প্রসিদ্ধ ইংরেজ ডাক্তার দীর্ঘজীবন লাভের অনুকূল নিম্নলিখিত কতিপয় উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন; (১) আট ঘণ্টা নিদ্রা যাইবে, (২) দক্ষিণ পার্শ্ব চাপিয়া শয়ন করিবে; (৩) শয়নাগারের

অন্ততঃ দুই একটী জানালা সমস্ত রাত্রি খুলিয়া রাখিবে ; (৪) গৃহের সম্মুখে একটী পরদা ঝুলাইয়া রাখিবে ; (৫) গৃহের দেওয়াল হইতে কিছুদূরে শয়ন করিবে ; (৬) প্রাতে শীতল জলে স্নান না করিয়া শরীরের উত্তাপের সম পরিমাণ উষ্ণ জলে স্নান করিবে ; (৭) প্রাতঃকালে জলযোগের পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ ব্যায়াম করিবে ; (৮) পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিদিগের পক্ষে দুগ্ধ পান প্রশস্ত ; (৯) আহারের কালে চর্ব্বিময় পদার্থ আহার করিবে ; (১০) মাদক দ্রব্য সেবনে বিরত থাকিবে ; (১১) খোলামাঠে ব্যায়াম করিবে ; (১২) শয়নগৃহে কোন গৃহপালিত জন্তু প্রভৃতি প্রবেশ করিতে দিবে না ; (১৩) সম্ভব হইলে সহরের বহির্ভাগে পল্লীগ্রামে বাস করিবে, (১৪) পানীয় জল ও পয়ঃপ্রণালীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে ; (১৫) সর্ব্বদা এক রকম কার্য্যে লিপ্ত থাকিবে না ; (১৬) মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম গ্রহণ করিবে ; (১৭) সর্ব্বপ্রকার দুরাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিবে ; (১৮) মেজাজ শীতল রাখিবে। সার জেম্‌স্ ময়ার অল্প পরিমাণ সুসিদ্ধ মাংস ভক্ষণেরও উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত ডাক্তার বলিয়াছেন, উচ্চ ও টাইট কলার ব্যবহার ফলে শরীরের ঊর্দ্ধভাগ দিয়া সুন্দর রূপে রক্ত চলাচল করিতে পারে না। ইহার ফলে অনেকের চক্ষুরোগ হইয়া থাকে এবং অনেকের শীঘ্র চুল পাকিয়া ও মাথায় টাকা পড়িয়া যায়। ইনি বলেন, রঙ্গিন মোজার ব্যবহারও অনেক সময়ে অপকারী। মোজা প্রভৃতিতে যে সকল রং ব্যবহৃত হয় উহার সহিত অনেক সময়ে বিষাক্ত দ্রব্য মিশ্রিত থাকায় পায়ের ঘর্ম্মের সহিত মিশিয়া ঐ বিষ শরীরে প্রবেশ করিয়া শরীরের অপকার সাধন করিতে পারে। লাল ও বেগুনি রঙ্গের মোজাই নাকি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অপকারী। তাঁহার মতে ঢিলা ও ছোট কলার এবং সাদা রঙ্গের মোজা ব্যবহারই শ্রেয়ঃ।

ডাক্তার ডবলিউ বি পার্সনস্ বলেন, খাদ্যের সহিত লবণ ব্যবহারের ফলে অধুনা মানবসমাজে অনেক রকমের পীড়া দেখা দিয়াছে। আহারের কালে অধিক পরিমাণে লবণ ব্যবহারের ফলে স্মৃতিশক্তির হ্রাস হয় অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

"প্রাণো বা অমৃতম্ ।" (শ্রুতিঃ)

আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ।

(স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন ও চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র)

"আয়ুঃকাময়মানেন ধর্ম্মার্থ সুখসাধনম্।
আয়ুর্ব্বেদোপদেশেষু বিধেয়ঃ পরমাদরঃ॥ বাগ্‌ভট।

৩য় বর্ষ } অগ্রহায়ণ ১৩২২ } ৭ম সংখ্যা।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

আশা ও আনন্দের কথা।

পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, পুনার আয়ুর্ব্বেদিক হাসপাতালটি বোম্বাই গভর্ণমেণ্টের আদেশ ক্রমে ডাক্তারী রেজিষ্ট্রেশন নিয়মের বহির্ভূত হওয়ায় [illegible] আগষ্ট হইতে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এজন্য নানা স্থানের আয়ুর্ব্বেদ [illegible] সভা বিশেষতঃ নিখিল ভারতবর্ষীয় আয়ুর্ব্বেদ মহামণ্ডল হইতে বিশেষ আন্দোলন ও ইহা রক্ষার নিমিত্ত সুযুক্তিপূর্ণ বহু আবেদন ও টেলিগ্রাম প্রভৃতি প্রেরণ [illegible]য়াছিল। এখন আমরা আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, [illegible] সকল আন্দোলন সফল হইয়াছে, বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট আদেশ প্রত্যাহার করিয়াছেন— ফলে হাসপাতালটি পূর্ব্বমত [illegible] দুস্থ রোগীদের উপকার সাধন করিতে থাকিবে। বহু লোক ইহা দ্বারা উপকৃত হইয়া আসিতেছে। [illegible] বৈদ্যক সভাসমূহের আন্দোলনে কর্ণপাত করিয়া যথেষ্ট সুবিবেচনা [illegible] করিয়াছেন। এজন্য আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কৃতজ্ঞতা ও শত শত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। গ[illegible] ধন্যবাদ প্রদানের জন্য প্রয়াগের "আয়ুর্ব্বেদ-মহামণ্ডল", [illegible]রের [illegible] [illegible]দাবাদের "বৈদ্যসভা", বোম্বাই "বৈদ্যসভা", প্রভৃতি প্রধান ২ বৈ[illegible] [illegible] করিয়া ধন্যবাদ সূচক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। পু[illegible] [illegible] সংবাদ বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। আয়ু-র্ব্বে[illegible] [illegible] হৃদয়ে এই আশা ক্রমশঃ দৃঢ়তর হইতেছে যে, আয়ুর্ব্বেদের

রক্ষা ও উন্নতির জন্য উপযুক্ত আন্দোলন করিলে যথেষ্ট সুফল ফলিবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিহার গভর্ণমেণ্টের আয়ুর্ব্বেদ পরীক্ষার ব্যবস্থার কথা বলা যায়।

পশ্চিম প্রান্তীয় আয়ুর্ব্বেদ ভক্তগণ আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে বিবিধ কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, আজ আমরা তাঁহাদের সফলতার আভাস পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছি। বাঙ্গালী আমরা আয়ুর্ব্বেদের উন্নতির জন্য এ পর্য্যন্ত কি করিয়াছি? বাঙ্গালীর হৃদয়ে আশা ও উৎসাহ জাগিয়া উঠুক, তাহারাও যেন কিছু ২ করিয়া আয়ুর্ব্বেদের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার সহায় হইতে পারেন।

মান্দ্রাজ সপ্তম বৈদ্য মহাসম্মেলন।

এবার মান্দ্রাজ সহরে সপ্তম বৈদ্য মহাসম্মেলনের অধিবেশন হইবে। তজ্জন্য বিপুল আয়োজন ও উৎসাহ দেখা যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা হইতেছে। প্রদর্শনীর বিবরণ স্থানান্তরে প্রদত্ত হইল। সভায় পঠিত হওয়ার জন্য অত্যাবশ্যকীয় কতিপয় বিষয় নির্দ্দেশ করিয়া প্রত্যেক টীর জন্য স্বর্ণপদক দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহারও বিবরণ পাঠক অন্যস্তম্ভে দেখিতে পাইবেন। আমরা বাঙ্গালী বৈদ্য ও আয়ুর্ব্বেদ প্রেমিগণকে এদেশ হইতে বিবিধ প্রদর্শনীয় দ্রব্য ও প্রবন্ধ প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিতেছি। বিগত বর্ষের কলিকাতার সম্মেলনে পশ্চিম দেশীয় ভ্রাতৃগণ কত দূর দূরান্তর হইতে উপস্থিত ও কত অসংখ্য দুর্ল্লভ দ্রব্যাদি প্রেরণ করিয়া সম্মেলনের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যক্ষদর্শীর অবিদিত নাই।

মান্দ্রাজ সম্মেলন ও প্রদর্শনী যে এ বৎসর বিশেষ সফলতা প্রদর্শন করিবে, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। যিনি সম্মেলনের অধ্যক্ষ, যিনি কলিকাতা সম্মেলনে উপস্থিত হইয়া সম্মেলনকে আমন্ত্রণ করিয়া যান সেই অশেষ কার্য্যদর্শী জ্বলন্ত প্রতিভা পণ্ডিত ডিঃ গোপালা চালুকে আমরা বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে গুণের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়া "বৈদ্যরত্ন" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। ইনি পরম নিষ্ঠাবান চির ব্রহ্মচারী। বহুলোককে বিদ্যা দান করিয়া আসিতেছেন। কলিকাতায়ও ইহার বহু শিষ্য আগমন করিয়া বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়াছেন। ইঁহারই উদ্যোগ এবং যথেষ্ট অর্থানুকূল্যে মান্দ্রাজ আয়ুর্ব্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই কলেজের জন্য বহু অর্থ সাহায্য দিয়া অদম্য উৎসাহে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। ইনি সেই কলেজের

অধ্যক্ষ বা প্রিন্সিপাল। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি এই সম্মেলন নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হউক।

আগামী ১৮ই ১৯শে ২০শে ডিসেম্বর (বাং ২রা ৩রা ৪ঠা পৌষ) দিবসত্রয় মান্দ্রাজের ভিক্টোরিয়া পাবলিক হলে উক্ত সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। ১৬ই ডিসেম্বর প্রদর্শনীর দ্বার খোলা হইবে এবং ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত খোলা থাকিবে। প্রদর্শনীর জন্য আয়ুর্ব্বেদকলেজসৌধে স্থান নির্ব্বাচিত হইয়াছে।

স্বাস্থ্য-তত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

যদি শারীরিক বল অক্ষুণ্ণ থাকে—কোষ্ঠ প্রভাহ পরিষ্কার হয়, প্রস্রাব সরল থাকে, নিয়মিত ক্ষুধার উদ্রেক হয় তবে আর ভাবনা কিসের? ঐ সকলের ব্যতিক্রম হয় বলিয়াই তো রোগের সৃষ্টি! জরা যখন আসিবে, শমন যখন শিয়রে দাঁড়াইবে তখন তো মৃত্যু সুনিশ্চিত—কিন্তু পরমায়ু থাকিতেও অনেকে নিজের আহার বিহারের দোষে মারা যায় তাহার কি কোনও প্রতিবিধান নাই? আছে বৈ কি! ঈশ্বর চিন্তা, ব্রহ্মচর্য্য সাধন, সাধু সঙ্গলাভ, প্রাকৃতিক বিধিবিধান মানিয়া চলা, এই সকলই দীর্ঘজীবী হইবার উপায়। শারীরিক বল অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে মধ্যে ২ রসায়ন ও বাজীকরণাদির ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য। ঋতু হরিতকী ভক্ষণ, নিশাজল পানও অন্যতম কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য। কিন্তু হায়, সংসার সংগ্রামক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে ২ শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখা অনেকেরই ঘটিয়া উঠে না। ইচ্ছা থাকিলে সকলই হয় কিন্তু সে ইচ্ছাই বা লোকের মনে উদিত হয় কই? প্রকৃতি দেবী দয়া করিয়া যতদিন বাঁচাইয়া রাখেন রাখুন তৎপরে তাঁহার কোলে মাথা রাখিয়া অঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইব—অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা ঘটিবেই ইহা ভাবিয়াও অনেকে নিশ্চেষ্ট থাকেন। সুদীর্ঘ কাল সুস্থ দেহে জীবিত থাকিবার ইচ্ছা বলবতী হইলে তদ্রূপ উদ্যোগ আয়োজন চাই। দেহের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না রাখিলে কোন সময় আমাদের অজ্ঞাত কোন্ পীড়া উৎপন্ন হইবে তাহাও বলা যায় না। রোগ উৎপন্ন হইবামাত্র তৎপ্রতিবিধানে মনো-

যোগী না হইলে "পরিণামে পরিতাপ অবশ্যই ঘটে।" শোথ রোগী যদি প্রত্যহ কাঁচা তেঁতুলের অম্বল খায়, বহুমূত্র রোগী যদি ক্রমাগত অধিক পরিমাণে জল পান করে—নিষেধ বিধি মানিয়া না চলে, তবে তাহাদের বাঁচিবার আশা কোথায় ? হিমাঙ্গ অবস্থায় সকল ক্ষেত্রেই যদি মৃগনাভি ঘটিত ঔষধে ফল হইত তাহা হইলে এতকাল শমনরাজের সিংহদরজা বন্ধ হইয়া যাইত। তাই বলি ভাই——

যেমন হবে রোগ—অমনি মুষ্টিযোগ।
ফল না যদি পাও—বৈদ্যের কাছে যাও ॥
ডাক্‌বে ভগবানে—নিত্য প্রাণপণে।
ক্ষুধা পেলেই খাবে—কুপথে না যাবে ॥
ব্যথা কারো প্রাণে—দিও নাকো জ্ঞানে।
সদাই কবে মিষ্ট—সাধন হবে ইষ্ট ॥
ছাড়্‌বে শমন ভয়—হবে মরণ জয়।
ভগবানে মতি—পরকালের গতি ॥

এই নশ্বর ক্ষণভঙ্গুর জীবনে—এ বিশ্ব সংসারে সৃষ্টি রহস্য—মূঢ় মানব আমরা কি বুঝিব ? চিরদিন আমরা এজগতে থাকিতে আসি নাই তাহা সত্য—তথাপি এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় যে, যাবৎ দেহে জীবন বিদ্যমান থাকিবে তাবৎ দেহখানিকে সুদৃঢ়, কর্ম্মঠ, স্বাস্থ্যপূর্ণ রাখিতে আমরা প্রকৃতির নিকট দায়ী। অন্য কথা বারান্তরে বলিব।

শ্রীআশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায়—ঢাকা।

নিখিল ভারতবর্ষীয় বৈদ্যসম্মেলন ও আয়ুর্ব্বেদীয় প্রদর্শনী, মান্দ্রাজ।

১৯১৫ সন।

সপ্তম নিখিল ভারতবর্ষীয় বৈদ্য মহা সম্মেলনের স্বাগতকারিণী সভা নিম্নলিখিত আয়ুর্ব্বেদীয় বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইবার নিমিত্ত প্রবীণ বৈদ্য এবং আয়ুর্ব্বেদজ্ঞগণকে অনুরোধ জানাইতেছেন।

প্রবন্ধ নিম্নলিখিত যে কোন ভাষায় লিখিতে হইবে, যথা—ইংরাজী, তামিল, তেলেগু, কানাড়ী, মালযম্, হিন্দী এবং সংস্কৃত।

(ক) প্রত্যেক প্রবন্ধ "ফুল্‌স্কপ" কাগজের ৪০ পৃষ্ঠার অধিক এবং প্রতি পৃষ্ঠায় ৩০ পঙ্‌তির অধিক না হয়।

(খ) বিশুদ্ধ পরিষ্কার অক্ষরে কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখা থাকিবে।

(গ) প্রবন্ধ (১লা ডিসেম্বর ১৯১৫) তারিখের মধ্যে রেজিষ্টী দ্বারা স্বাগত কারিণী সভার মন্ত্রীর (*No. 12, Thambu Chatty Street, Madras.*) নিকট পৌছান আবশ্যক।

(ঘ) প্রবন্ধ বিচারের নিমিত্ত স্বতন্ত্র এক কমিটি থাকিবে। সেই কমিটির নিকট সমুদয় প্রবন্ধ উপস্থিত করা যাইবে। কমিটি যে সকল প্রবন্ধকে সর্ব্বোত্তম বিবেচনা করিবেন তাহাদিগকে স্বর্ণপদক প্রদত্ত হইবে।

প্রবন্ধ নিম্নলিখিত বিষয় অবলম্বনে লিখিতে হইবে।

(১) ত্রিদোষ ও পঞ্চকর্ম্মের সম্বন্ধ নির্ণয়। স্বর্ণপদক—দাতা ডিঃ, গোপালা চার্ল্যু।

(২) আয়ুর্ব্বেদ মতানুসারে নাড়ী পরীক্ষার আবশ্যকতা। স্বর্ণপদক—দাতা আয়ুর্ব্বেদ বিদ্বান মাইশোর পেলেস্ ফিজিসিয়ান টিঃ কৃষ্ণ শাস্ত্রী গারু।

৩। বহুমূত্র রোগের নিদান, চিকিৎসা ও প্রতিষেধক উপায়। উক্তরোগে যে পৃষ্ঠাঘাত (*Carbuncle*) হয় উহার আয়ুর্ব্বেদ মত বিশেষ চিকিৎসা যাহাতে শস্ত্র প্রয়োগের আবশ্যকতা না হয় এবং উক্ত প্রকার চিকিৎসায় আরোগ্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন। সুবর্ণপদক—দাতা আয়ুর্ব্বেদ-ভূষণ আত্মাকুর পেলেস ফিজিসিয়ান ডিঃ রামচন্দ্র চার্ল্যু।

৪। স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন ও শারীরিক শক্তি রক্ষা এবং আয়ুর্ব্বেদ মতানুসারে উহার বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয়তা। স্বর্ণপদক—দাতা—এম্ আর, আর বৈদ্যম্ ও, কে, রমা কুরুণ গারু।

৫। "থাইসিস্" ও টাইফয়েড ফিবারের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নিদানের সম্বন্ধ নির্ণয় এবং বিভিন্নতার বিস্তৃত বিবরণ। স্বর্ণপদক,—দাতা—আয়ুর্ব্বেদ-ভূষণ এম, রাম শাস্ত্রী গারু।

৬। আয়ুর্ব্বেদ মতে শল্য চিকিৎসা পুনঃ কোন্ পদ্ধতিতে আরম্ভ করা যাইতে পারে। (স্বর্ণপদক, দাতা—অথণ্ডুর্ শ্রীরাম শাস্ত্রী গারু।)

৭। প্রাগৈতিহাসিক যকৃৎ বৃদ্ধির লক্ষণ, প্রতিবন্ধক ও রোগনাশক উপায়। (স্বর্ণপদক, দাতা—পণ্ডিত টিঃ, কে, শ্রীনিবাস চার্য্যর।)

৮। দক্ষিণ ভারতবর্ষের সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যার ইতিহাস, আদিলিখিত পুস্তক, সূত্রগ্রন্থ যাহা আজ কাল প্রাপ্ত হওয়া যায়, উহার নূতন রোগ ও নূতন প্রকার চিকিৎসাক্রমের বিবরণ। স্বর্ণপদক, দাতা—বাভিল্লা বেঙ্কটেশ্বর শাস্ত্রী গারু।

৯। তেলেগু আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রারম্ভিক ইতিহাস এবং নূতন ঔষধসমূহ যাহা সাধারণে ব্যবহৃত হইতেছে তাহার বিবরণ। (স্বর্ণপদক, দাতা আন্ধ্র সাহিত্য পরিষদ।)

১০। তামিল আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা শাস্ত্র ও তাহার পূর্ব্বতন ইতিহাস, নূতন পুস্তক ও নূতন ২ ব্যবহৃত ঔষধের বিবরণ। স্বর্ণপদক, দাতা—তামিল একাডেমী।

প্রদর্শনী সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী।

১। আগামী ১৬ই ডিসেম্বর (১৯১৫) প্রদর্শনীর দ্বার খোলা হইবে এবং ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত খোলা থাকিবে।

২। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা প্রণালীর প্রতি সর্ব্বসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ,ইহার বিস্তার ও প্রভাব বৃদ্ধির নিমিত্তই এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছে।

৩। এই প্রদর্শনীতে ছোট ২ লতা গুল্ম, গাছ গাছড়া, ধাতু, উপধাতু, রস উপরস, শাস্ত্রীয় ঔষধ, শল্যতন্ত্র, শারীর চিত্রাদি, প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদীয় পুস্তক এবং আয়ুর্ব্বেদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত অন্যান্য বস্তুজাত রক্ষিত হইবে।

(ক) প্রাচীন পুস্তক ও দুষ্প্রাপ্য লিখিত ও মুদ্রিত গ্রন্থসমূহ।

(খ) ছোট ২ লতা গুল্ম, কাঁচা ও শুষ্ক গাছ গাছড়া, ফল, ফুল, পত্র, বীজ, নির্য্যাস, ত্বক, মূল প্রভৃতি।

(গ) ধাতু, উপধাতু যাহা রোগোপশমন ও ঔষধ প্রস্তুতার্থে ব্যবহৃত হয়।

(ঘ) জান্তব ঔষধি :—কস্তুরী, গোরোচনা, পুন্নাগ, পিত্তপঞ্চক, মধু, মোম ইত্যাদি।

(ঙ) শাস্ত্রীয় ঔষধি :—আসব, আরিষ্ট, অবলেহ, তৈল, ঘৃত, আবর্ত্তিত তৈল আবর্ত্তিত ঘৃত, মোদক, চূর্ণ, রসক্রিয়া ইত্যাদি।

(চ) ভস্ম, সিন্দূর, বদ্ধকজ্জ্বার (পারদবদ্ধ ইত্যাদি) কুপিমাত্রা (পূর্ণচন্দ্রোদয় রস ইত্যাদি) কজ্জল, রস প্রভৃতি

(ছ) সূক্ষ্ম, স্থূল শারীরিক পদার্থ, নরকঙ্কাল এবং তৎসম্বন্ধে চিত্রাদি।

(জ) প্রাচীন তাম্রফলক, খোদিত প্রস্তর ও প্রাচীন লিখিত তালপত্রের গ্রন্থাদি।

মন্তব্য :—কোন "প্যাটেণ্ট" ঔষধ গৃহীত হইবে না।

৪। স্ফোটনশীল কোন পদার্থ যাহা রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা সুরক্ষিত না হইবে এমন দ্রব্যাদি গৃহীত হইবে না।

৫। প্রদর্শনী বিষয়ক সমুদয় বন্দোবস্ত প্রদর্শনীর সব কমিটি করিবেন। প্রদর্শনীর সমুদয় দ্রব্যাদি তাহাদের কর্তৃত্বাধীনে থাকিবে।

৬। প্রদর্শনীর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রদর্শকদিগকে রীতিমত রসিদ দিয়া দ্রব্য গ্রহণ করিবেন। প্রদর্শনী শেষ হইয়া গেলে ঐ রসিদ দেখাইয়া সকলেই নিজ নিজ দ্রব্য ফিরাইয়া লইতে পারিবেন।

৭। ভিন্ন ২ শ্রেণীর দ্রব্যের জন্য ভিন্ন ২ স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

৮। দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ব্বোধ্য দ্রব্যাদির বিস্তৃত বিবরণ দ্রব্যের সঙ্গে লিখিয়া পাঠাইবেন।

৯। প্রদর্শনীর কোন দ্রব্যাদি পথিমধ্যে বিকৃত বা নষ্ট হইয়া গেলে কমিটি তজ্জন্য দায়ী নহেন।

১০। প্রদর্শনী খুলিবার ১৫ দিন পূর্ব্বে সমুদয় দ্রব্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট পৌছান আবশ্যক। প্রত্যেক প্রদর্শক নিজের নাম ঠিকানা, দ্রব্যের বিবররণ বিক্রেয় হইলে উহার মূল্য ইত্যাদি দ্রব্যের লেবেলের উপর স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিবেন।

১১। কোন প্রদর্শক বিনা কারণে স্বেচ্ছা প্রযুক্ত কোন দ্রব্য প্রদর্শনীতে রাখিলে কমিটি উহা আটক রাখিতে পারিবেন।

১২। প্রদর্শক সম্বন্ধে যে সব নিয়ম আছে ও করা হইবে সে সব নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে।

১৩। যে পর্য্যন্ত দ্রব্য রক্ষিত হইবে সে পর্য্যন্ত প্রদর্শক অথবা তাহার নিজের লোক প্রদর্শনী ক্ষেত্রে থাকিতে পারিবেন।

১৪। প্রত্যেক প্রদর্শককে পূর্ব্বেই ১৲ এক টাকা চাঁদা প্রেরণ করিতে হইবে।

১৫। প্যাকিং, পোষ্টাফিস, রেলওয়ে বা গাড়ীভাড়া প্রভৃতি ও দ্রব্য সমধিক সুরক্ষিত ভাবে রাখিতে হইলে যে সব খরচ দরকার হইবে তৎসমুদয়ই প্রদর্শককে দিতে হইবে।

১৬। যে সমস্ত দ্রব্য শীঘ্র নষ্ট হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা যেমন ফুল পত্র ইত্যাদি সে সমুদয় বস্তু প্রদর্শনী খুলিবার একদিন পূর্ব্বে পৌছাইলেই হইবে।

১৭। স্বর্ণ রৌপ্য অথবা তাম্র (ব্রোঞ্জ) পদক, সার্টিফিকেট প্রভৃতি দ্রব্য বিচারের পর কমিটি যাহাকে যোগ্য মনে করিয়া মত প্রকাশ করিবেন, তাহাকেই দেওয়া যাইবে।

১৮। প্রদর্শনী সমাপ্ত হওয়ার তিন দিবস মধ্যে প্রদর্শক নিজ ২ দ্রব্য অপসারিত করিবেন, নতুবা সেই বিষয়ে কমিটি যে বিচার করেন তদনুযায়ী কার্য্য হইবে।

১৯। প্রদর্শনীতে কোন ২ সময় বিশেষ বিষয় অবলম্বনে ব্যাখান হইবে।

২০। প্রধান দ্রব্যরক্ষক প্রদর্শনীক্ষেত্রে আপন ভৃত্যকে সঙ্গে রাখিতে পারিবেন।

২১। প্রদর্শনীয় কোন বস্তুর ফটো সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বিনা অনুমতিতে গ্রহণ করিতে পারিবে না। যদি কেহ ফটো লইতে ইচ্ছা করেন তবে তিনি পূর্ব্বে এজন্য আবেদন করিয়া রাখিবেন।

২২। প্রত্যেক প্রদর্শক অথবা তাহার নিজের এক ব্যক্তি মাত্র একখানা "পাশ" পাইবেন যদ্দারা প্রদর্শনীতে যাতায়াত করা যাইবে।

২৩। প্রদর্শনীতে দ্রব্য রাখিবার স্থান বিনামূল্যে দেওয়া যাইবে কিন্তু দ্রব্যসকল কমিটির নির্দ্দেশ মত রক্ষা করিতে হইবে।

২৪। প্রদর্শনীতে দ্রব্যসকল বিক্রয় করিতেও দেওয়া হইবে কিন্তু সেই সকল দ্রব্য প্রদর্শনী শেষ না হইতে সরাইয়া লইতে পারিবেন না। বিক্রেয় দ্রব্য সকলের শতকরা ৩৲ তিন টাকা বা টাকা প্রতি অর্দ্ধ আনা কমিটিকে দিতে হইবে।

২৫। প্রদর্শনীর সমুদয় দ্রব্যের সূচী (ক্যাটালগ) টিকেট আফিসে চারি আনা মূল্যে পাওয়া যাইবে।

২৬। প্রদর্শনী দেখিবার জন্য প্রথম তিন দিন প্রত্যেকের প্রতিদিনের জন্য দুই আনা করিয়া দিতে হইবে, অন্যান্য দিন এক আনা করিয়া দিতে হইবে।

২৭। চিঠি পত্রাদি "সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, প্রদর্শনী মান্দ্রাজ, আয়ুর্ব্বেদিক কলেজ বিল্ডিংস্ ১২নং পম্মু চট্টি ষ্ট্রিট, মান্দ্রাজ" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মন্তব্য :—পত্রাদি ব্যবহার করিতে ইহা বেশ স্মরণ রাখিবেন যে,—ঠিকানা ইংরাজীতে লিখিতে হইবে।

প্রবন্ধ বা তৎসম্বন্ধে পত্রাদি প্রেরণ করিবার ঠিকানা :—"আয়ুর্ব্বেদ মার্ত্তণ্ড, বৈদ্যরত্ন পণ্ডিত ডিঃ গোপালা চার্লু, জর্জ্জ টাউন—মান্দ্রাজ।"

আয়ুর্ব্বেদ মহামণ্ডল,
প্রধান কার্য্যালয় প্রয়াগ,
এলাহাবাদ।

শ্রীজগন্নাথ প্রসাদ শুক্ল
মন্ত্রী।

মাংস।

আজ আমরা মাংস বিষয়ে ২।৪ কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছি। দেশ বিশেষে মাংস গুণের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। স্থূলতঃ দেশ চতুর্বিধ,অনূপ,জাঙ্গল, ধন্ব ও সাধারণ। বারিবহুল (ঝিল যুক্ত) স্থানের নাম অনূপ, যেস্থানে অল্পজল ও অল্পবৃক্ষ সেই দেশের নাম জাঙ্গল। অনূপ দেশ কফবাত বর্দ্ধক; সুতরাং তদ্দেশীয় লোকের শ্লীপদ গলগণ্ডাদি কফবাতজ রোগের বাহুল্য দেখা যায়। জাঙ্গল দেশে বাতপিত্ত ও রক্তের প্রকোপ হয়, অনূপ ও জাঙ্গল এই উভয় দেশের লক্ষণ যুক্ত দেশের নাম সাধারণ দেশ। সাধারণ দেশে শীত উষ্ণ বর্ষা বায়ু মাধ্যমিক রূপে সমান ভাবে থাকে,এজন্য সে দেশে দোষও সমভাবে থাকে।* মরু দেশের নাম ধন্ব। মাংস আনূপ ও জাঙ্গল ভেদে দ্বিবিধ, তন্মধ্যে জাঙ্গল অষ্ট প্রকার। যথা—জঙ্ঘাল, বিলস্থ, গুহাশয়, পর্ণমৃগ, বিষ্কির, প্রতুদ, প্রসহ ও গ্রাম্য।

জাঙ্গল মাংস পুষ্টিকর বলবর্দ্ধক, শুক্র বর্দ্ধক, জঠরাগ্নির উদ্দীপক, বিশেষতঃ মূকতা, মিন্মিনত্ব বাধির্য্য, বমি, প্রমেহ, শ্লীপদ গলগণ্ডে উপকারী। জঙ্ঘালাদি অষ্টবিধ জাঙ্গল মাংস মধ্যে যাহাদের জঙ্ঘা লম্বা তাহারা জঙ্ঘাল। দ্বিবিধ হরিণ জাতি জঙ্ঘাল, তন্মধ্যে যাহাদের তাম্রবর্ণ তাহাদের নাম হরিণ। যাহারা কৃষ্ণবর্ণ তাহাদের নাম এণ (কৃষ্ণসার) তাম্রবর্ণ বৃহদাকৃতি হরিণ কুরঙ্গ। নীলবর্ণ হরিণ ঋষ্য। যাহার আকৃতি ক্ষুদ্র এবং যাহার গাত্রে বিন্দু বিন্দু চিহ্ন আছে তাহার নাম পৃষত। যাহার বিশাণে বহু শাখা প্রশাখা আছে, তাহার নাম ন্যঙ্কু। গবয়াকৃতি হরিণের নাম শম্বর, যে মৃগের শরীরে রেখা আছে তাহার নাম রাজীব, শৃঙ্গহীন মৃগের নাম মুণ্ডী।

এই সকল জঙ্ঘালের মাংস লঘুপাক, পিত্তশ্লেষ্ম নাশক ও কিঞ্চিৎ রূক্ষ।

---

* ভবেদ্বহূদকোঽনূপঃ কফমারুত রোগকৃৎ।
জাঙ্গলোঽল্পাম্বু শাখীচ পিত্তাসৃঙ্ মারুতোত্তরঃ॥
সংসৃষ্ট লক্ষণো যস্ত দেশঃ সাধারণো মতঃ।
সমাঃ সাধারণে যস্মাৎ শীত বর্ষোষ্ণ মারুতাঃ॥
সমতা তেন দোষাণাং তস্মাৎ সাধারণো মতঃ।

গোধা, শশ, ইন্দুর, শজারু প্রভৃতি বিলেশয় অর্থাৎ গর্ত্তশায়ী। বিলেশয়ের মাংস দেহ-পোষক, উষ্ণবীর্য্য, বাত নাশক, কিন্তু মলমূত্র রোধক। সিংহ ব্যাঘ্র বৃক ভল্লুক প্রভৃতি গুহাশয়, ইহাদের মাংস অতীব বলকর, বাতনাশক, উষ্ণবীর্য্য ও নেত্র রোগের উপকারী। বানর, বিড়াল, কাঠবিড়াল, প্রভৃতি পর্ণমৃগ; ইহাদের মাংস কাস শ্বাস ও শোষ রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী।

চঞ্চুদ্বারা আহার্য্য বস্তু ইতস্ততঃ বিক্ষেপ করিয়া যাহারা ভোজন করে তাহাদের নাম বিষ্কির। বিষ্কির মাংস লঘুপাক ও ত্রিদোষ নাশক।

কীটাদিকে চঞ্চুদ্বারা প্রহার করিয়া মারিয়া যাহারা ভক্ষণ করে তাহাদের নাম প্রতুদ। প্রতুদ মাংস পিত্তকফ নাশক ও লঘুপাক। হঠাৎ যাহারা আক্রমণ করিয়া ভক্ষণ করে, তাহারা প্রসহ। গৃধ্র, চিল, কুরর, প্রভৃতি প্রসহ। প্রসহের মাংস ভক্ষণ করিলে ভস্মক রোগ, ক্ষয়, কাস, উন্মদরোগ, শুক্রক্ষীণতাদি উপস্থিত হয়।

মৎস্য ভেক কূর্ম্ম শম্বুক প্রভৃতি আনূপ। আনূপ মাংস স্নিগ্ধ, গুরুপাক, অগ্নিমান্দ্যকর, কফকারক, পিচ্ছিল, পুষ্টিকর, বাতনাশক, তমোগুণ বর্দ্ধক ও অভিষ্যন্দি গুণযুক্ত, সুতরাং আমবাতে অনিষ্টকর। দ্রব্যগুণে উক্ত হইয়াছে 'কূর্ম্মো বাতহরঃ' এবং কূর্ম্ম মাংস দ্বারা বাতরোগে স্বেদের ব্যবহার আছে বটে কিন্তু উহা নিরাম বাতে প্রযোজ্য, সামবাতে নহে, সামবাতে বালুকাদি দ্বারা রূক্ষ স্বেদই বিহিত, স্নিগ্ধ স্বেদ নহে।

ছাগ মেষ অশ্ব বৃষাদি গ্রাম্য, গ্রাম্য মাংস মধ্যে ছাগ মাংস উৎকৃষ্ট, উহা ক্ষয় শোষ শ্বাস কাস পীনস রোগে বিশেষ উপকারী।

সর্ব্ববিধ মাংসই চরাদি (বিচরণ স্থান ও অবস্থাদি) ভেদে বিভিন্ন গুণ অবলম্বন করিয়া থাকে। যথা——

"চরঃ শরীরাবয়বঃ স্বভাবো ধাতবঃ ক্রিয়াঃ।
লিঙ্গং প্রমাণং সংস্কারো মাত্রা চাস্মিন পরীক্ষ্যতে" ॥

আহারের নিমিত্ত চরাদি বিভাগ করিয়া মাংসের গুরুত্ব লঘুত্ব পরীক্ষা করিবে। এক জাতীয় মাংসেই চরাদি ভেদে গুণ ভেদ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। চরধাতুর অর্থ গমন এবং ভক্ষণ। জন্তু যে দেশে বিচরণ করে সেই স্থানের নাম চর। যাহার মাংস ব্যবহার্য্য সে কিরূপ স্থানে বিচরণ করে—মরুভূমে,

অনূপে, সাধারণ দেশে, জলে কিংবা আকাশে, সেই সেই স্থানানুযায়ী মাংসের গুণভেদ হইয়া থাকে। অথবা যাহার মাংস ব্যবহার্য্য সে কিরূপ বস্তু ভক্ষণ করে ; যেমন গুরু লঘু রূক্ষ স্নিগ্ধ উষ্ণ কি শীতল তাহাতেও মাংসের গুণ-ভেদ জন্মিয়া থাকে। এবিষয়ে কয়েকটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে।

১। যে সকল জন্তু জলজ কিংবা জলচর অথবা অনূপ দেশে জাত কিংবা অনূপ দেশে বিচরণ করে তাহাদের মাংস গুরুপাক। যাহারা ধন্বদেশে কিংবা সাধারণ দেশে বিচরণ করে এবং যে সকল পক্ষী আকাশ-বিহারী তাহাদের মাংস লঘুপাক, এবং যাহারা লঘু বস্তু ভক্ষণ করে তাহাদের মাংস লঘুপাক, গুরু দ্রব্য ভোজী জন্তুর মাংস গুরুপাক।

২। শরীরাবয়ব বিশেষেও মাংস গুরুপাক বা লঘুপাক হয়,যেমন আকাশ-চারী পক্ষীর মাংস লঘুপাক হইলেও তাহাদের বক্ষের ও গ্রীবার মাংস অত্যন্ত গুরুপাক। এরূপ সকল জন্তুরই সক্থি বা উরুর মাংস লঘুপাক,স্কন্ধ,শির, পদ ও ক্রোড়ের মাংস গুরুপাক।

৩। স্বভাবতঃ কোন কোন মাংস লঘুপাক ও গুরুপাক। যথা—লাব, কপিঞ্জল,হরিণাদির মাংস লঘুপাক এবং গো মহিষাদির মাংস গুরুপাক।

৪। শরীরের রক্তমাংসাদি ধাতুগুলি উত্তরোত্তর গুরু। যথা—রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদঃ,মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা এবং মজ্জা হইতে শুক্র গুরুপাক।

৫। শারীরিক চেষ্টাও নিশ্চেষ্টতা বশতঃ মাংসের গুরুত্ব লঘুত্ব সম্পাদিত হইয়া থাকে। যে জন্তু স্বভাবতঃ ক্রিয়াশীল ধাবন, বিচরণ, কূর্দ্দনাদি ক্রিয়া যাহাদের সর্ব্বদা অভ্যস্ত তাহাদের মাংস লঘুপাক, যাহারা অলস তাহাদের মাংস গুরুপাক।

৬। স্ত্রী-পুং-নপুংসক জাতিভেদে মাংসের গুরুলঘুতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদ বলেন একজাতি মধ্যেই পুরুষদিগের মাংস গুরুপাক এবং স্ত্রীদিগের লঘুপাক। হারীত বলেন—

"চতুষ্পাদেষু লঘ্বী স্ত্রী বিহগেষু লঘুঃ পুমান্।"

চতুষ্পাদ জন্তু মধ্যে স্ত্রীজাতি লঘুগুণ বিশিষ্ট এবং বিহঙ্গ জাতির মধ্যে পুরুষ লঘু। পরাশর বলিয়াছেন—

চতুঃপাৎসু স্ত্রিয়োগ্রাহ্যাঃ পুমাংসো বিহগেষুচ।

চতুষ্পাদ জন্তু মধ্যে স্ত্রীজাতিকে এবং পক্ষি মধ্যে পুংজাতিকে গ্রহণ করিবে।

৭। প্রমাণ বিশেষে মাংসের গুরুত্ব লঘুত্ব হয়। এক জাতীয় জন্তুর মধ্যেই যাহাদের শরীর বৃহৎ তাহারা গুরুপাক, যাহাদের শরীর বৃহৎ নহে তাহারা লঘুপাক।

৮। সংস্কার বশতঃ গুরুপাক মাংসও লঘু হয় এবং লঘু মাংসও গুরুপাক হয়। লঘু মাংসও তৈলে সন্তলন করিয়া অধিক ঘৃত গরম মসল্লা দ্বারা পাক করিলে গুরুপাক হয়, অন্যথা লঘুপাক। ভর্জ্জিত মাংস অপেক্ষা ঘনযূষ লঘুপাক। ঘনযূষ অপেক্ষা স্বচ্ছ যূষ লঘুপাক এবং শূল্য (শলাকাগ্রত বিদ্ধ ও ভর্জ্জিত) মাংস গুরুপাক।

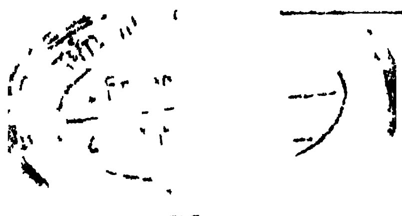
৯। মাত্রা বশতঃ সকল বস্তুই গুরুপাক লঘুপাক হয় সুতরাং মাংসের পক্ষেও তাই।

নিজের বয়স বল অগ্নি স্বাস্থ্য অপেক্ষায়ও মাংসের গুরুত্ব লঘুত্ব সম্পাদিত হইয়া থাকে। যৌবনে যে পরিমাণ মাংস পরিপাক পায় বাল্যে কি বার্দ্ধক্যে সেরূপ পরিপাক পায়না। সবলের যেরূপ পরিপাক হয় দুর্ব্বলের সেরূপ হয় না। যাহার স্বভাবতঃ অগ্নিপ্রবল তাহার গুরুপাক মাংসও সহজে পরিপাক হয়, মন্দাগ্নিযুক্ত ব্যক্তির লঘুপাক মাংসও সহজে পরিপাক হয় না।

সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় পীড়িত ব্যক্তির পরিপাক শক্তি থাকেনা। অতএব জাতি অবয়বও বিচরণ স্থানাদি সমস্ত বিচার করিয়া মাংস ব্যবহার করিবে। ইতি—

শ্রীগিরিশ চন্দ্র সেন কবিরত্ন,

ময়মনসিংহ।



পল্লী-চিকিৎসক।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সু—আজ হিক্কা রোগের ঔষধ বল।

হ—কদলীমূলের রস মধুসহ পান করিলে হিক্কা দূর হয়।

ভাতের জল বা পান্তা ভাতের আমানী খাইলেও হিক্কা বিনষ্ট হয়।

এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল পান করিলেও হিক্কার বেগ ক্ষান্ত হয়।

মুড়ি ভিজান জল খাইলে হিক্কা সারে।

নাভির উপরে কাঁসার বাটী রাখিয়া তদুপরি ঠাণ্ডা জল ঢালিলে হিক্কা সারে।

অশ্বত্থ গাছের শুক্‌নো ছাল পোড়াইয়া জলে ডুবাইয়া ছাকিয়া উক্ত জল অল্প মাত্রায় খাওয়াইলে হিক্কা ও বমন নিবারিত হয়।

ময়ূরের পাখা ভস্ম করিয়া, /০ এক আনা পরিমাণ উক্ত ভস্ম মধুসহ খাইলে ভাল হয়।

অপরাজিতার পাতার রস চক্ষুতে দিলে হিক্কা সারে।

গোলমরিচ সূচতে বিদ্ধ করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করণানন্তর রোগীকে ঘ্রাণ প্রদান করিলে উক্ত রোগ প্রশমিত হয়।

হরিদ্রা চূর্ণ অগ্নিসংযোগে তামাকুর ন্যায় ধূম পান করিলে হিক্কা আরাম হয়।

হাঁসের পাখাওয়ালা নূতন বাচ্চা অথবা 'টোক' (ডিম্ব) চারি পাঁচ গণ্ডা গুলিলে পুষ্পনং যে রস পাওয়া যায়, উহা রোগীকে খাওয়াইলে প্রবল কঠিন হিক্কাও আরোগ্য হয়। এই ঔষধ ব্যবহার করাইলে আর হিক্কা উঠে না। কঠিন অবস্থাতে উহা উত্তম ফল প্রদান করিয়া থাকে।

তামাকের ন্যায় মাসকলাইর ধূম পান করিলে হিক্কা সারে।

কড়ি প্রমাণ লবণ অর্দ্ধ গ্লাস জলে গুলিয়া উক্ত লবণ জলের এক চুমুক পান করিলে হিক্কা থাকে না। যদি ইহাতে না থামে তবে কিয়ৎকাল পরে আর এক চুমুক পান করিতে হয়। এইরূপে আধ গ্লাস জল পান করিলে নিশ্চয়ই হিক্কা আর থাকিবে না। এমন সহজ অথচ অব্যর্থ ফলপ্রদ ঔষধ বড় দেখা যায় না। বহু লোক একমাত্র ইহার সাহায্যেই রোগমুক্ত হইয়াছে।

রোগীকে অন্য মনস্ক করিতে পারিলেই সাধারণ হিক্কা চলিয়া যায়।

সু—আর কত বলিবে ?

হ—এ প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করিলাম। এখন কি চান ?

সু—যাহা হয়, ২।১টা মন্ত্র তন্ত্রই বলিয়া যাও।

হ—আত্মরক্ষার্থ—"শরীরবন্ধ" বা "আত্মসারণ" মন্ত্রই কিছু বলিয়া আজকার পালা শেষ করিতে চাই। এই শুনুন :—

"মুকুন্দসিদনের নামটী লইয়া পথ দিয়া যায়।
সাপে না দংশিবে তারে, বাঘে-অঙ্গ না খায়॥"

তিনবার পাঠ করিয়া একটী গলা খেকুর (গলার শব্দ বিশেষ) দিয়া পা বাড়াইলে বিপদ ঘটে না।

"কাপড় পরিমাণ ভোট কাট,
জল লরে, স্থল লরে,——
আগে লরে শিব শঙ্কর, গৌরী লরে পাছে।
চারি কোণা পৃথিবী লরে, মোর ভোট কাছে॥
বাঘ ভালুকের চক্ষু বন্ধন, সাপের বন্ধন জিহ্বা,
উরশী পুরশী বন্ধন, মোর ভোট কাছে॥
রায় রাশের কোপ, বন্দুকের গুলি,
বাণ বৈরী না লাগে মোর গায় ;
আমার এই জ্ঞান লরে,—
ঈশ্বর মহাদেবের জটা ছিড়িয়া ভূমিতে পড়ে॥"

প্রত্যহ শয্যা ত্যাগ কালে ও শুইবার কালে উক্ত মন্ত্র তিনবার একমনে পাঠ করিতে হয় ও প্রত্যেকবার মন্ত্রশেষে স্বীয় শরীরে একটী ফুৎকার দিতে হয়। এরূপ করিলে বিঘ্ন দূর হয়।

হ—দাদা, আজ সকালে বিদায় পাইতে চাই।

সু—এখনই, এত সকালেই যাইতে চাও ?

হ—যদি অনুমতি পাই।

সু—তবে আরও একটী মন্ত্র বল, শেষে যাহা হয় কর।

হ—"আইচালি বান্ধি, কাইচালি বান্ধি, বন্দী করি ধান্দা।
এই আইচালে ষোল শত দান দূত বান্ধা।

আমার অঙ্গে কর ঘাও,——
ঈশ্বর মহাদেবের মাথা খাও ॥”

যাত্রাকালে পরিহিত বস্ত্রখানা উল্টাইয়া পড়িতে হয় অর্থাৎ কাছাকে কোচা ও কোচাকে কাছা করিয়া পরিতে হয়। এই কোচার কোণ (কোণা) মন্ত্র পড়িতে ২ মোচড়াইতে হয়। প্রতিবার মন্ত্র শেষেই ফু দিতে হয়, এইরূপে তিন বার করিতে হয়; শেষে ঐ কোনে একটী ‘গিট্’ দিয়া যাত্রা করিলে (বাটীর বাহির হইলে) কোনও আপদ বিপদের ভয় থাকে না।

এখন তবে আজ আসি।

সু—আচ্ছা।　　(ক্রমশঃ)

শ্রীগোপীনাথ দত্ত, শিক্ষক
দীঘিরপাড় পোঃ, রাজাবাড়ী, ঢাকা।

আহরণ—

—*ঃ*—

দীর্ঘজীবীর বিবরণ।

পাবনা জেলার অন্তর্গত রাইশীমূল গ্রামের শ্রীভোলানাথ হালদার বর্ত্তমান বর্ষের ১লা ভাদ্র ১২১ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াছে—‘স্বরাজে’র সংবাদদাতা শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী দাস মহাশয় এই রাইশীমূল গ্রামের অধিবাসী এবং ভোলানাথের নিকট প্রতিবেশী। তিনি ভোলানাথের জীবনী সম্বন্ধে যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, স্বরাজ হইতে তাহা সংগৃহীত হইল ঃ—

“পাবনা সহরের ১৫ মাইল পূর্ব্বে সুজানগর থানার অন্তর্গত রাইশীমূল গ্রামে ভোলানাথের নিবাস। ১২০১ সালের ভাদ্র মাসে ভোলানাথের ঐ গ্রামে জন্ম হয়। তাহার পিতামহ ১১২ বৎসর বয়সে এবং পিতা ৭২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। ভোলানাথ মৎস্যজীবী হালদার বংশীয়, দরিদ্র ঘরে জন্মগ্রহণ করে। এই জাতির মধ্যে বিবাহ বরাবরই বহু ব্যয়সাধ্য এবং সুবিধামত কন্যাও পাওয়া যায় না। এই সব কারণেই হউক বা সাংসারিক বা ব্যক্তিগত কোন কারণেই হউক ভোলানাথের বিবাহ একটু বেশী বয়সেই হইয়াছিল। অনুমান ৪০।৪২ বৎসর বয়সে ভোলানাথের বিবাহ হয়। ভোলানাথের এই

দীর্ঘজীবনের সঙ্গিনী সেই স্ত্রী এখনও জীবিতা আছে, তাহার বয়স ৯২ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। ভোলানাথের এক পুত্র এক কন্যার জন্ম হয়। পুত্র জীবিত নাই, কন্যা জীবিত আছে—তাহার বয়স অনুমান ৪০।৪২ বৎসর হইবেক। গত ভাদ্র মাসের ১লা তারিখে ভোলানাথ ১২১ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াছে। এখন তাহার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ,—জরার কোন লক্ষণই তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে নাই। শরীর—বলিষ্ঠ, মাংসপেশী দৃঢ় ও সবল। লোলচর্ম্ম, ভগ্নদন্ত, পলিত কেশ—বৃদ্ধের লক্ষণই এরূপ বয়সে ভোলানাথের শরীরে দৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু ভোলানাথ জরার এই স্বাভাবিক আক্রমণকে পরাজয় করিয়া যৌবনপ্রাপ্ত কর্ম্মিঠ পুরুষের ন্যায় বিরাজ করিতেছে। ভোলানাথকে দেখিবার জন্য বহু লোক দূর স্থান হইতে রাইনীমূলে গমন করিয়া থাকে। গত ১লা ভাদ্র—তাহার ১২১শ বৎসর বয়সে পদার্পণের দিন,—ভোলানাথ প্রাতে বিলের ধারে তাহার জামাতা যেখানে মাছ ধরিতেছিল তথায় যায় এবং তথা হইতে বাটী ফিরিয়া চক্ষুতে জ্বালা বোধ করিতে থাকে। আহারান্তে বৈকালে চক্ষুর জ্বালা বৃদ্ধি পায় এবং কিছুক্ষণ পর হইতেই চক্ষুতে আর দেখিতে পায় না। ভোলানাথের জীবনে এই প্রথম এক ইন্দ্রিয় শক্তির আকস্মিক বিলোপ—অন্যান্য ইন্দ্রিয় শক্তির দুর্ব্বলতা সে এখনও কিছুমাত্র অনুভব করিতেছে না।

অনেকে মনে করিতে পারেন ভোলানাথ স্বাস্থ্যরক্ষার বিশেষ কোন নিয়ম পালন করিয়াই এরূপ দীর্ঘজীবন লাভে সমর্থ হইয়াছে কিন্তু আমরা অনুসন্ধান করিয়া অবগত হইলাম ভোলানাথ বেশী দিন বাঁচিবার ইচ্ছায় সেরূপ কোন নিয়মেরই অনুবর্ত্তী হইয়া চলে নাই। ভোলানাথ নিরক্ষর, লিখিতে বা পড়িতে জানে না, আধুনিক শিক্ষা সংস্কারের সহিত সে সম্পূর্ণ অপরিচিত। মাছ ধরা ও বিক্রয় করাই ভোলানাথের প্রধান উপজীবিকা। জাতিগত এই ব্যবসায়েই ভোলানাথ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে। দুই তিন বৎসর হইল ভোলানাথকে মাছ ধরিতে আর বিশেষ দেখা যায় না, তাহার জামাতাই এখন সংসার চালাইয়া থাকে। তাই বলিয়া ভোলানাথ নিকর্ম্মা বসিয়া থাকিত না। সে বাটীতে জাল বুনানী করিত, তবে এখন চক্ষু দুটী নষ্ট হওয়ায় ভোলানাথকে অবশ্য বসিয়াই থাকিতে হইবে।

ভোলানাথ অতি মিতভাষী, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে কোন প্রকার উত্তর দেয় না। নীরবে সে তাহার দৈনন্দিন কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া যায়। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সে শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য সম্পাদন করে এবং কিছু সময় এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়ায়। তৎপর সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। বেলা ১২টা ১টার সময় আহার করে। আহারে বিশেষত্ব কিছু মাত্র নাই। মোটা চাউলের ভাত অর্দ্ধ সের দশ ছটাক পরিমাণ, দাইল মাছ তরকারী যেদিন যেরূপ জোটে, আহার করিয়া থাকে। ভোলানাথ পূর্ব্বে দিবানিদ্রা যাইত না কিন্তু ২।৩ বৎসর হইল আহারের পর এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা নিদ্রা যাওয়া অভ্যাস করিয়াছে। রাত্রিতে দিনের ন্যায়ই আহার করিয়া ১০টার পূর্ব্বেই নিদ্রা যায়। গ্রামের লোক বলিয়া থাকে ভোলানাথ মন্ত্র তন্ত্র জানে কিন্তু ভোলানাথের মুখে সে কথা কোন দিনই শুনিতে পাওয়া যায় নাই। তামাক ব্যতীত ভোলানাথ কোনপ্রকার মাদক দ্রব্য স্পর্শ করে নাই। বিলাসিতা কাহাকে বলে জানে না। পরিশ্রমী, সংযমী, মিতভাষী ভোলানাথকে সর্ব্বদাই প্রফুল্ল দেখা যায়। তাহার মনে কোন উদ্বেগের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না। ভোলানাথ বলিয়া থাকে, কঠিন জ্বর বা অন্য কোন গুরুতর পীড়াতে সে কোন দিন আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া তাহার স্মরণ নাই। সর্দ্দি মাথাধরা বা সাময়িক সামান্য অসুখ কদাচিত দৃষ্ট হয়। শত বর্ষ পূর্ব্বে তাহার গ্রামের অবস্থা কিরূপ ছিল, কে বর্ত্ত পদ্মা কোন পথে প্রবাহিতা ছিল ইত্যাদি বহু পুরাতন কথা ভোলানাথের নিকট শুনিতে পাওয়া যায়। ভোলানাথের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া আমরা ক্রমশঃ অন্য অন্য কথা প্রকাশ করিব।" "স্বরাজ"—৩রা আশ্বিন, ১৩২২ সন।

আয়ুর্ব্বেদে উপশয়।

(প্রেরিত)

আয়ুর্ব্বেদ সভার সভ্যমহোদয়গণ মান্য। শেষ বারে লিখিত।

আয়ুর্ব্বেদের উপশয় অনুসারে প্রতিপন্ন হয় যে, পদার্থের রোগ ও আরোগ্য-কারিণী শক্তি দুইটী বিরুদ্ধ ধর্ম্মের উপর আশ্রিত যথা :—

১। রোগকারণ এবং রোগ সহ তদারোগ্যকারি বস্তুর বিরুদ্ধধর্ম্মিতা।

২। রোগকারণ এবং রোগ সহ তদারোগ্যকারী বস্তুর সমধর্ম্মিতা।

উক্ত ধর্ম্মদ্বয়ের অন্যতরকে পরিত্যাগ করিয়া কোন পদার্থই কোন রোগ আরোগ্য করিতে পারে না; ইহা স্পষ্টাক্ষরে আয়ুর্ব্বেদে লিখিত হইয়াছে। যথা—"অস্মিন্নর্থে উপশয়ঃ—পুনর্হেতু ব্যাধিবিপরীতানাং বিপরীতার্থ কারিণাঞ্চ ঔষধাদীনামুপযোগঃ সুখানুবন্ধ" ইতি চরকসংহিতা নিদান স্থান ১ম অধ্যায় ৪র্থ সূত্র।

তন্মধ্যে হেতুবিপরীত ঔষধের রোগারোগ্যকারিতা সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত যথা:—শীত কফ জ্বরে শুণ্ঠ্যাদি উষ্ণকাথ, এস্থলে জ্বরারম্ভক শ্লেষ্মা শীতগুণ বিশিষ্ট এবং তন্নাশক শুণ্ঠ্যাদি কাথ উষ্ণগুণ সম্পন্ন, অতএব শৈত্য-কার্য্য, উষ্ণতা-নাশক হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত পদার্থ-কার্য্য, বিরুদ্ধ ধর্ম্মিদ্বারা নাশ পাইতে পারে একথা সকলেই স্বীকার করিবেন।

এই প্রসঙ্গে নিত্য নিয়ত নিদান-দোষের রোগে কিরূপ কারণতা তাহাও সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য।

হেতু বিপরীত ঔষধ প্রস্তাবে বিজয় রক্ষিত মহোদয়ের ভারত বিখ্যাত মধুকোষাখ্য মাধব নিদান টীকা পর্য্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয়; রোগারম্ভণ বিষয়ে দোষ নিমিত্ত এবং সমবায়ি কারণ; ইহার মধ্যে নিমিত্ত কারণ আবার দুই ভাগে বিভক্ত, (ক) যাবৎস্থায়ি কার্য্যস্থ সম্পাদক নিমিত্ত কারণ, (খ) কার্য্যস্থ মাত্রে সম্পাদক নিমিত্ত কারণ। এখন দেখা যাইতেছে যেস্থানে দোষ সমবায়ী বা ১ম প্রকারের নিমিত্ত কারণ; সেই স্থানেই দোষ নাশে ব্যাধি নাশ হইতে পারে। কেবল ২য় প্রকারের নিমিত্ত কারণ ভূত দোষনাশে ব্যাধি নাশ হইতে পারে না। অতএব চিকিৎসা প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে কোন রোগ সম্বন্ধে তদারম্ভক দোষ কারণরূপে অবস্থিত, তাহা চিকিৎসক মাত্রেরই অবগত হওয়া উচিত। যে হেতু উহা নির্দ্ধারিত না হইলে এক পক্ষে যেরূপ হেতুপ্রত্যনীক চিকিৎসা অসম্ভব হয়, [illegible] কারণানুসারে দোষপ্রবিভাগ করাও অনর্থক হইয়া পড়ে। [illegible] গণের মধ্যে কেহ তথাবিধ দোষ অনুসারে রোগ-প্র[illegible] করিতে পারেন, তাহা হইলে বলিতে পারি [illegible] প্রাবল্য [illegible] অসঙ্গত নহে।

[illegible] লিখিয়াছেন যে, অধিকাংশ রোগের প্রতি [illegible] নিমিত্ত কারণতা, যথা "দোষাঃ প্রায়শস্তথা বিধাঃ"। [illegible]

কারণতাবচ্ছিন্ন দোষ বিশেষের,ব্যাধি বিশেষের প্রতি কারণতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা না থাকিলে, টীকাকার মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারিতেন না যে দোষাঃ প্রায়শস্তথা বিধাঃ। যে সমস্ত রোগে দোষের তথাবিধ কারণতা নাই, তাহা উল্লেখ করিলে অনেক উপকার হইত; কারণ মূল আয়ুর্ব্বেদের কুত্রাপি রোগ বিশেষে দোষ বিশেষের কারণ বিশেষতা উল্লেখ নাই। তবে নিঃসম্বলের সম্বল রক্ষিত টীকার একটী উদাহরণ দেখিয়া পর্য্যালোচনা করতঃ দেখি, কি ফল দাঁড়ায়।

তিনি লিখিয়াছেন, "যদ্দোষ হরং তন্নাবশ্যং ব্যাধি হরং যথা বমনলঙ্ঘনে কফ-হরে নতু কফ গুল্মং হরতঃ।" এস্থলের গুল্মারম্ভক দোষ ২য় প্রকারের নিমিত্ত কারণ, অন্যথা কফনাশে তৎকার্য্য গুল্মনাশের অবশ্যম্ভাবিতা; সমবায়ী বা কার্য্য স্থায়ী নিমিত্ত কারণ নাশে, কখনও কার্য্যের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। অতএব কফ গুল্মারম্ভক কফ, এখানে ২য় প্রকারের নিমিত্ত কারণ; এইরূপ সঙ্কেত দ্বারাও যদি বাকী কয়টী বুঝাইয়া দিতেন, তাহা হইলে আমরা প্রীত হইতে পারিতাম; এখন আলোচনা করিয়া দেখা একান্ত কর্ত্তব্য যে, মূল গ্রন্থকারের বচনের মধ্যে কি বিশেষত্ব লাভ করিয়া, গুল্মারম্ভক কফকে ২য় নিমিত্ত কারণ ভুক্ত করেন। কারণ তাহা হইলে সেই বিশেষত্বটী অবলম্বন করিয়া, তথাবিধ রোগের বাকী কয়েকটীও আবিষ্কার করিতে পারিব। কিন্তু অনুসন্ধানে গুল্মরোগের সহিত অন্য রোগের নিদানাদি তুলনায়, কোনরূপ বিশেষ প্রতিপন্ন হয় না; এস্থলে তৎপ্রমাপক বচনাপন্যাস পূর্ব্বক, প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা অনাবশ্যক বিধায়, তাহা হইতে বিরত রহিলাম। যাঁহাদের জন্য লিখিত হইয়াছে, তাঁহারা কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলেই উহাদিগের [illegible] অবিশেষত্ব বুঝিতে পারিবেন। তবে যদি কেহ বিশেষত্ব প্রমাণ করিতে পারেন, তাহা হইলে আনন্দের বিষয় হইবে।

এস্থানে বলা যাইতে পারে [illegible] চিকিৎসায় যখন শ্রেষ্ঠতম কফনাশক প্রক্রিয়া [illegible] নিষিদ্ধ হইয়াছে, তখনই বুঝিতে হইবে এখানে গুল্মরোগ [illegible] প্রকারের নিমিত্ত কারণ। অন্যথা [illegible] প্রক্রিয়ায় বা [illegible]?

[illegible] গ্যাদি, এই বচনটী দ্বারা প্রকৃত পক্ষে [illegible] বুঝা যায়, দোষ বিশেষারব্ধ গুল্মরোগ বিশেষে

বুঝায় না। যুক্তিও দেওয়া যাইতে পারে, "অবিবর্ণঃ স্থিরশ্চৈব হ্যপক্কোগুল্ম উচ্যতে" (ইতি চরক সংহিতা গুল্মরোগে ৩৩ সূত্র) এই স্থানে অপক্ক শব্দ সামান্য গুল্মপর হওয়ায়, বাতিকাদি সমস্ত গুল্মই পাকিতে পারে; ইহাই সংহিতাকারের অভিপ্রায় বুঝা যায়।

যে গ্রন্থি পক্কতাপ্রবণ, তাহাতে বমন দ্বারা গ্রন্থি সঞ্চালিত ও বিদীর্ণ হইয়া অস্থানে (Paretoniam) পূযস্রাবাদি দ্বারা মৃত্যু হইতে পারে।—অভ্যন্তরস্থ ব্রণের পক্কাপক্ক নিরূপণে কৃত যোগ্য সার্জ্জন (Surgeon) দিগকেও 'ট্রোকার' অবলম্বন করিতে হয়। অতএব যুক্তি এবং শাস্ত্র এতদুভয় দ্বারাই প্রতিপন্ন হয় যে, বমন ক্রিয়া বাতিকাদি সমস্ত প্রকারের গুল্মরোগে অনিষ্টজনক। গুল্ম রোগের বিশেষত্ব লইয়া যাহা নিষিদ্ধ তাহাকে তিনি শ্লেষ্মারব্ধ গুল্মবিশেষে নিবদ্ধ করিয়া বলিয়াছেন "বমন লঙ্ঘনে কফ হরে নতু কফ গুল্মং হরতঃ" কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে চরক সংহিতার গুল্ম রোগাধিকারে চিকিৎসিত স্থানের ১০০ সূত্রে "বমনং বমনার্হায় প্রদদ্যাত কফগুল্মিনে" এই বচনে বিশেষভাবে কফগুল্মের চিকিৎসায় বমনের ব্যবস্থা রহিয়াছে। যদ্দোষ হরং তন্নাবশ্যং ব্যাধি হরং ইহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিয়াছেন, বমন লঙ্ঘনে কফ হরে নতু কফ গুল্মং হরতঃ। এস্থলে যদি বমন ভিন্ন অন্য কোনও রূপ শ্লেষ্মা নাশক প্রক্রিয়া দ্বারা কফ গুল্ম বিনাশের ব্যবস্থা পাওয়া যায়, তাহা হইলে কফ নাশে তৎকৃত গুল্ম নাশ হইবে না; এরূপ কল্পনা যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। আবার শাস্ত্রেও দেখিতে পাইতেছি, "কফগুল্মে পিবেৎ কালে সক্ষারং কটুকং ঘৃতং" (ইতি চরক গুল্ম রোগ ৪৫ সূত্র) এবং লঙ্ঘনোল্লেখনে ইত্যাদি (গুল্ম রোগ ৫২ সূত্র) এস্থলে কটু রস এবং লঙ্ঘনোল্লেখনাদি শ্লেষ্মনাশক প্রক্রিয়া বিহিত থাকা সত্ত্বে তৎকর্ত্তৃক যে রোগ বিনষ্ট হইবে না, এরূপ কল্পনা নিতান্ত অযোগ্য; আর গ্রন্থকার বমন লঙ্ঘনের সামান্য নিষেধকে বিশেষ ভাবে ধরিয়া যে সিদ্ধান্তে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত অসম্বদ্ধ, কারণ শাস্ত্রেই বিশেষ সূত্র দ্বারা কফগুল্মে বমন ও লঙ্ঘন বিহিত হইয়াছে, যথাঃ—(ক) বমনার্হায় বমনং প্রদদ্যাৎ কফগুল্মিনে ১০০ সূত্র।

(খ) লঙ্ঘনোল্লেখনে স্বেদে কৃতেহগ্নৌ সংপ্রধুক্ষিতে।

কফগুল্মে পিবেৎকালে সক্ষারং কটুকং ঘৃতং ॥

চরক গুল্ম রোগ ৫২ সূত্র।

টীকাকার লিখিয়াছেন—"কপাল মালা সংযোগস্যাসমবায়ি কারণস্য নাশাদ্ যথা ঘটাভাব স্তথা রোগেঽপি সম্প্রাপ্তিলক্ষণস্য দোষদূষ্য সংযোগস্যাভাবাদ্ ব্যাধিনাশঃ।" এইস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে,এবম্বিধ রোগ আরোগ্যকে কি বলিব ? কারণ ইহা উপশয়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না ; যাহাদিগের উপযোগ সুখাবহ হইবে, তাহারা হয় রোগের সমধর্ম্মী নয় বিধর্ম্মী হইবেক ; কিন্তু সংযোগ বিধ্বংসি ঔষধ, উক্ত ধর্ম্মদ্বয়ের যদি একটীকেও লইয়া বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে উহা যে রোগ ও দোষের বিনাশক না হইয়া দোষদূষ্য সংযোগ মাত্র বিনাশক হয়, এরূপ কল্পনা অনুচিত। দোষাদির প্রকোপ নিবারণ সম্বন্ধে সংযোগ বিধ্বংসি ঔষধ উদাসীন, ইহাই টীকাকারের উক্তি সাক্ষ্য দেয় ; যথা "দোষস্তু স্বতঃ ক্রিয়ান্তরেণ বা নিবর্ত্ততে। ইহাও তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, রোগ আরোগ্যকারী পদার্থসমূহ, হেতু ব্যাধির বিপরীত না হইয়া রোগ আরোগ্য করিতে পারে না। যথা অনেনৈব ন্যায়েন সর্ব্বমেব তদর্থকারী যথাসম্ভবং হেতু প্রত্যনীকাদাবেবান্তর্ভবতি। অতএব তাঁহার মতে যাহা রোগ দোষ কিছুই নাশ না করে তাহার উপযোগকে উপশয় বলা যায় না। দোষদূষ্য সংযোগ মাত্র বিধ্বংসী ঔষধ সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ খুঁজিয়াও বোধ হয় পাওয়া যাইবে না। আর যদি তথাবিধ দ্রব্যই থাকে এবং তাহার উপযোগ দ্বারা রোগ আরোগ্য হয়, তাহা হইলে তাহাকে কি বলিব ? এখন রোগবিশেষে দোষের কারণ বিশেষাবচ্ছিন্নতা ও দোষদূষ্য সংযোগ নাশে ব্যাধি আরোগ্যতা সম্বন্ধে টীকাকার যাহা লিখিয়াছেন, তাহা যে নিরর্থক ও অশাস্ত্রীয় ইহা বোধ হয় আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। তবে যদি কেহ তাহার সার্থকতা ও শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিতে পারেন তবে ইহা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইব। হেতু বিপরীত ঔষধ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল ; ঐরূপ ব্যাধি বিপরীত ঔষধাদি সম্বন্ধে আলোচনা বারান্তরের জন্য রাখিয়া দিয়া সম্প্রতি হেতু ব্যাধি বিপরীতার্থকারী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনান্তে আমার কথা শেষ করিব।

টীকাকার হেতু ব্যাধি বিপরীত তার্থকারী শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"নিদানাদি সমান ধর্ম্মিনোঽপি প্রভাবাৎ রোগপ্রশমকারিণঃ।" এস্থলে সমান শব্দ সদৃশ বোধক। সাদৃশ্য আবার তদ্ভিন্নত্বে তদ্গত ধর্ম্মবহুলবৎ পদার্থনিষ্ঠ। দৃষ্টান্ত দিয়াছেনঃ—মদাত্যয়ে মদ্যপানম। এস্থলে মদাত্যয় রোগের উৎপাদক ও

মদ্য, বিনাশকও মদ্য, মদ্যত্ব পুরস্কারে যখন উহাদিগের মধ্যে অভিন্ন ভাব, তখন উহারা সদৃশ হইবে কি প্রকারে, একমাত্র ব্যক্তির আবার সাদৃশ্য কোথায়? তদভাবে উহাকে সদৃশ বিধানান্তর্গত না করিয়া, সম বিধানান্তর্গত করাই সাধারণ দৃষ্টিতে কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। রক্ষিত মহোদয় কিন্তু রুক্ষ মাধ্বীকাদি মদ্যকৃত মদাত্যয়ে স্নিগ্ধ পৈষ্টিকাদি মদ্যদ্বারা চিকিৎসা বিধান দেখিয়া এখানে এরূপ চিকিৎসাকে হেতু বিপরীত চিকিৎসান্তর্গত করিয়াছেন। এস্থলে জিজ্ঞাস্য যে মাধ্বীক মদ্যের রুক্ষত্ব মদাত্যয় সম্পাদক, না মদ্যত্ব মদাত্যয় সম্পাদক? এস্থলে সকলেই বলিবেন যে, মদ্যত্ব মদাত্যয় কারক, রুক্ষত্ব নয়। যদি রুক্ষত্বই হইবে, তাহা হইলে অন্য রুক্ষতামাত্র সম্পন্ন পদার্থ দ্বারা ও মদাত্যয় হইত; যখন তাহা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, এবং রুক্ষ স্নিগ্ধ সকল প্রকার মদ্যের যখন মদাত্যয় সম্পাদকতা আছে, তখন তন্নিষ্ঠ রুক্ষত্ব স্নিগ্ধত্ব মদাত্যয় সামান্যের প্রতি হেতু নয়। যদি তাহাই হইবে তবে রুক্ষ মদ্যজনিত মদাত্যয়ে স্নিগ্ধ মদ্য না দিয়া অন্য স্নিগ্ধ পদার্থ দ্বারাই চিকিৎসা করা উচিত। অতএব রক্ষিত মহাশয়ের মদাত্যয়ে মদ্য পানকে, হেতু বিপরীত বলা একদেশ দর্শিতার ফল দাঁড়াইয়াছে।

আবার লিখিয়াছেন, অগ্নিপ্লুষ্টে উষ্ণোহগুর্ব্বাদি লেপঃ। অত্রোক্ত ক্রিয়য়া রক্তস্য বিলয়নেন স্থানান্তর গমনাৎ হেতু প্রত্যনীকত্বেব। যথাঃ—

প্রকৃত্যাপ্যুদকং শীতং স্কন্দয়ত্যাশু শোণিতম্।

তস্মাৎ সুখয়তিত্যুষ্ণং নতু শীতং কথঞ্চন॥ সুশ্রুত সংহিতা।

পরক্ষণেই আবার লিখিত হইয়াছে যে, আমদোষ সম্ভূত উরুস্তম্ভ রোগে, জল প্রতরণ, হেতু সমান ধর্ম্মী হইলেও ফলে বিরুদ্ধ ধর্ম্মী হইয়া দাঁড়ায়। যেমন কুম্ভকারের পয়ণের (পুণী) বহির্ভাগ মৃত্তিলিপ্ত করায়, অভ্যন্তরস্থ তাপ বাহির হইতে না পারিয়া, মৃৎপাত্রকে পক্ব করে। উরুস্তম্ভেরও বাহিরে শৈত্য লাগিয়া তাহার মধ্যের তাপ বাহির হইতে না পারিয়া স্বেদের কার্য্যকারী হইয়া থাকে। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই কুম্ভকার পয়নন্যায়ে যদি এখানে উপকার হয় তবে অগ্নিপ্লুষ্টে জল প্রয়োগে সেইরূপ হয় না কেন?

হেতু ব্যাধি বিপরীত অর্থকারী ঔষধের রোগ আরোগ্যকারিতা সম্বন্ধে টীকাকারের চরম সিদ্ধান্ত যথাঃ—"ভপাপ্যবান্তর বৈধর্ম্ম্য প্রতিপাদনার্থ মাচার্য্যৈঃ

পৃথক্ দর্শিতম্ অর্থাৎ আপাত দৃষ্টিতে যদিও উহাদিগকে হেতু ব্যাধি সমান ধর্ম্মী বলিয়া বোধ হয় তথাপি প্রকৃত পক্ষে উহারা হেতু ব্যাধি বিপরীত। তাঁহার মতে দোষ ও ব্যাধি সমধর্ম্মী পদার্থ দ্বারা রোগ আরোগ্য হইতে পারে না; কাযেই তিনি আত্মমত পোষণোপযোগী যে সমস্ত ব্যাখ্যা মদাত্যয়ে মদ্য পানাদি ব্যবস্থানুসারে করিয়াছেন, তাহা যে সমীচীন হয় নাই, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। হেতু ব্যাধি বিপরীত অর্থকারী শব্দটী মাত্র দিয়া যেখানে অভিপ্রায় সিদ্ধি হইতে পারে সেস্থলে অবান্তর ভেদের জন্য সংক্ষিপ্ত কথন স্বভাব মুনিগণ যে বিপর্য্যস্তার্থকারী শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, এরূপ কল্পনা অস্বাভাবিক। প্রকৃত বিপর্য্যস্তার্থকারী ঔষধ অর্থাৎ রোগ যে সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত, সেই সমস্ত লক্ষণ যে সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা স্বাভাবিক শরীরে আনীত হয়, সেই ঔষধ দ্বারা যদি সেই রোগ নাশ বিষয়ে উপদেশ পাওয়া যায়, তাহা হইলে আমরা বিপর্য্যস্তার্থকারী শব্দের নিরর্থকতা প্রমাণ করিতে যাই কেন? আমার বিশ্বাস ইহাই বিশুদ্ধ (Homœopyathy) হোমিওপ্যাথি। হ্যানিম্যান্ জন্মিবার বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সিমিলিমেণ্ট চিকিৎসা ভারতে প্রচলিত ছিল। অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই যে, বেতাল রস, সূচিকাভরণ প্রভৃতি প্রাণনাশক বিষঘটিত ঔষধ আসন্ন মৃত্যুকালে ব্যবস্থিত হইয়া অশেষ উপকার সাধন করে। যে সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত রোগীর লক্ষণ যে বিষাভিভূতের ন্যায়, তাহাদিগের জন্য সেই বিষ-প্রধান ঔষধের প্রয়োগ আদিষ্ট হইয়াছে। * যথা জ্বরাধিকারে বেতাল রসে—যে কাঠ বিষ আছে, তাহা দ্বারা অভিভূত রোগীর অন্তিমে যেরূপ অবস্থা হয় তাহাই ঐ ম্লানতা প্রভৃতি। ঐরূপ ফণিবিষ প্রধান সূচিকাভরণ সম্বন্ধেও দ্রষ্টব্য। বেতাল রসাদি বিপরীতার্থকারী ঔষধ সহ যদিও অপর প্রকারের হেতু ব্যাধি-বিপরীত ঔষধ মিশ্রিত থাকুক তথাপি উহা একত্রিত হইয়া যে বিপরীতার্থকারী হয়, তাহা দেখান নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিলেও অতি বিস্তার ভয়ে বারান্তরের জন্য রাখিয়া দিলাম। এখন কৃতবিদ্য ভিষগ্‌গণের নিকট আমার নিবেদন, আমি যে সমস্ত যুক্তি তর্ক দ্বারা রক্ষিত টীকার অসামঞ্জস্য প্রমাণ করিলাম, যদি কেহ তাহা খণ্ডন করিয়া সারগ্র প্রমাণ করিতে পারেন, তাহা হইলে অবনত

* ম্লানেষু নিপুণ [illegible] মে [illegible]গ্রন্তেষু দেহিষু।
দাতুমর্হতি বেতালো যমদূত নিবারকঃ॥

মস্তকে আত্মদোষ স্বীকার করিয়া রক্ষিত মতাবলম্বী হইব। আর যদি কেহই তাঁহা না পারেন, তাহা হইলে বুঝিব, রক্ষিত মহোদয় আয়ুর্ব্বেদে স্বকপোল কল্পিত মত পোষণ করিয়াছেন এবং চিকিৎসকগণও সেই পথে পরিচালিত হইয়া আসিতেছেন।

ডাক্তার—শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কবিশেখর।
পোঃ কেওরা, জিঃ বরিশাল।

প্রতিবাদ।

সবিনয় নিবেদন মিদং—

মহাশয়, আপনার আয়ুর্ব্বেদ-বিকাশের তৃতীয় বর্ষের পঞ্চম সংখ্যাতে প্রকাশিত "স্বাস্থ্য-তত্ত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠে আমার কয়েকটী বক্তব্য বিষয় আছে। তন্মধ্যে প্রধানতঃ এই সামান্য পত্রে ১টী মাত্র বিষয় লিখিতেছি, আশা করি সন্দেহ ভঞ্জন করিবেন। উক্ত প্রবন্ধের এক স্থানে লেখা আছে "আয়ুর্ব্বেদ চতুর্ব্বেদের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও উহা আমাদেরই জিনিষ।" এবিষয়ে আমার বক্তব্য, ইহা কি ঠিক? আয়ুর্ব্বেদ চতুর্ব্বেদের অন্তর্ভুক্ত নহে কি? আমার মনে হয় ইহা চতুর্ব্বেদের অন্তর্ভুক্ত বটই। কারণ আয়ুর্ব্বেদে ব্রহ্মার প্রাদুর্ভাব প্রসঙ্গে উক্ত আছে যে "বিধাতাথর্ব্ব সর্ব্বস্বমায়ুর্ব্বেদং প্রকাশযন। স্বনাম্না সংহিতাংচক্রে লক্ষ শ্লোক ময়ী মৃজং" ইহা দ্বারা এবং সুশ্রুতের সূত্র স্থানে উক্ত "ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদো নাম যত্নপাঙ্গমথর্ব্ব বেদস্যানুৎপাদ্যৈব প্রজাঃ শ্লোক শত-সহস্র মধ্যায় সহস্রঞ্চ কৃতবান্ স্বযম্ভুঃ" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা, ইহা যে চতুর্থ বেদ অথর্ব্ব বেদের অন্তর্ভুক্ত তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। যদিও ইহা ঐ বেদের উপাঙ্গ তথাপি ইহার বেদান্তভুক্ততা নিরাকৃত হইবার নহে। অতএব সুশ্রুত টীকাকার লিখিয়াছেন—"উপাঙ্গমঙ্গমেবাল্পত্বা দুপাঙ্গম্। তদ্যথা বাহু জঙ্ঘ শির ইত্যঙ্গানি কর চরণ নাসিকাদীন্যুপাঙ্গানি ইত্যাদি" এবং ইহারও যে বেদ নিবন্ধন বেদ বেদাঙ্গের মত নিত্যত্ব আছে তাহাও ঐ টীকাকার "কৃতবান্ সংস্কৃতবান্ নতু পূর্ব্বমুৎপাদিতবান্। কুতঃ নিত্যত্বং" এই ব্যাখ্যা দ্বারা স্পষ্টীকৃত করিয়াছেন অতএব উক্ত প্রবন্ধের লেখক গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত অশ্রুতপূর্ব্ব কথাটা কিরূপে লিখিলেন ইহার কৈফিয়ৎ দিবেন কি? আশা করি এই প্রশ্ন উপেক্ষা না করিয়া যথাযথ উত্তর আপনার পত্রিকা তেই দিবেন ও আমারও এই পত্র প্রকাশ করিবেন। সন্দেহ ভঞ্জন করাই আমার উদ্দেশ্য। আশা করি নিরপেক্ষ ভাবে থাকিয়া ইহার সুমীমাংসা করিয়া কৃতার্থ করিবেন। অলং বিস্তরেণ ইতি—

বিনত শ্রীভোলানাথ দাশ গুপ্ত। বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া।

"প্রাণো বা অমৃতম্।" (শ্রুতিঃ)

আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ।

(স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন ও চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র)

"আয়ুঃকাময়মানেন ধর্ম্মার্থ সুখসাধনম্।
আয়ুর্ব্বেদোপদেশেষু বিধেয়ঃ পরমাদরঃ॥ বাগ্‌ভট।

৩য় বর্ষ } পৌষ ১৩২২ { ৯ম সংখ্যা।

উপনিষদের প্রাণ-বিজ্ঞান।

(২)

কেনোপনিষৎঃ-

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথো বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি সর্ব্বং ব্রহ্মোপনিষদং মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্ত্ব নিরাকরণং মেহস্তু তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্ম্মাস্তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু॥

আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল, বাক্য, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, বল ও সমুদয় ইন্দ্রিয় সকলই পরিপূর্ণতা লাভ করুক। এই সকলের অভ্যন্তরে জানই ব্রহ্মোপনিষৎ। এই সকল জ্ঞান আমাতে সতত বিদ্যমান থাকুক।

এই যে মন ইহা কাহাদ্বারা নিযুক্ত হইয়া বিষয়সমূহে ধাবিত হয়? শরীরস্থ প্রাণ বা বল কাহার প্রেরণায় কর্ম্মসাধনে সক্ষম হয়? আমাদের বাক্যসকল কাহার শক্তিতে উচ্চারিত হয়? এই চক্ষু ও কর্ণই বা কাহার প্রভাবে দর্শন এবং শ্রবণ করিয়া থাকে?

যিনি শ্রোত্রেরও শ্রোত্রস্বরূপ, মনেরও মন, বাক্যের বাক্য, চক্ষুর চক্ষু, প্রাণেরও প্রাণ তিনিই ইহাদের একমাত্র পরিচালক প্রভু। এই পরম তত্ত্ব যে

জ্ঞানিগণ লাভ করিতে পারেন তাঁহারাই ইহলোক অতিক্রম করিয়া অমৃতত্ব বা অমরতা লাভ করিয়া থাকেন। এই চক্ষুর জ্যোতিঃ সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না, বাক্যের গতিও সেখানে হয় না, মনের দ্বারাও তাহা মনন করা যায় না। বস্তুতঃ আমরা তাঁহাকে বুঝিতে পারি না, তিনি আমাদের জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বিষয়সমূহ হইতে স্বতন্ত্র এবং শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বাচার্য্যগণ যেরূপ উপদেশ করিয়া গিয়াছেনঃ—

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ কেন প্রাণঃ পততি প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতং বাচমিমাং বদন্তি চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি॥
শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্ বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতাভবন্তি॥
ন তত্র চক্ষু র্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনো ন বিদ্ম ন বিজানীমো
যথৈতদনুশিষ্যাৎ।
অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষং যে
নস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে॥

যিনি বাক্য দ্বারা প্রকাশিত হন না অথচ বাক্য যৎকর্ত্তৃক প্রাদুর্ভূত হয় তিনিই ব্রহ্ম, কিন্তু এই যে শরীরাদি মাত্র ব্রহ্ম নহে। মন দ্বারা যাঁহার পরিসীমা হয় না অথচ মনের অধিস্বামী যিনি, তিনিই ব্রহ্ম অন্য শরীরাদি বস্তু নহে। এইরূপ যাহাকে চক্ষুদ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না যিনি চক্ষুর দর্শন শক্তির কারণ, যাঁহাকে কর্ণেও শুনিবার শক্তি কাহারও নাই, যিনি কর্ণকে শ্রবণশীল করেন, যিনি গন্ধ দ্বারাও অনুভূত হন না অথচ ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে যিনি গন্ধ গ্রহণের ক্ষমতা দান করেন, তিনিই ব্রহ্ম অন্য শরীরাদি অবয়ব নহে।

যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
যচ্ছোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।

তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥
যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥

তুমি যদি মনে কর ইহাকে আমি বিদিত আছি, তবে নিশ্চয় ভ্রম করিয়াছ। তুমি সকল বস্তুতে ব্রহ্মকে দেখিতে পাও বলিয়া মনে কর তাহাও অকিঞ্চিৎকর। বস্তুতঃ তিনি যে সুজ্ঞেয় নহেন এবং একবারে অজ্ঞেয়ও নহেন এই অর্থের তাৎপর্য্য বুঝিতে যিনি সক্ষম হইয়াছেন, তিনিই বলিতে পারেন যে আমি তাঁহাকে জানি।

তিনি আমাদের জ্ঞানাতীত, এরূপ যিনি মনে করেন তিনি বরং কতকটা বিদিত হইয়াছেন, যিনি মনে করেন ব্রহ্মকে জ্ঞাত হইয়াছি, তিনি কখনও তাহাকে জানিতে পারেন নাই। জ্ঞানী ও অজ্ঞের মধ্যে ইহাই প্রভিন্ন লক্ষণ।

যাবতীয় জ্ঞান যখন ব্রহ্ম জ্ঞান বলিয়া প্রতিভাত হয় তখনই অমৃতত্ব লাভ হইয়া থাকে। প্রকৃষ্ট আত্মা দ্বারাই ঐশ্বর্য্য লাভ ঘটে এবং উহাই অমৃতের সন্ধান করিয়া দেয়।

ইহলোকে সেই পরম সত্যকে যিনি উপলব্ধি করিতে পারেন তিনিই কেবল অমর হইয়া থাকেন, আর যাহারা তাহাকে জ্ঞাত হইতে পারেন না তাহারই মহা বিনাশ সংঘটিত হয়। অতএব ধীর ব্যক্তিগণ সর্ব্বভূতে সেই মহা সত্যের অনুসন্ধান করতঃ অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকেন।

যদি মন্যসে সুবেদেতি দ্রভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপম্।
যদস্য ত্বং যদস্য দেবেষ্বথ নু মীমাংস্যমেব তে মন্যে বিদিতম্ ॥
নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদচ।
যে নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদচ ॥
যস্যামতং তস্যমতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্ ॥
প্রতিবোধ বিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে।
আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্ ॥
ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি নচেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥

ব্রহ্ম—পরমাত্মা, আত্মা—প্রাণ বা বল—শক্তি, ঐশ্বর্য্য—ইহারা পরস্পর কতটা সাপেক্ষ বা নিরপেক্ষ তাহা ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইবে। যিনি স্পন্দনহীন, যাঁহাকে মন বা ইন্দ্রিয়াদির দ্বারাও ধারণা করা যায় না, তিনিই কিন্তু আবার দেবতাদের পক্ষাবলম্বন করিয়া অসুরদিগকে পরাভব করিয়াছিলেন এ বিষয়ে সুন্দর উপাখ্যান বর্ণিত আছে :—

দেবাসুরের সেই ভীষণ সংগ্রামে দেবতারাই অবশ্য জয় লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু এই জয়ের মূলে যে এক মহাপুরুষ বিদ্যমান ছিলেন, তাহা তাঁহারা আদৌ বুঝিতে না পারিয়া গর্ব্ব অনুভব করিয়া বলিতেছিলেন আমরা অসুরদিগকে পরাজয় করিয়া অতুল মহিমা সম্পন্ন হইয়াছি! ইহাদের এই অনুচিত অহংকার খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত ব্রহ্ম তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। দেবতারা তখন সেই পরম অদ্ভুত পূজনীয় পুরুষকে অবলোকন করিয়া নিজেরা অগ্রসর না হইয়া অধিক তেজোময় জাতবেদা অগ্নিকে প্রেরণ করিলেন যে,তুমি ইহাঁর বিশেষ পরিচয় জানিয়া আইস। অগ্নি উপস্থিত হইলে সেই পুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? অগ্নি বলিলেন, আমি অগ্নি এবং জাতবেদা নামে প্রথিত। পুরুষ বলিলেন, তাদৃশ গুণসম্পন্ন তোমার শক্তি কতটুকু? অগ্নি সদম্ভে উত্তর দিলেন, "পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নাই যাহাকে আমি দগ্ধ করিতে না পারি।" তখন পুরুষ একটি তৃণ দেখাইয়া বলিলেন, "ইহাকে দগ্ধ কর।" অগ্নি সমুদয় শক্তির সহিত তৃণের সমীপে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু যেমন তৃণ তেমনিই রহিল। তখন তিনি লজ্জিত ও প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দেবতাগণ সকাশে বলিলেন, "এই পূজনীয় পুরুষের পরিচয় লওয়া আমার কর্ম্ম নহে।" দেবতারা তখন অমিত বল বায়ুকে বলিলেন, বায়ো, তুমি এই পুরুষটির পরিচয় জানিয়া আমাদের বল। তিনি বায়ুকে সমীপস্থ দেখিয়া বলিলেন,—"তুমি কে?" বায়ু বলিলেন,—"আমি মাতরিশ্বা" (যাহার অন্তরীক্ষে অসাধারণ শক্তি)। তাদৃশ নামযুক্ত তোমাতে কি বীর্য্য বিদ্যমান? বায়ু বলিলেন, এই পৃথিবীস্থ যে কোন বস্তু আমি বহন করিয়া লইতে পারি। ব্রহ্ম বায়ুকেও এক গাছি তৃণ দেখাইয়া বলিলেন, ইহাকে গ্রহণ কর দেখি। বায়ু সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও উহাকে লইতে সমর্থ হইল না। বায়ু প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক দেবতাদিগকে বলিলেন, এই বরণীয় পুরুষ কে তাহা বুঝা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। দেবতারা তখন ইন্দ্রকে প্রেরণ

করিলেন, তুমিই ইহার পরিচয় লইয়া আইস। ইন্দ্র "তথাস্তু" বলিয়া তড়িৎ-গতিতে ব্রহ্মসমীপে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্ম তাহাকে দেখিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ইন্দ্র সেই আকাশে স্ত্রীরূপা অনন্ত সৌন্দর্য্যশালিনী হৈমবতী সর্ব্বমঙ্গলা উমাকে আবির্ভূতা দেখিতে পাইয়া সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই মহাপ্রভাব মহাপুরুষ কে?" তিনি ইন্দ্রকে বলিলেন, বৎস, ইনিই ব্রহ্ম, ইহার বিজয়েই তোমরা বিজয়ী ও মহিমান্বিত। পরিচয় পাইয়া ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি দেবতাগণ বুঝিতে পারিলেন, ইনিই ব্রহ্ম ; ইনিই আমাদের বিজয়ী করিয়াছেন।

অগ্নি, বায়ু ও ইন্দ্র এই তিন জন ব্রহ্মের সমীপবর্ত্তী হইয়া সংস্পৃষ্টভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন ইনিই সর্ব্বময় কর্ত্তা ব্রহ্ম ; এজন্য অন্য দেবতা হইতে ইঁহারা অধিক মান্য। ইন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া বিদিত হন এজন্যই ইন্দ্র সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেন।

ব্রহ্মকে উপমা দ্বারা উপদেশ করিতে হইলে বলিতে হয়, ইনি বিদ্যুতের বিস্ফুরণ অথবা চক্ষুর নিমেষ সদৃশ। ইঁহাকে কেবল সতত মন দ্বারা স্মরণ করিয়া রাখাই একমাত্র সঙ্কল্প হওয়া কর্ত্তব্য।

এই ব্রহ্মই সকলের উপাস্য। যিনি ইঁহাকে উপাসনা করেন,তিনি সর্ব্বভূতের প্রিয় হন। ইহাকে লাভ করিতে হইলে তপস্যা বা স্বকর্ত্তব্যানুষ্ঠান, দম বা ইন্দ্রিয়গণকে স্ববশে আনয়ন করা, কর্ম্ম বা নিষ্কাম জীবনোপায়, বেদ অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গ সুশিক্ষা, এই সমুদয়েরই একমাত্র আশ্রয় সত্য, সত্য ব্যতীত কোন বিষয়ে সফলতা লাভের আশা নাই। যিনি এই মহাতত্ত্ব বা মহাসত্য জ্ঞাত হইতে পারেন, তিনি পাপ-রোগ-দুঃখ কলুষ হইতে মুক্ত থাকিয়া অনন্ত সুখময় মহৎলোকে সুপ্রতিষ্ঠ হন। অর্থাৎ স্বর্গরাজ্য প্রাপ্ত হন।

তস্যৈ তপোদম কর্ম্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ।

সর্ব্বাঙ্গানি সত্যমায়তনম্॥

যে বা এতামেবং বেদাপহত্য পাপ্মানমনন্তে স্বর্গে লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি। ইতি কেনোপনিষৎ॥

আয়ুর্ব্বেদে ধর্ম্মভাব।

১। সুশ্রুত।

আয়ুর্ব্বেদে কেবল শারীরিক বিষয় লইয়াই মনুষ্যকে উপদেশ প্রদত্ত হইবে, ধর্ম্মের কথা কেন ইহাতে থাকিবে ?—এইরূপ প্রশ্ন সনাতন ধর্ম্মে আস্থাবান কোন ব্যক্তিরই বিকল্প থাকিতে পারে না ; কারণ আর্য্যগণ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও পরলোকের প্রতি বিশ্বাস রাখিতেও আস্তিক্যের অবলম্বন করিতে ভূয়োভূয় উপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। চিকিৎসাশাস্ত্রেও এই জন্যই "দৈব ও মানুষ" এই দুই প্রকার চিকিৎসার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। সাধারণতঃ যে সকল ঔষধ প্রক্রিয়াদি অবলম্বন পূর্ব্বক রোগের প্রতিকার করা হইয়া থাকে, তাহাই "মানুষ" চিকিৎসা ; আর রোগের উপশম উদ্দেশ্যে শান্তি ও স্বস্ত্যয়নাদির বিধানই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে "দৈব" চিকিৎসা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

যাহা হউক, প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ সংহিতা সমূহে যেরূপ ধর্ম্মপ্রাধান্যের সমুল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা দ্বারা প্রাচীনকালের আর্য্যগণ কিরূপ প্রাকৃতিসম্পন্ন ছিলেন, তাহা সুস্পষ্ট বোধগম্য হইবে। বর্ত্তমান [illegible] যুগে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের এই ধর্ম্মভাবও কথঞ্চিৎ আলোচনা করা সর্ব্বতোভাবেই সমীচীন বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। [illegible] আয়ুর্ব্বেদের অপৌরুষেয়ত্ব। [illegible] বেদের ন্যায় আয়ুর্ব্বেদও সর্ব্বাগ্রে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা কর্ত্তৃকই অভিব্যক্ত হইয়াছিল। [illegible] ভগবান্ ধন্বন্তরি স্বশিষ্য সুশ্রুতকে বলিতেছেন, [illegible]

"ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদো নাম যদুপাঙ্গমথর্ব্ববেদস্যানুৎপাদ্যৈব প্রজাঃ শ্লোকশত-সহস্রমধ্যায়সহস্রঞ্চ কৃতবান্ স্বয়ম্ভুঃ। ততোঽল্পায়ুষ্ট্বমল্পমেধস্ত্বঞ্চাবলোক্য নরাণাং ভূয়োঽষ্টধা প্রণীতবান্।"

আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ। প্রজাসৃষ্টির পূর্ব্বেই ভগবান স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা এক সংহিতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই সংহিতাতে এক লক্ষ শ্লোক ও এক সহস্র অধ্যায় ছিল। তাহার পরে মানুষের অল্পায়ু বিবেচনা করিয়া, ব্রহ্মা স্বীয় সংহিতাকে শল্য, শালাক্য, কায়চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্য, বিষতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র ও বাজীকরণ তন্ত্র এই আট ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন।

ধন্বন্তরি, আয়ুর্ব্বেদের গুরুপরম্পরার সমুল্লেখ পূর্ব্বক বলিতেছেন ;—

"ব্রহ্মা প্রোবাচ। ততঃ প্রজাপতিরধিজগে। তস্মাদশ্বিনৌ। অশ্বিভ্যামিন্দ্রঃ। ইন্দ্রাদহম্——।"

সর্ব্বপ্রথমে ব্রহ্মা কর্তৃক আয়ুর্ব্বেদ অভিব্যক্ত হইয়াছিল। ব্রহ্মার নিকটে প্রজাপতি দক্ষ আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন। দক্ষ হইতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাদের নিকট হইতে এবং আমি ইন্দ্রের নিকটে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলাম।

২। আয়ুর্ব্বেদ পাঠে পুণ্যসঞ্চয় ও ইন্দ্রলোক প্রাপ্তি।

সুশ্রুত, স্বীয় গুরুপরম্পরার সমুল্লেখে বলিতেছেন ;——

"স্বয়ম্ভুবা প্রোক্তমিদং সনাতনং পঠেদ্ধি যঃ কাশীপতি প্রকাশিতম্।
স পুণ্যকর্ম্মা ভুবি পূজিতো নৃপৈরসুক্ষয়ে শক্রসলোকতাং ব্রজেৎ॥"

সনাতন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র প্রথমে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা প্রকাশ করেন, অনন্তর কাশীপতি ধন্বন্তরী পরম্পরাক্রমে তাহার প্রচার করেন। এই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র যিনি অধ্যয়ন করিবেন, সেই ব্যক্তির প্রভূত পুণ্য সঞ্চিত হইবে, তিনি রাজগণ কর্তৃক সুপূজিত হইবেন এবং নিজের দেহাবসানে পরলোকে ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইবেন। অন্যত্র দেখা যায় ;—

"সহোত্তরং হেতদধীত্য সর্ব্বং ব্রাহ্ম্যবিধানেন যথোদিতেন।
ন হীয়তেঽর্থান্মনসোঽভ্যুপেতাদেতদ্বচো ব্রাহ্ম্যমতীব সত্যম্॥"

ব্রহ্মা যেরূপ অধ্যয়ন বিধির প্রবর্তনা করিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি তাহা সম্যক্ পরিপালন পূর্ব্বক উত্তরতন্ত্র সহিত এই সমগ্র সুশ্রুত সংহিতা অধ্যয়ন করিবেন ; তিনি নিজ সাত্ত্বিকপ্রকৃতি অনুসারে যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহাই সুসম্পন্ন হইবে ;—কারণ এই গ্রন্থমধ্যে অভ্রান্ত সত্য ব্রহ্মার বাক্যসমূহই উপনিবদ্ধ হইয়াছে।

৩। দীক্ষাবিধি।

অধ্যয়ন বিধির ব্যবস্থা প্রসঙ্গেও আয়ুর্ব্বেদ সনাতন বেদোক্ত বিধিরই অনুসরণ করিয়াছেন। যথা ;—

"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যানামন্যতমং * * * ভিষক্ শিষ্যমুপনয়েৎ। * * * উপনয়নীয়স্তু ব্রাহ্মণঃ প্রশস্তেষু তিথিকরণ মুহূর্তনক্ষত্রেষু প্রশস্তায়াং দিশি,

শুচৌ সমে দেশে, চতুর্হস্তং চতুরস্রং স্থণ্ডিলমুপলিপ্য গোময়েন, দর্ভৈঃ সংস্তীর্য্য, পুষ্পৈর্লাজভক্তৈ রত্নৈশ্চ দেবতাঃ পূজয়িত্বা বিপ্রান্ ভিষজশ্চ তত্রোলিখ্যাভ্যুক্ষ্য চ দক্ষিণতো ব্রহ্মাণং স্থাপয়িত্বাগ্নিমুপসমাধায় * * * * হৌমিকেন বিধিনা-শ্রুবেণাজ্যাহুতী জুহুয়াৎ সপ্রণবাভির্মহাব্যাহৃতিভিস্ততঃ প্রতিদৈবতমৃষীংশ্চ স্বাহাকারঞ্চ কারয়েৎ।" * * *

ভিষক্, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকুলসম্ভূত যথোচিত গুণ সম্পন্ন শিষ্যকে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার জন্য দীক্ষা প্রদান করিবেন। কিন্তু স্বেচ্ছাচারে দীক্ষা প্রদান করা চলিবে না। অধ্যয়নার্থ শাস্ত্রোক্ত তিথি, করণ, মুহূর্ত্ত ও দিক প্রশস্ত হওয়া চাই। তাহার পরে বৈদিক বিধান অনুসারে যথোচিত স্থণ্ডিল, গোময়, দর্ভ, পুষ্প, লাজ, ভক্ত ও রত্ন প্রভৃতি দ্বারা দেবতা, ব্রাহ্মণ ও ভিষকের অর্চ্চনা করিতে হইবে। যথানিয়মে সমিধাদি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রণব উচ্চারণ করিয়া বেদোক্ত হোমক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

অধিকন্তু গুরু ও শিষ্য উভয়েই অগ্নিসাক্ষী পূর্ব্বক শপথ গ্রহণ করিবেন। শিষ্য, কাম ও ক্রোধাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সতত সত্যব্রত অবলম্বন করিবেন। দ্বিজ, গুরু, দরিদ্র, মিত্র, সন্ন্যাসী ও শরণাগত ব্যক্তিদিগকে নিজের ঔষধ দ্বারা নীরোগ করিবেন; কিন্তু পাপকার্য্যে রত ব্যক্তির রোগ প্রতীকার করিয়া, পাপ অনুষ্ঠানের সাহায্যকারী হইবেন না।

৪। অধ্যয়নের বিধি ও নিষেধ।

"কৃষ্ণেঽষ্টমী তন্নিধনেঽহনী দ্বে কৃষ্ণেতরেঽপ্যেবমহর্দ্দিসন্ধ্যম্।
অকাল বিদ্যুৎস্তনয়িত্নুঘোষে স্বতন্ত্ররাষ্ট্রক্ষিতিপব্যথাসু॥
শ্মশান যানাযতনাহবেষু মহোৎসবৌৎপাতিক দর্শনেষু।
নাধ্যেয়মন্যেষু চ যেষু বিপ্রানাধীয়তে নাশুচিনা চ নিত্যম্॥"

কৃষ্ণ বা শুক্ল উভয় পক্ষের অষ্টমী, পঞ্চদশী (অমাবস্যা বা পূর্ণিমা), ত্রয়োদশী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে, দিনের উভয় সন্ধ্যায়, অকাল বিদ্যুৎ উন্মেষে, অকাল মেঘ-গর্জ্জনে, পারিবারিক বিঘ্ন উপস্থিতে, রাজ্য বা রাজার বিপ্লবে, শ্মশান ভূমিতে, যানারোহণে, বধ্যভূমিতে, যুদ্ধ সংঘটিত হইলে; ইন্দ্র, কুবের, মদন ও কৌমুদী প্রভৃতি মহোৎসব ব্যাপারে, আকস্মিক ধূমকেতু বা উল্কাপাত প্রভৃতি উৎপাতে এবং অশুচি অবস্থায় অধ্যয়ন করা নিষিদ্ধ। অধিকন্তু অন্য যে সকল দিনে

ব্রাহ্মণগণ অধ্যয়ন করেন না, সে সকলও অনধ্যায় বলিয়া আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে পরিগণিত হইয়াছে।

৫। রক্ষা কর্ম্ম।

সুশ্রুতে রোগীর রক্ষাবিধানের জন্য যে শ্লোকগুলি উপনিবদ্ধ দেখা যায়, তৎপাঠেও ইহার দৃঢ়প্রতীতি হয়। প্রাচীনকালে কোন কার্য্যই ধর্ম্মের ছায়া বর্জ্জিত হইয়া অনুষ্ঠিত হইত না। আর্য্যগণ প্রত্যেক বিষয়েই ধর্ম্মের সংশ্রব রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা এক ব্রহ্ম দ্বারাই এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল পরিব্যাপ্ত দেখিয়াছেন এবং সেই ব্রহ্মের বিভিন্ন শক্তিকে দেবতাবিশেষরূপে পরিগণিত করিয়া, পৃথক পৃথক কার্য্যের সম্পাদক বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন ;— বাস্তবিক কিন্তু নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় শক্তিসমূহে সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের পূর্ণসত্তার স্ফুরণ তাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়া গিয়াছেন।

প্রাচীন যুগে চিকিৎসকের কর্ত্তব্য সাধারণ—নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ব্যবসায় মাত্রে পরিণত ছিল না। রোগ যন্ত্রণায় পরিপীড়িত মুহ্যমান ব্যক্তিকে চিকিৎসক পিতার ন্যায় এই সকল বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা আশ্বস্ত করিয়া তাহার রোগের দুর্ব্বিসহ ক্লেশসকল বিদূরিত করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। সেকালে চিকিৎসক কেবল রোগের ব্যবস্থা করিয়াই নিজে রোগীর সকল দায় হইতে পরিমুক্ত হইলেন, এইরূপ ভাবিতেন না ;—অধিকন্তু যাঁহাতে সকলের অস্তিত্ব সেই পরম ব্রহ্ম পরমেশ্বরের প্রত্যেক সদ্ভাব প্রতি রোগীর প্রকৃত শ্রদ্ধা উৎপাদন পূর্ব্বক ব্যাধিতের দৈহিক ও মানসিক উভয় প্রকার বলেরই পরিবর্দ্ধনে প্রয়াস পাইতেন। এই অমৃত কল্প আর্ষবিধানের অমোঘ ফলে, ঈশ্বরের প্রতি আত্মসমর্পণ করিয়া সম্পূর্ণ সত্ত্বগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক বাস্তবিক পক্ষে রোগপরিক্লিষ্ট ব্যক্তিও আশাতিরিক্ত ফল প্রাপ্ত হইতেন। ঈশ্বর আত্মসমর্পণ করিয়া, সদ্যঃ সদ্যই তাঁহার ব্যাধির ভীষণ আক্রমণ বিদূরিত হইয়া যাইত! উত্তর কালেও চিকিৎসকমণ্ডলী এই বৈদিক রক্ষা মন্ত্র দ্বারা পীড়িত ব্যক্তির ব্যাধির নিবারণে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। অধুনা যেন ধর্ম্মের সহিত মানবের সকল বন্ধনই পরিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে! সর্ব্বত্রই ঐহিক তামসিক স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপারই পরিলক্ষিত হয়! ধর্ম্মপথ সুদূরে অপসারিত হইয়াছে!

দেবচক্ষুর অন্তরালেও কত শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

স্ব স্ব প্রকৃতিবশে সেই সেই শক্তিনিচয়ই দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস বা পিশাচ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। দেব প্রকৃতি ক্রূর আচরণ সম্পন্ন নহেন, তাঁহাদের হইতে জীবগণের মঙ্গলই সাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু দানব, যক্ষ, রাক্ষস বা পিশাচ প্রভৃতি ক্রূর ও হিংসাপরায়ণ; সুতরাং লোক চক্ষুর অগোচরে ইহাদের দ্বারা জীবগণের নানারূপ অকল্যাণ সংঘটিত হইয়া থাকে, এই জন্যই সেই সকলের নিবারণ ব্যপদেশে সেই প্রাচীন বৈদিক যুগে এইরূপ রক্ষা বিধানের অনুষ্ঠান। রক্ষামন্ত্রের তাৎপর্য্য মাত্র এস্থলে প্রদত্ত হইল।

"আভিচারিক প্রতিঘাত বা রাক্ষস প্রভৃতির ভয় হইতে তোমার রক্ষা কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছি; ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সেই রক্ষা কর্ম্ম অনুমোদিত হউক।

নাগ, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব, পিতৃগণ, যক্ষ বা রাক্ষস যাঁহারা তোমার প্রতি আক্রমণ করিতে পারেন, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ তোমার সেই আপদ বিনাশ করুন।

পৃথিবীতে, অন্তরীক্ষে, দিকসকলে বা বাস্তুগৃহে যে সকল নিশাচর বাস করেন, তাঁহাদিগকে নমস্কার করিতেছি, তাঁহারা সকলেই প্রসন্ন হইয়া তোমাকে রক্ষা করুন।

ব্রহ্মর্ষিগণ, দেবর্ষিগণ, রাজর্ষিগণ, পর্ব্বত, নদী ও সাগর সকল তোমাকে রক্ষা করুন।

অগ্নি জিহ্বা, বায়ু প্রাণ, সোম ব্যান, পর্জ্জন্য অপান, বিদ্যুৎ উদান, মেঘ সমান, বলপতি ইন্দ্র বল, মনু মন্যাদ্বয় ও মতি, গন্ধর্ব্বগণ কাম, রাজা বরুণ প্রস্রা, সমুদ্র নাভিমণ্ডল, সূর্য্য চক্ষু, দিক সকল শ্রবণেন্দ্রিয়, চন্দ্র মন, নক্ষত্রগণ রূপ, রাত্রি ছায়া, জল রেতঃ ওষধিসকল রোমাবলি, পৃথিবী শরীর, বৈশ্বানর শিরঃ, বিষ্ণু পরাক্রম, পুরুষশ্রেষ্ঠ (নারায়ণ) পৌরুষ, ব্রহ্মা আত্মা এবং ধ্রুব ভ্রুদ্বয় রক্ষা করুন।

যে সকল দেবতার নাম উল্লেখ করা গেল, সেই সমুদয় দেবতাই তোমার শরীরে নিত্য অবস্থান করিয়া থাকেন। * ইঁহারা সকলেই তোমাকে পালন করুন এবং তুমি দীর্ঘায়ু লাভ কর।

---

* বিশ্বরূপ বিষ্ণুর অবয়বীভূত কোন্ দেবতা কোন্ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতারূপে দেহের পালন করিয়া থাকেন, সুশ্রুতে তাহা এইরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে;—

"অথ বুদ্ধেব্রহ্মা। অহঙ্কারস্যেশ্বরঃ। মনসশ্চন্দ্রমাঃ। দিশঃ শ্রোত্রস্য। ত্বচো বায়ু। সূর্য্যশ্চক্ষুষোঃ। রসনস্যাপঃ। পৃথ্বী ঘ্রাণস্য। বচোহগ্নিঃ। হস্তয়োরিন্দ্রঃ। পাদয়োর্বিষ্ণুঃ। পায়োর্মিত্রং। প্রজাপতিরুপস্থস্যেতি।"

ভগবান ব্রহ্মা, চন্দ্র, সূর্য্য, নারদ, পর্ব্বত, অগ্নি, বায়ু ও মহেন্দ্রাদি দেবগণ তোমার মঙ্গল করুন।

পিতামহ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক যে রক্ষাবিধান জীবগণের মঙ্গল সাধন জন্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তোমার আরোগ্য লাভার্থ সেই রক্ষাকর্ম্ম কৃত হইল। অতএব তোমার মঙ্গল হউক, তোমার আয়ুঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক, তোমার সকল প্রকার বাধা ও বিঘ্ন দূরীভূত হউক এবং তুমি সতত বাধাশূন্য হইয়া থাক।

বেদাত্মক মন্ত্র দ্বারা তোমার রক্ষা বিধান অনুষ্ঠিত হইল, ইহা দ্বারা কোনরূপ অভিচার বা ব্যাধি হইতে তোমার কোন ভয় নাই নিশ্চয় জানিবে। আমি তোমার যে রক্ষা বিধান করিলাম, ইহা হইতে তুমি দীর্ঘায়ুঃ প্রাপ্ত হও।

ক্রমশঃ—

কবিরাজ—শ্রীমথুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি।
১৭নং লক্ষ্মী দত্তের লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

পল্লী-চিকিৎসক।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সুপ্রসব।

সু—ঠাকুর্দ্দা, দেখ, পুরুষ মাত্রকেই প্রতিনিয়ত নানাপ্রকার দুঃখ কষ্টের সহিত সংগ্রাম পূর্ব্বক এই সংসারে চলিতে হয় সত্য কিন্তু আমাদের রমণীদিগকে যদিও ঘরের বাহির হইতে হয় না, তথাপি প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী এক মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। প্রসবকালে রমণীমাত্রকেই জীবন মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইতে হয়।

হ—তাইত কথায় বলে "পুরুষের দশদশা আর মেয়েদের একদশা।" তা' আপনি কি বলিতে চাহেন?

ব্রহ্মা বুদ্ধির, ঈশ্বর অহঙ্কারের, চন্দ্র মনের, দিকসকল শ্রবণেন্দ্রিয়ের, বায়ু ত্বকের, সূর্য্য চক্ষুরিন্দ্রিয়ের, সলিল রসনেন্দ্রিয়ের, পৃথিবী ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের, মিত্রদেবতা গুহ্যের এবং প্রজাপতি উপস্থেন্দ্রিয়ের অধিপতি।

বেদান্তাদি অন্যান্য শাস্ত্রেও এইরূপ ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠাতৃ দেবগণের বর্ণনার উল্লেখ আছে।

সু—প্রসব সম্বন্ধেই আজ কিছু বল।

হ—দেখুন, যে সব স্ত্রীলোক কায়িক শ্রম দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে, প্রসবকালে সাধারণতঃ তাহাদিগকে অধিক কষ্ট ভোগ করিতে হয় না; আর যাহারা কায়িক পরিশ্রমকে ঘৃণাভরে উপেক্ষা করতঃ পরহস্তে গৃহকর্ম্মের ভার ন্যস্ত করিয়া অলসভাবে শুইয়া বসিয়া বা গল্প গুজবে কাল কর্ত্তন করে, প্রসব কালে তাহাদিগকেই সচরাচর অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়; আলস্যপ্রযুক্ত শরীরে জল সঞ্চিত হইয়া পদাদিতে শোথ দেখা দেয়।

সাধারণ গৃহস্থের ঘরে প্রসবার্থ চিকিৎসক ডাকিবার বিশেষ প্রয়োজন হয় না, কিন্তু তথাকথিত শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ঘরের রমণীদের গৃহকর্ম্মে আস্থা নাই বলিয়াই অধিকাংশ স্থলে চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় এবং প্রসব কালে তাঁহাদিগকে অশেষবিধ কষ্টভোগ করিতে হয়, কাহাকে কাহাকেও বা কালের ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়।

সু—কু'ড়ের বিপদ দেখ্‌ছি পদে পদে।

হ—এই যে "বাঙ্গালীর ঢেঁকি বেঁচে থাক্‌" এই কথা বড়ই মূল্যবান্‌। পল্লী-গ্রামে ঢেঁকি নাই, এমন গৃহস্থ দেখা যায় না; ঢেঁকি ব্যতিরেকে রমণীদের এক-দিনও চলে না; ফলতঃ উহার চালনা দ্বারা বিশেষরূপ কায়িক পরিশ্রম হইয়া থাকে।

ঢেঁকি প্রসব কার্য্যে কতদূর সহায়তা করিতে পারে সে সম্বন্ধে আপনাকে একটী দৃষ্টান্ত দেখাই। ঐ ঘোষদের বাড়ীর "গিন্নি ঠাইন" প্রসবকালে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িতেন, আহা! তাঁর দিবসব্যাপি কি ভীষণ কষ্টই না এক একবার তাঁহাকে ভোগ করিতে হইত!

ইনি যখন বধূরূপে ছিলেন, তখন বড়ই আদুরে ছিলেন; কাজেই গর্ব্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইলেই পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তিরা তাঁহাকে আর গৃহস্থালী কর্ম্মে হাত দিতে দিতেন না, অতএব তিনি একরূপ খাইয়া শুইয়া বসিয়াই দিন কাটাইতেন। গর্ব্ভের ৮ম মাসেই শোথ দেখা দিত, চলিবার শক্তি থাকিত না। অতঃপর প্রসব না হওয়া পর্য্যন্ত যে কি দুঃসহ কষ্টে চলচ্ছক্তিহীন দেহ ভার বহন পূর্ব্বক দিন পাত করিতেন তাহা বর্ণনাতীত।

একবার যখন ইনি ৬।৭ মাসের গর্ব্ভবতী, তখন আমার খোঁজ পড়িল। আমি সকল ব্যাপার বুঝিয়া লইয়া ব্যবস্থা করিলাম যে ইনি অদ্যাবধি প্রসবের

পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রত্যহ ঢেঁকিতে উঠিয়া অন্ততঃ ২০।২৫টী 'পাড়' * দিবেন—ইহাই এই বিপন্মুক্তির সহজ পথ। কি বলিব দাদা, সকলেই আমার এ মন্তব্যে তুমুল আপত্তি উত্থাপন করিলেন, কেহ কেহবা বিদ্রূপের হাসি হাসিলেন, কেহবা ভ্রুভঙ্গী করিলেন। আমি দৃঢ়তার সহিত বলিলাম যে আপনারা যাহাই কেন না বলুন, যতই কেন শ্লেষপূর্ব্বক আমার কথা উপেক্ষা না করুন, জানিবেন এ রোগের ইহাই একমাত্র অমোঘ ঔষধ।

সু—তারপর কি হইল ঠাকুদ্দা ?

হ—আমার কথা বলিয়া আমি চলিয়া আসিলাম।

সু—তারপর ?

হ—আত্মীয় স্বজনের নানাপ্রকার আপত্তি সত্বেও ইনি অবশ্যম্ভাবী বিপন্মুক্তির আশ্বাসে আশান্বিত হইয়া আমার কথামত ঢেঁকি চালনায় নিযুক্ত থাকিলেন। ফলে দেখা গেল—এযাত্রা তেমন শোথ আসিল না, কাজেই চলিতে ফিরিতেও বিশেষ কষ্ট বোধ করিলেন না এবং যথাসময়ে সামান্য আয়াসেই প্রসব হইয়া গেল। এই নিয়ম অনুসরণ করায় ইনি আর ঐরূপ ভয়ঙ্কর কষ্ট পান নাই। শেষে অনেকেই উহার উপকারিতা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

সু—কোনও ঔষধপত্র বলিবে না ?

হ—বলিব বই কি। তবে উহা বলিবার পূর্ব্বে আপনাকে সতর্ক করিয়া দিই যে, প্রসব হওয়া মাত্রই তন্মুহূর্ত্তে যেন প্রসূতির গা' হইতে ঔষধ খুলিয়া লওয়া হয়; অন্যথা ঐ ঔষধের শক্তিপ্রভাবে প্রসূতির জরায়ু পর্য্যন্ত বাহির হইয়া পড়িতে পারে।

সু—এমন একটী কথা নিশ্চয় মনে থাকিবে।

হ—প্রসূতীর চুলে পুষ্করিণীর বড় পানার শিকড় বাঁধিয়া দিলে বিনা কষ্টে প্রসব হয়।

আটালে গাছের একটী শিকড় গর্ভিণীর চুলের সঙ্গে বাঁধিয়া দিলে প্রসবের কালে অধিক কষ্ট ভোগ বা কোনও বিপদ হয় না।

আফুলা (যেগাছে এখনও ফুল বা ফল হয় নাই) দেশী কুলের (বরইর) শিকড় নিশ্বাস বন্ধ করিয়া তুলিয়া অবিবাহিতা কন্যার দ্বারা গর্ভবতীর কেশে

* 'পাড়'—ঢেঁকিতে পদচালনা করার বিশেষ গ্রাম্য নাম।

বান্ধিয়া দেওয়াইবেন এবং ঔষধটী বাঁধা শেষ হওয়া মাত্রই উক্ত কন্যাটী তথা হইতে দৌড়িয়া চলিয়া আসিবে। ইহাতেও সহজে প্রসব হয়।

সহদেবীর মূল কটিদেশে ধারণ করিলেও প্রসব হয়।

লজ্জাবতীর মূল কটিদেশে বন্ধন করিলে গর্ব্বিণী সুখে প্রসব করিতে পারে।

বাসক গাছের উত্তর দিকস্থ শিকড় উঠাইয়া ৭ সাত গাছি রক্ত সূত্র দ্বারা বাঁধিয়া প্রসূতীর মস্তকে বাঁধিয়া দিবে। অবিবাহিতা মেয়ের দ্বারা একাজ করাইতে হয়।

তিন চারি অঙ্গুলি পরিমিত আয়াপানের শিকড় কাটিয়া স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করাইলে অতি অল্প পরেই প্রসব হয়,—প্রবিষ্ট করাইতে যেন তথায় কোন আঘাত না লাগে।

পূর্ব্ব মুখ হইয়া শ্বাস বন্ধ করিয়া একটী চারা আমগাছ টানিয়া তুলিতে হয় এবং উহার মূলটী গ্রহণ করিয়া প্রসূতীর চুলে এমনভাবে বাঁধিয়া দিবেন যেন তাঁহার নাক পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়ে ও প্রসূতী উহার গন্ধ গ্রহণ করিতে পারে। কেহ কেহ বা উলঙ্গ হইয়া শরীরে কোনও প্রকার বন্ধন না রাখিয়া পূর্ব্বমুখ হইয়া শ্বাস বন্ধ করতঃ উহা তুলিয়া থাকে। এই ঔষধটী সহজ লভ্য; উক্ত ঔষধ তুলিবার মনন করিয়া যদি তল্লাসে পাইতে গৌণ হয় তবে বুঝিতে হইবে প্রসবে বিলম্ব আছে। ঔষধ তুলিবার সময় যদি বিশেষ বল প্রকাশ করিতে হয় তবেও বুঝিবেন যে প্রসবে বিলম্ব আছে। যদি তুলিবার কালে মাঝামাঝি বা তদূর্দ্ধে ছিন্ন হইয়া যায়, তবে সন্তানের জীবিতকাল অল্প বলিয়া মনে করিবেন। এই ঔষধে অতি সহজে প্রসব হয়।

উজতের মুল মাথায় বাঁধিয়া দিলে শীঘ্রই বিনাকষ্টে প্রসব হয়।

চারা কাঁঠাল বৃক্ষের শিকড় গর্ব্বিণীর মস্তকোপরি বান্ধিয়া দিলে সহজে প্রসব হয়।

তেঁতুলের নূতন চারা বিচি সমেত উঠাইয়া গর্ভিণীর কেশে বান্ধিয়া দিবেন, যেন নাসিকা পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়ে। ইহাতে অচিরেই প্রসব হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীগোপীনাথ দত্ত, [illegible]ক।
রাজাবাড়ী, ঢাকা।

আয়ুর্ব্বেদের বর্ত্তমান অবস্থা।

অধুনা "আয়ুর্ব্বেদ" যেন ব্রহ্মডাঙ্গার কুলগাছ—যিনি ইচ্ছা করিতেছেন, তিনিই নাড়া দিতেছেন; অথবা স্বর্গচ্যুতা কামধেনু—যিনি ইচ্ছা তিনিই দোহন করিতেছেন। দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলনের ফলে আয়ুর্ব্বেদের যতটা উন্নতি হইবে আশা করা গিয়াছিল, কাজে তাহা হয় নাই; এখনও বঙ্গের ঘরে ঘরে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধাদির তাদৃশ আদর হয় নাই, এখনও দেশবাসী প্রকৃত কবিরাজ গণের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে শিখেন নাই, এখনও প্রতি মন্দিরে আয়ুর্ব্বেদের বিজয় দুন্দুভি বাজিয়া উঠে নাই, এখনও লোকে বুঝিতে পারে নাই যে অস্মদ্দেশীয় আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধগুলি পাশ্চাত্য ঔষধাবলী অপেক্ষা কত অধিক কার্য্যকরী ও গুণশালী। ক্রমাগত বিজাতীয় ঔষধাবলী সেবনে যাহাদের জিহ্বা পচিয়া উঠিয়াছে—প্লীহায় টান ধরিয়াছে, যকৃতে প্রদাহ উপস্থিত হইয়াছে তাহা-রাও আয়ুর্ব্বেদের কল্যাণে রোগমুক্ত হইতেছে, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে কতিপয় অবান্তর কারণে দেশের লোকে ক্রমে ২ আয়ুর্ব্বেদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইতেছে। কতকগুলি ইতর শ্রেণীর লোক বিজ্ঞাপন ঢক্কা নিনাদিত করিয়া তাহাদের প্রস্তুত পেটেণ্ট ঔষধগুলি আয়ুর্ব্বেদীয় বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিতেছে। পিসিমাতার পেঁটরা ভাঙ্গিয়া তল্লব্ধ অর্থে অনেকে দীর্ঘকালব্যাপী বিজ্ঞাপন সংবাদপত্র স্তম্ভে প্রকাশ করত, লাভবান হইতেছে। মফঃস্বলবাসিগণ বিজ্ঞাপনের কুহকে মজিয়া ঐ সকল ছাই ভস্ম ঔষধ সেবনে কোন ফললাভ না করিয়া মনে করিতেছে "আয়ুর্ব্বেদ" জাহান্নমে যাউক। যাহারা "আয়ুর্ব্বেদ" শব্দের অর্থ বুঝে না, তাহারাও পেটের দায়ে যথাতথা আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয় খুলিয়া আসস্যাওড়ার পাতা ছেঁচিতে বসিয়া গিয়াছে; অনেকে ভ্যারেণ্ডাও ভাজিতেছে আবার অনেকে মাঝে ২ বেশ দাঁও মারিয়া আরও সজোরে বিজ্ঞাপন বৈজয়ন্তী উড়াইয়া বলিতেছে—মাভৈঃ!! টোট্কা পট্কা, মাদুলী, তাগা প্রভৃতির বিজ্ঞাপনেও দেশ ছাইয়া গিয়াছে। দেশে চাকুরীর অভাব—কাজেই অন্ন সংস্থান কল্পে অনেকেই আয়ুর্ব্বেদের আদ্যশ্রাদ্ধ করিতে উদ্যত। সকলেই মনে করিতেছে আয়ুর্ব্বেদের প্রসার ও ব

দ্রুতগতি বাড়িতেছে; কিন্তু ইহার মূলে যে কুঠারাঘাত করা হইতেছে তাহা কেহ বুঝিতেছে না। যাঁহারা প্রকৃত আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত করিতে জানেন, তাঁহারা দেখিতেছেন প্রতিযোগীতা ক্ষেত্রে হাতুড়িয়াগণের পেটেণ্ট ঔষধের প্রচলনও বেশী এবং সেরূপ স্বল্পমূল্যে মূল্যবান শাস্ত্রীয় ঔষধাবলী প্রস্তুত করাও অসম্ভব—কাজেই তাঁহারা দেশের হাওয়া ফিরিবার আশায় স্থাণুবৎ নিশ্চল !! দেশের লোকের মতিগতিও তথৈবচ। সামান্য দুইটী টাকা বার্ষিক ব্যয়ে অসংখ্য মুষ্টিযোগ, বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বলিত 'আয়ুর্ব্বেদবিকাশের' গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইলে ঘরে বসিয়া রোগমুক্ত হইবেন ইহা ভাবিবারও অবকাশ হয়না কিন্তু গৃহিণীর সামান্য মাথা ধরিলে তৎক্ষণাৎ ডাক্তার বাবুকে নগদ দর্শনী ৪৲ টাকা অনায়াসেই দিতে পারেন !! হায় ভাগ্য ! বিলাতের ডাক্তার যদি বলেন, বাঙ্গালী কাঁচ কলা খাইলে বলশালী হইবে, তৎক্ষণাৎ দেখিবে বঙ্গের যাবতীয় কদলী বৃক্ষ উৎপাটিত—কিন্তু হে বঙ্গের কবিরাজমণ্ডলি—আপনাদের সহস্র চীৎকারেও কেহ আয়ুর্ব্বেদের প্রতি ফিরিয়া চাহিবে না। হাতুড়ে গোবৈদ্যগণ আয়ুর্ব্বেদের নামে বেশ দু পয়সার সংস্থান করিতেছে, অথচ প্রকৃত আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধাবলীর তাদৃশ প্রচলন হইতেছে না এ দুঃখ রাখিবার স্থান কোথায়? ডাক্তার বাবুদের মত যদি কবিরাজ মহাশয়েরা পকেটে ষ্টেথেস্কোপ, থার্ম্মোমিটার প্রভৃতি লইয়া গাড়ী চড়িয়া দৌড়াদৌড়ি করিতে পারেন, তবে বোধ হয় কতকটা সফলকাম হওয়া সম্ভব। গাছগাছড়া ছেচা, সিদ্ধ করা, অনুপানাদির যোগাড় করা এ সকল কার্য্যের ভারও যদি কবিরাজ মহাশয়েরা লন, তাহলেও কতক লোক আকৃষ্ট হইতে পারে আর যে সকল নীচমনা অর্থশালী হাতুড়িয়া দেশ বিদেশে বিজ্ঞান ছড়াইয়া বিষতুল্য পেটেণ্ট ঔষধে দেশের লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করে, তথাপ্রকৃত 'আয়ুর্ব্বেদের' বিলোপ সাধন প্রয়াসী, তাহাদিগকে উপযুক্তরূপে শিক্ষাদান করিতে পারেন, এরূপ শক্তিশালী ব্যক্তি এদেশে নাই কি?

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
২২ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেহের কথা।

(প্রাপ্ত)

যখনই দেখি কোনও ডাক্তার বক্ষঃস্থলে ষ্টেথেসকোপ বা বগলে থার্ম্মোমিটার বসাইয়াছেন, তখনই মনে হয় যেন কাঁচপোকায় তেলাপোকা ধরিয়াছে। বক্ষঃস্পন্দন ও শারীরিক উত্তাপ কমাইতে বাড়াইতে প্রকৃতি ব্যতীত অন্য কাহারও সাধ্য আছে কিনা, রোগী কি তাহা ভাবিতে পারে? ডাক্তারের হাতে টাকা গুঁজিয়া দিয়াই রোগী মনে করে "নিরাময় হইলাম।" কিন্তু হায়, এই ভবসংসারের ভোজের বাজী কেহই বুঝিবে না—যখন ডাক্তার বাবুর তলব পড়িবে—হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বিলুপ্ত হইবে তখন শত শত যন্ত্রপাতী বিকল, নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিবে—কেহই সাড়া দিবে না—কোনও মিক্শ্চারই ডাকিলে কথা কহিবে না। মৃত্যুরহস্য এমনই বিচিত্র—দেহের কার্য্যকারণ প্রণালী এমনই দুর্জ্ঞেয়—মানব সহস্র মেটিরিয়া মেডিকা, থেরাপিউটিক্সে তাহার সন্ধান পাইবে না। ওলাউঠায় সকল রোগী মরে না—আবার তিন ঘণ্টার জ্বরেও অনেকে পঞ্চত্ব লাভ করে—যে বাঁচে, সে ডাক্তারকে ধন্যবাদ দেয়, তাঁহার পাতে প্রসাদ খায়, আর যে মরে সে হাড় জুড়ায়—তাহার আত্মীয় স্বজন মনে করে, তাহার পরমায়ু ছিল না তাই মরিয়া গেল। এদিকে পরমায়ুও মানিবে আবার ডাক্তারও ডাকিবে। বলি, ডাক্তারের ঔষধালয়ে কি পরমায়ু বিক্রয় হয়? ঔষধে ক্ষণিক যাতনা কমায়—রোগ কিন্তু ভোগের শেষ হইলে আপনিই সারিয়া যায়, এ কথা কেহ বিশ্বাস করিবে কি? মরণের রোগ হইলে বাঁচায় কাহার সাধ্য? সে সাধ্য থাকিলে ডাক্তারেরা জীবনের গ্যারাণ্টি দিতেন—প্রথমে রোগ আরাম করিয়া পরে টাকা লইতেন—ভিজিট ও গাড়ীভাড়ার প্রাথমিক জুলুম থাকিত না। ডাক্তার বাবু 'ভয় নাই' বলিয়া অভয় দিলেও অনেক স্থলে রোগী ৩।৪ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয় কেন?

অনেক জ্যোতিষী অপরের শুভাশুভ, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান অবস্থাদি গাটিতে খড়ি পাতিয়া বলিয়া দিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা 'বুকে হাত দিয়া' বলিতে পারেন কি যে কোন্ সময়ে তাঁহাদের মৃত্যু হইবে? তাহা যদি নিশ্চয় জানিতে পারিতেন বা বিশ্বাস করিতেন তাহা হইলে অপরের নিকট বুজরুকী দেখাইতে

কখনই তাঁহারা অগ্রসর হইতেন না। এ জগতে সকলেই অর্থের দাস; অর্থ লাভাশায় কত জনে কত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নিরন্তর অভিনয়ে নিযুক্ত, তাহা ভাবিয়া দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। দেহখানা কি প্রথমে তাহাই দেখ; রক্ত মাংস, অস্থি, মেদাদির কথা ছাড়িয়া দিয়া মূত্র ও পূরীষের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর—দেহের প্রতি একটা ঘৃণা জন্মিয়া যাইবে। যিনি বহুমূত্র রোগাক্রান্ত, বারংবার প্রস্রাব ত্যাগের সঙ্গে ২ শারীরিক বলের হ্রাস হইতেছে বুঝিতে পারিবেন। মূত্রত্যাগান্তে গাত্রোত্থান করিতে হাঁপ ধরিবে—সর্ব্বাঙ্গ ঝিম্ ২ করিবে—পুনঃ ২ পিপাসায় প্রাণ আকুল হইবে—বরফ পানেও সম্যক তৃপ্তিলাভ ঘটিবে না—মনে হইবে যেন যাহা কিছু খাইতেছেন সমস্তই জল হইয়া যাইতেছে। ক্রিমি রোগাক্রান্ত ব্যক্তির উদর মধ্যে অসংখ্য কীটের সমাবেশ, পূরীষ সহ সময়ে ২ কীট নির্গমন—গাত্র কণ্ডূয়ন প্রভৃতি মনে হইলে শরীর রোমাঞ্চিত হয় না কি? এখন বল দেখি ভাই, এই যে নষ্ট দুষ্ট দেহ—ইহাকে সুস্থ রাখিবার উপায় কি? অত্যধিক মিষ্ট রস সেবনে দেহে কীটের জন্ম হয় বটে কিন্তু আমাদের দেহে স্বভাবতঃই অসংখ্য কীট বাস করিতেছে তাহা কেহ বিশ্বাস করেন কি? সে সকল কীট চর্ম্মচক্ষুর অগোচর—অণুবীক্ষণেও দেখা যায় না, অথচ তাহারা আমাদের দেহের প্রতি লোমকূপের চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ধরিতে গেলে আমাদের গাত্রত্বকের নিম্নেই উহাদের সমাবেশ—পরে মাংস-পেশীর অভ্যন্তরে অসংখ্য শিরার রক্ত সঞ্চালন কার্য্য চলিতেছে। কি অদ্ভুত নিয়মে ভুক্ত দ্রব্যাদি উদর গহ্বরে পরিপাক হইয়া খাদ্যদ্রব্যাদির অসার অংশ মূত্র, পূরীষ ও ঘর্ম্মরূপে বাহির হইয়া যাইতেছে ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। নিশ্বাস প্রশ্বাসাদি কার্য্য এখন যে ভাবে চলিতেছে, বরাবরই যদি সে ভাবে চলিত, পরিপাক ক্রিয়াদির কোনও বৈলক্ষণ্য না ঘটিত তবে জরা মৃত্যু আমা-দিগকে স্পর্শ করিতে পারিত না এরূপ একটা ভাব মনোমধ্যে স্বতঃই উদয় হয়। কিন্তু তাহা হইবার যো কি? দেহতো নিত্য বস্তু নহে যে নিত্যই সমভাবে রহিবে। এ যে পঞ্চভৌতিক—অপরূপ—নির্দ্দিষ্ট কালব্যাপী ক্রিয়া-শালী স্পঞ্জ সদৃশ আধার মাত্র! এই আধার মধ্যে শক্তির নিরন্তর আকর্ষণ বিকর্ষণ চলিতেছে। প্রকৃতি একদিকে পালনকর্ত্রী অন্যদিকে সংহারকর্ত্রী। এই জগৎরহস্য নিগূঢ়ভাবে আলোচনা করিলে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবে—

প্রকৃতির সহিত সখ্যতা বা শত্রুতা যাহাই কর—দেহের উপর তোমার আধিপত্য আদৌ নাই। বেশ সুস্থ আছ, হঠাৎ হাড় মোড়া দিয়া কম্প জ্বর আসিল, ঘাড় মোড়া দিয়া তোমাকে বিছানায় শোওয়াইল—আবল তাবল বকাইল, হয়ত খানিক বমি করাইল, নয়ত দাস্ত খোলসা হইয়া জ্বর ছাড়িল—আবার আসিল—আবার ছাড়িল—ক্রমে ২ অস্থি চর্ম্মসার করাইয়া তোমাকে জীবিত রাখা বা না রাখা যে প্রকৃতিরই প্রকৃত বিধান ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত করিবে। যদি বল মিক্শ্চার প্রভৃতি ডাক্তারী ঔষধে জ্বর ছাড়িয়া যায় তদুত্তরে বলি ঐরূপ বিশ্বাস না থাকিলে জ্বরও ছাড়িত না। ২।৩টী উপবাসেও জ্বর ছাড়ে—৭।৮টা লেপ গায় দিয়া ঘাম ছুটাইলেও জ্বর ছাড়ে—গরম ২ চা পান করিলেও অনেকের জ্বর ছাড়িয়া যায়—সামান্য ২ মুষ্টিযোগ ব্যবহারেও জ্বর ছাড়ে—ডাকঘরের কুইনাইন তো জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ বলিয়া ঘোষিত—তা ছাড়া কতই তিক্ত বটিকা—পাঁচন-কষায় টনিক প্রভৃতি বাজারে প্রচলিত—তবে তিন ঘণ্টার জ্বরে মানুষ মরে কেন? অনেক স্থলে ডাক্তার না আসিতেই রোগী পটল তুলে কেন? অসংখ্য প্রকারের রোগ এই ভব সংসারে প্রতিনিয়ত আমাদের অনুসরণ করিতেছে—যতদিন আমাদের পরমায়ু আছে অর্থাৎ যে কাল পর্য্যন্ত ধূলা খেলা খেলিব বলিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সেই ভোগ কাল পূর্ণ না হইলে কেহই মরিব না—মরিতেই পারিব না। অনেক অশীতিপর বৃদ্ধা প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াও বাঁচিয়া আছে—কত শীত, কত বর্ষা তাহাদের মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে—তাহাদের একটুও সর্দ্দিবোধ হয় না—মৃত্যু তো পরের কথা। সময়ে সময়ে তাহারা মনে ২ বলে—হে যম, আমাকে কি ভুলিয়া আছ? অনশনে বা অর্দ্ধাশনে থাকিয়াও অনেকে মরে না, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

এখন বুঝিতে পারিয়াছ কি যে দেহ তোমার বলিয়া ভাবিতেছ প্রকৃত পক্ষে তাহা তোমার নহে। উহা নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে কোন্ অদৃশ্য শক্তির নির্দ্দয় কশাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে! শত চেষ্টায় বহু উদ্যম, পরিশ্রমেও চির-দিনের জন্য তোমার ঐ আশ্চর্য্য দেহখানি অবিচলিত ভাবে পরিচালিত রাখিতে পারিবে না। যত দিন জীবিত থাকিবে, পরম সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করবার পক্ষে যতটুকু ধৈর্য্যাবলম্বন করা—পরিশ্রম করা আবশ্যক বুঝিবে

তাহাই করিবে। সাংসারিক কোনও দ্রব্যে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইবে না, কোনও দ্রব্য "আমার" বলিয়া মনে করিবে না। মায়া যত কমাইতে পার তাহার চেষ্টা করিবে। দেহ বা মনকে অকারণে প্রপীড়িত করিবে না; 'হায়! আমি মরিয়া যাইব' এরূপ দুশ্চিন্তাও মনোমধ্যে ধারণ করিবে না। সর্ব্বদা মুক্তহস্ত হইবে, পরের দুঃখে সহানুভূতি দেখাইবে—যতটুকু সাধ্য সাহায্য করিবে এবং এই বিশ্বের সৃজন কর্ত্তা যে কেহ আছেন, সর্ব্বদা মনে ২ তাঁহার নিকঠ প্রার্থনা করিবে। আসুক মৃত্যু, আসুক জরা ও বার্দ্ধক্য—আসুক শত সহস্র বিপদ—দেহ যখন তোমার নহে, তুমি যখন তোমার নহ—তখন ভয় কি ভাই? আমরা যাঁহার সৃষ্ট জীব—তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে—বৃথা চিন্তায় ফল কি?

তবে কি আমাদের রোগ হইলে তৎপ্রতিবিধানার্থে চেষ্টা করিব না? যে আশ্চর্য্য নবদ্বার বিশিষ্ট দেহরূপ গৃহে আমরা বাস করিতেছি,তাহার জীর্ণসংস্কার আবশ্যক হইলে অবশ্যই করিতে হইবে—ফলাফল সর্ব্বনিয়ন্তার ইচ্ছার উপরে ন্যস্ত। তবে কথা এই যে রোগ হইলেই কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পরের হাতে প্রাণটী দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা অপেক্ষা স্ববিবেকানুমোদিত পথে চলাই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে হয়। সামান্য জ্বরে ডাক্তার না ডাকিয়া প্রবল উত্তাপ দ্বারা ঘর্ম্ম নিঃসারণ—২।১টী উপবাস—পল্‌তা নিম্ব প্রভৃতির তিক্ত রস সেবন—কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে সোণামুখীর জোলাপ, কিশমিশের পায়স—সুপক্ক পেঁপে, গরম দুগ্ধের ব্যবহার ইত্যাদিতেই অনেক স্থলে নিরাময় হওয়া যায়। পীড়া হইলে যে দ্রব্য খাইতে অভিলাষ জন্মে—সেই দ্রব্যই সেই পীড়ার প্রতিষেধক। হাসিবেন না পাঠক। যে জ্বর অনেক ডাক্তার বৈদ্য আরাম করিতে পারেন নাই, আমার ইচ্ছামত কতকটা দধি সেবনে রোগমুক্ত হইয়াছি; যতক্ষণ জ্বর ঘাড়ে চাপিয়া থাকে, ততক্ষণ ত কিছুই ভাল লাগে না—পরে জ্ঞানের উন্মেষ হইলে—উঠিয়া বসিতে পারিলে আর ভয় কি?

ডাক্তারবাবু জলসাগু ব্যবস্থা করিলেও তোমার ইচ্ছামত দুধসাগু, দুধবার্লি পাওরুটী,খই,বাতাসা, পাণিফলাদি খাও—কোনও ভয়ের কারণ নাই, তাহাকে বলিলেই হইল—'জলসাগু' খাইয়াছি। নিজের অভিপ্রায় মত আহার বিহার পীড়ায় প্রতিকূল না হইয়া অনুকূল হয় ইহা যাহারা বিশ্বাস না তাঁহারা

অবশ্যই এই প্রবন্ধ পাঠে নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু বহু-বর্ষব্যাপী পরীক্ষায় যাহা দেখিতেছি তাহাতে অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই। হাতের একটী আঙ্গুল কাটিয়া গেলে সেই স্থানে পুনরায় অস্ত্র বসাইতে কাহারই ইচ্ছা হয় না, পরন্তু জলপটী বাঁধিয়া রাখিতে ইচ্ছা করে—সুতরাং শেষোক্ত প্রক্রিয়াই উপকারী। যাহা তোমার শরীরের উপযোগী নয় তাহাতে প্রবৃত্তি আসিতেই পারে না, ইহাই আমার বক্তব্য। শত ঔষধে যাহা না সারিতেছে, সামান্য একটী টোট্‌কা ঔষধে তাহা আরাম হইতেছে, ইহাও আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। দেহের ত্বক্ যাহাতে অব্যাহত, মসৃণ থাকে, উদর কার্য্যশীল থাকে—শক্তির অভাব না হয় এতৎপক্ষে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অনেকের দেহে কাউরের ঘা, দদ্রু, বিখাউজ, পারার ঘা প্রভৃতি দেখা যায়—তাহারা তৎপ্রতিবিধানে মনোযোগী না হইয়াও দেঁতোর হাসি হাসিয়া বেড়ায়, মনে করে—ও কিছু নয়; কিন্তু পরিশেষে ক্রমে ২ তাহাদের দেহের মাংসাদি পচিয়া ধ্বংসের পথে লইয়া যায়। দেহস্থ প্রত্যেক ইন্দ্রিয় কার্য্যকারী থাকিলে অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকা যায়। খোস, পাঁচড়া, চুলকানি প্রভৃতি পীড়াও উপেক্ষণীয় নহে; বয়স ব্রণ, মেচেতা প্রভৃতিও দূর করা উচিত। মোটের উপর ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে কোনও প্রকার অসাচ্ছন্দ্য অনুভূত হইলেই তাহা দূর করিতে হইবে—মন যেন কোনও প্রকারে অশান্ত, ত্যক্ত, উত্তেজিত উদ্বিগ্ন বা বিচলিত না হয়; তাহা হইলেই দেহ যন্ত্রের ক্রিয়া সম্যক্ পরিচালিত হইবে। দেহ পিঞ্জরের কোনও অংশ ভগ্ন হইলে প্রাণপক্ষী উড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করিবে—ইহা বিচিত্র কথা নহে। সংসার মোহাচ্ছন্ন জীব, যদি দীর্ঘজীবী হইতে চাও—দেহের সাধন কর—উহাই তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ধর্ম্মাধর্ম্ম পর-লোক—পরের কথা।

শ্রীআশুতোষ গাঙ্গোপাধ্যায়—কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদীয় সারগীতি।

রামায়ণী কথার মত আয়ুর্ব্বেদের বাণী।
ঘরে ঘরে হচ্ছে প্রচার সত্য ব'লে মানি॥
কিন্তু লোকে মুখে বলে আয়ুর্ব্বেদের জয়—
মনে জানে এলোপ্যাথিক ডাক্‌লে কথা কয়॥
রাত দুপুরে যদি কারো বুকে ধরে ব্যথা।
তখন মনে পড়েনা'কো কবিরাজের কথা।
নিদান কারণ দেখ্‌তে খুঁজে হয় না অবকাশ।
বিছানাতে ছট্‌ফটানি ঘন ঘন শ্বাস॥
যকৃতের প্রদাহ কিম্বা ধরে অম্লশূল—
এ সব বিচার কেবা করে—কেই বা ধরে মূল ?
তেলে জলে মালিশ ক'রে যদি আরাম পাও—
মৌরি ধ'নে গোলাপ ফুলে মিছরী ভিজা খাও।
জান্‌বে সেটা অম্লশূল অন্য কিছু নয়—
হা হুতাশে কি ফল হবে—মিছে কেন ভয় ?
আমলকী আর মিছরী মাখন—খাবে সময় মত।
ত্রিফলা বা চূণের জলে রোগটী কর হত॥
ঠাণ্ডা জল আর তেলের মালিশ যদি বাড়ায় ক্লেশ—
কিম্বা যদি ডান পাজরে থাকে ব্যথার লেশ॥
যকৃতের বিবৃদ্ধি ব'লে ধরে লবে সেটা,
গরম জলের বোতল বুলাও—ভুলোনাকো এটা।
এই প্রক্রিয়ায় দশ মিনিটে আশু আরাম পাবে।
ক্ষণেক পরে গরম জলে লবণ দিয়া খাবে॥
কাঁচা পেঁপে—পেঁপের আটা, হরিতকীর শাঁস।
ক্রমে ক্রমে প্রয়োগ কর—রোগটী হবে নাশ॥
আয়ুর্ব্বেদের দ্রব্যগুণে সবই আছে লেখা—
কে-বা পড়ে,কে-বা শোনে—কার বা ইচ্ছা শেখা ?

কত ওষুদ ছড়িয়ে আছে, ঘরটী দেখ চেয়ে—
অমূল্য ধন পায়ে ঠেলোনা হাতের মাথায় পেয়ে।
জীরা গোল মরিচের গুড়া, হলুদ যোয়ান ধনে—
এ সব ওষুদ নিত্য যে খাও—রেখো সেটা মনে।
পানের সাথে মসলা যত নিত্য সেবন কর—
পায়েতে দাও পাদুকা আর মাথায় ছত্র ধর।
সবই যে গো উপকারী তাহে আছে কি ভ্রম ?
মুক্ত বায়ু, গঙ্গাবারি—নিত্য পরিশ্রম—
তৈল মাখা অবগাহন—ভগবানের নাম—
বাড়ায় আয়ু, তৃপ্তি, দীপ্তি, পূরায় মনস্কাম।
রক্ত মাংস মজ্জা মেদের নশ্বর এ দেহ—
জীবন-বাতি নিব্‌বে কখন—ভাবছ কি হে কেহ ?
আহার বিহার শয়ন নিদ্রায় অনিয়মটী হ'লে।
ভঙ্গ হবে স্বাস্থ্য তোমার প্রতি পলে পলে ॥
কিন্তু যদি আয়ুর্ব্বেদের স্বাস্থ্য নীতি মান—
"বাঁচতে পার শতাবধি" মনে এভাব আন ॥
জানি বটে এ জগতের কিছুই স্থায়ী নয়—
অকাল মৃত্যু ঘটে পাছে—এই তো মনে ভয়।
তাইতো মানি স্বাস্থ্যবিধি—খেল্‌তে ভবের খেলা—
অন্তিমেতে হরির নাম ভবপারের ভেলা ॥

শ্রীমতী হীরাপ্রভা দেবী (মুখোপাধ্যায়স্থ), কলিকাতা।

প্রতিবাদের কৈফিয়ৎ।

মাননীয় শ্রীযুক্ত "আয়ুর্ব্বেদ-বিকাশ" সম্পাদক
মহাশয় বরাবরেষু।

মহাত্মন্ !

গত অগ্রহায়ণ সংখ্যা আয়ুর্ব্বেদ-বিকাশে শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দাশ গুপ্ত মহাশয়ের প্রতিবাদ পাঠ করিয়া চমৎকৃত ও হৃষ্ট হইলাম। "আয়ুর্ব্বেদ"

চতুর্ব্বেদের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও উহা আমাদেরই জিনিষ—এই কথা আমি লিখিয়াছিলাম। বটে কি না ? ভোলানাথ বাবু বলেন—আয়ুর্ব্বেদ চতুর্ব্বেদেরই অন্তর্ভূক্ত। কেমন—এই না কথা ? আচ্ছা, চতুর্ব্বেদ কি কি ? সাম্, ঋক্, যজু, অথর্ব্ব। কই এর মধ্যে কি আয়ুর্ব্বেদের নাম গন্ধ আছে ? তাই বলিতেছি যে চতুর্ব্বেদের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও উহা আমাদেরই জিনিষ—কেন না অথর্ব্ব বেদের পরিশিষ্টাকারে আয়ুর্ব্বেদের জন্ম। এইত গেল আমার পহেলা নম্বরের কৈফিয়ৎ। 'আয়ুর্ব্বেদ' চতুর্ব্বেদের অন্তর্ভূক্ত কি না ইহা ভাবিয়াই ভোলানাথ বাবু আকুল হইয়াছেন—মল্লিখিত বাক্যটীর ভাবার্থও ভাবিবার অবকাশ ঘটে নাই।

আত্রেয় সংহিতায় উক্ত হইয়াছে, যখন বেদের সৃষ্টি হয় নাই তখন অশ্বিনী কুমারেরা ভ্রমণ করিতে২ একদিন দেখিতে পাইলেন কতিপয় বন্যবরাহ পরস্পর বিবাদ ও কামড়াকামড়ি করিয়া ক্ষতবিক্ষত হইতেছে—তখন এবম্প্রকার মৃত্যুভয় ছিল না। বরাহেরা যাতনায় অস্থির হইয়া আর্ত্তনাদ করায় অশ্বিনীকুমারেরা এ বিষয় রুদ্রদেবের কর্ণগোচর করিয়া বলেন—প্রভো, আপনি সংহারকর্ত্তা—একেবারে সংহার করুন, ভাল কথা—যাতনা দগ্ধ জীবের প্রকৃষ্ট উপায় কি ? ব্রহ্মা কহিলেন সত্য বটে, আমি সৃজন করিব, মহেশ্বর ধ্বংস করিবেন কিন্তু একেবারে কোনও কিছুরই বিনাশ সাধন করা সম্ভবপর নহে—বিশেষতঃ হিংস্রাদি রিপুকুল তাড়নায় বিচলিত হইয়া যাহারা দেহের অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হইবে, তাহাদের আয়ুর্বৃদ্ধি কল্পে কোনও উপায় করা চাই। ক্রমে তথায় সকল দেবতার আবির্ভাব হইল—স্বর্গ হইতে অমৃত, ওষধি প্রভৃতির বীজ ধরাতলে নিক্ষিপ্ত হইল। ব্রহ্মা বেদোচ্চারণ করিলেন—জীবের মঙ্গলের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, সমস্তই বর্ণিত হইল। আয়ুর্ব্বেদ তখন "পঞ্চম বেদ" বলিয়া কথিত হইল। শ্রীরামচন্দ্রের সময়ে 'সুষেণ' উক্ত আয়ুর্ব্বেদের অধিকারী ছিলেন—বিশল্যকরণী প্রভৃতি গাছড়ার বিষয় তিনিই সম্যক্ অবগত ছিলেন, ইত্যাদি কথা কোনও একখানি গ্রন্থে বা মাসিকপত্রে পড়িয়াছিলাম। সম্প্রতি আমি দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছি কাজেই সঠিক তত্ত্ব দিতে পারিলাম না, দেশে ফিরিয়া ভোলানাথ বাবুর সন্দেহ ভঞ্জন করিব ইচ্ছা রহিল।

বিনীত—শ্রীআশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায়, কলিকাতা।

"প্রাণোবা অমৃতম্ :" (শ্রুতিঃ)

আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ।

(স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন ও চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র)

"আয়ুঃকামযমানেন ধর্ম্মার্থ সুখসাধনম্।
আয়ুর্ব্বেদোপদেশেষু বিধেয়ঃ পরমাদরঃ॥ বাগ্‌ভট।

৩য় বর্ষ } মাঘ ১৩২২ { ১০ম সংখ্যা।

উপনিষদের প্রাণ-বিজ্ঞান।

জীব ও মৃত্যু।

উদ্দালকি নামক রাজা স্বর্গকামনায় এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তাহাতে সর্ব্বস্ব দানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নচিকেতা নামে তাহার এক পুত্র ছিলেন। নচিকেতা বালক হইলেও বেশ জ্ঞানী ছিলেন। তিনি পিতাকে দক্ষিণার্থ গাভী সকল দান করিতে দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই যে ভোজন পানে অশক্ত গাভিসকল, যাহাদের ইন্দ্রিয়সকল বিকল হইয়াছে, সন্তানোৎপাদনে ও দুগ্ধদানে অসমর্থ, ইহাদের দানে করিলে কোন্ স্বর্গলাভ হইতে পারে বরং নিরানন্দ লোকই লাভ হয়। তখন তিনি পিতাকে বলিলেন, পিতঃ, আপনি আমাকে কাহাকে দান করিবেন? এইরূপ আরও দুইবার বলিলে পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, যমকে দিব। পিতার এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনঃ চিন্তা করিলেন,—মরিষ্যমাণ বহু পুত্রাদির মধ্যে আমিই প্রথম অথবা বহু মৃতের মধ্যে আমি মধ্যম অর্থাৎ যমালয়ে কি আমিই প্রথম গমন করিতেছি না বহুলোক যমালয়ে গিয়া থাকে আমি তন্মধ্যে একজন? যাহাই হউক পিতা আমাকে দক্ষিণা দিয়া যমের কোন কার্য্য সাধন করিবেন? অনন্তর নচিকেতা পিতাকে

বলিলেন,—একসময় সকলকেই মরিতে হইবে; এজন্য কিছুমাত্র দুঃখ নাই। মানুষ চিরকাল মরিতেছে পরেও মরিবে এবং পুনঃ হইতেছে ও হইবে। দেখুন শস্য যেমন ক্রমে জীর্ণ হইয়া মরিয়া যায় এবং পুনঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে, মানুষের অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ।

নচিকেতা পিতৃসত্য পালনার্থ যম সদনে প্রেরিত হইলেন। যম তখন স্বভবনে উপস্থিত ছিলেন না। দিবসত্রয় পরে উপস্থিত হইলে যমপত্নী বলিলেন, অগ্নিস্বরূপ ব্রাহ্মণ অতিথি গৃহে উপস্থিত, আপনার অনুপস্থিতিতে তিনি এই তিন দিন জলও স্পর্শ করেন নাই অতএব হে বৈবস্বত, ইহার যথোচিত শান্তি বিধানার্থ পাদ্যাদি প্রদান পূর্ব্বক স্বকর্ত্তব্য অনুষ্ঠান করুন। যাঁহার গৃহে ব্রাহ্মণ বা অতিথি অভুক্ত থাকেন, সেই অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির আশা, আকাঙ্ক্ষা, সৎসঙ্গ, সত্যবাক্য, যজ্ঞ, পূর্ত্ত (উদ্যান-তড়াগাদি জনহিতকর কর্ম্মজন্য ফল) পুত্র, পশু ও অন্যান্য যাবতীয় সম্পদ বিনষ্ট হইয়া যায়।

এতৎশ্রবণানন্তর যম নচিকেতাকে যথোচিত পূজা সহকারে বলিলেন, ব্রহ্মণ, তোমাকে নমস্কার। তুমি আমার গৃহে উপবাসী ছিলে এজন্য আমার প্রভূত অমঙ্গল হইতে পারে, তুমি প্রসন্ন হও, আমার যেন অমঙ্গল না হয়। আর বলিতেছি তুমি তিন রাত্রি আমার গৃহে উপবাসী ছিলে এই তিন রাত্রির জন্য তোমাকে তিনটি বর প্রদান করিব। তোমার অভিলষিত বিষয় প্রার্থনা কর। তখন নচিকেতা বলিলেন, মৃত্যো, ভবৎপ্রতিজ্ঞাত বরের মধ্যে এইটি আমার প্রথম কামনীয় যে, পিতা গৌতমের সঙ্কল্পসকল সুমহান ও চিত্ত নির্ম্মল হউক এবং তিনি আমার প্রতি ক্রোধশূন্য হউন, আর আপনাকর্তৃক পিতৃসকাশে প্রেরিত হইলে তিনি যেন আমাকে বিশ্বস্তভাবে আপন পুত্র বলিয়া সাদরে গ্রহণ করেন। যম স্বীকৃত হইয়া বলিলেন, তোমার পিতা ঔদ্দালকি আরুণি পূর্ব্বে তোমাকে যেরূপ স্নেহ করিতেন মৎকর্ত্তৃক প্রমুক্ত হইয়া গেলেও সেইরূপ স্নেহ-সমন্বিত ও বাতক্রোধ হইয়া রাত্রিতে সুখে নিদ্রা যাইবেন।

নচিকেতা বলিলেন,—স্বর্গলোকে কোন ভয় নাই, সেখানে তুমি অর্থাৎ মৃত্যু নাই, জরা দ্বারাও কেহ ভীত হয় না, পরন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণার অতীত হইয়া পরমানন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। হে মৃত্যো লোকসকল অগ্নির সাহায্যেই স্বর্গ ও অমরত্ব লাভ করিয়া থাকে এই অগ্নির বিষয় তুমি নিশ্চয় অবগত আছ

অতএব সেই অগ্নির বিষয়েই শ্রদ্ধাবান আমাকে উপদেশ কর ইহাই আমার দ্বিতীয় বর প্রার্থনা। যম বলিলেন, নচিকেত, শ্রবণ কর, ঐ অগ্নি অনন্তলোক প্রতিষ্ঠার হেতু। ইনি সকল প্রাণীর অন্তরেই বিদ্যমান আছেন এবং ইনিই জগতের আদিভূত। এই অগ্নি কিরূপে সঞ্চয় করিতে হয় কিরূপ অগ্নির কিরূপ কার্য্য অর্থাৎ কতটুকু অগ্নি কি পরিমাণ ইষ্টক প্রস্তুত করিতে পারে ইত্যাদির উপদেশ করিলেন। যম নচিকেতার উপর প্রীত হইয়া বলিলেন, তুমিই প্রকৃত উপদেশের পাত্র তোমাকে প্রীতিক্ত আর একটি বর দিতেছি,এই অগ্নি তোমার নামেই প্রসিদ্ধ হইবে। আর তুমি এই বিচিত্র শব্দ বিশিষ্ট মালা গ্রহণ কর। যিনি শ্রদ্ধার সহিত তিনবার তোমাকে চয়ন পূর্ব্বক যজ্ঞ, অধ্যয়ন এবং দান এই ত্রিকর্ম্ম করিয়া থাকেন তিনি শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করিয়া অতিশয় শান্তি প্রাপ্ত হন। তোমার দ্বিতীয় বরের কথা বলা হইল এখন তৃতীয় বর প্রার্থনা কর।

নচিকেতা বলিলেন,কেহ২ বলেন, মানুষ মরিয়া গেলেও আত্মা থাকে, কেহ বলেন থাকে না, এই যে সন্দেহ এ বিষয়েই আমাকে উপদেশ করুন, ইহাই আমার তৃতীয় বর। যম বলিলেন, এ বিষয়ে দেবতাগণও সংশয়াপন্ন হইয়াছিলেন,কারণ ইহা সুজ্ঞেয় নহে। এই তত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম, তুমি অনুগ্রহ করিয়া অন্য বর প্রার্থনা কর, এজন্য আমাকে আর উপরোধ করিও না। নচিকেতা বলিলেন যে বিষয়ে দেবতাগণও সন্দিগ্ধ, অথচ আপনিও বলিতেছেন ইহা দুর্জ্ঞেয়, অতএব আমি দেখিতেছি এবিষয়ে একমাত্র আপনিই উপদেষ্টা অন্যে নহে। অতএব এ বিষয়েই আমাকে বলিতে হইবে, আমার অন্য কোন প্রার্থনা নাই বা ইহার তুল্য অন্য বর হইতে পারে না। যম বলিলেন, শতায়ু পুত্র পৌত্রসকল প্রার্থনা কর, গবাদি পশু, হস্তী, হিরণ্য, অশ্ব, বিস্তীর্ণ রাজ্য প্রার্থনা কর এবং যত বৎসর ইচ্ছা নিজের জীবিত কাল বৃদ্ধি করিয়া লও। তুমি এই বরের তুল্য যে কোন বর প্রার্থনা করিবে তাহাই আমি পূর্ণ করিতে প্রস্তুত আছি। আরও বলিলেন, মর্ত্ত্যলোকে বা মনুষ্য দেহে যে সকল অতি দুর্লভ, তুমি ইচ্ছামত সে সকল প্রার্থনা কর, তাহাই দিব। এই যে, রূপ-শীলাদি গুণবতী রথাদি সমন্বিতা [illegible] যাহা মনুষ্যলোকে দুর্লভা এমন সম্পদ কেন অভিলাষ [illegible]? ইহাদের দ্বারা পরিসেবিত হইয়া তুমি পরম সুখে কাল যাপন করি[illegible] পারিবে, সুতরাং ইহাই গ্রহণ কর, মরন বিষয়ক প্রশ্ন আমাকে

আর জিজ্ঞাসা করিও না যে হেতু উহা অতি গোপনীয়।

নচিকেতা যম কর্ত্তৃক এরূপ প্রলোভিত হইয়াও তাহার যথোচিত উত্তর দিতেছেন, হে মৃত্যো, তুমি যে সকল বস্তু প্রদানের কথা বলিলে, মর্ত্ত্যলোকের এ সকল আজ থাকিলে কালই তাহার অস্তিত্ব না থাকিতে পারে এবং ইহাদের রক্ষা করিতে যাইয়া সমুদয় ইন্দ্রিয়ের তেজঃ বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব এ সকল ক্ষণভঙ্গুর দ্রব্য দ্বারা আমার প্রয়োজন নাই। প্রাণিগণের জীবিত কালই বা আর কতটুকু ? আপনি যে সকল বস্তু আমাকে দিতে চাহিতেছেন ঐ সকল আপনারই থাকুক, তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই। দেখুন ধন-সম্পত্তি কখনও মানুষের তৃপ্তি জন্মাইতে পারে না। যখন আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছি তখনই আমি সমুদয় লাভ করিয়াছি। আপনি২ যখন পরমায়ুর কর্ত্তা তখন আপনি প্রসন্ন হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলে তাহাতেই আমি দীর্ঘজীবী হইতে পারিব। আপনি আমাকে পরলোক সম্বন্ধীয় সেই সূক্ষ্ম তত্ত্বই বলুন। অজর ও অমর লোক প্রাপ্ত হইলে কে আবার জরা মৃত্যু পূর্ণ মর্ত্ত্যলোক ইচ্ছা করিয়া থাকে ? অনশ্বরিন নিত্য সুখের বিষয় চিন্তা করিয়াই বা কে নানা দুঃখপূর্ণ দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া থাকে ? হে মৃত্যো—পুনঃ বলিতেছি, পারলৌকিক আত্মা আছে কি না তাহাই আমাকে বলুন, ইহাই আমার একমাত্র জিজ্ঞাস্য, অন্য কিছুই প্রার্থনীয় নাই। ক্রমশঃ

পল্লী-চিকিৎসক।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শিকড় সমেৎ লজ্জাবতী লতা তুলিয়া কটিতে বাঁধিয়া দিলে শীঘ্র প্রসব হয়। গাছের কোনও শিকড় যেন ছিড়িয়া না যায়, এরূপ সতর্কতার সহিত তুলি[illegible] হয়।

[illegible] লতা অথবা আপাংএর মূল পেষণ করিয়া গর্ভিণীর নাভি, বস্তি ও যোনিপার্শ্বে প্রলেপ দিলে সুখে প্রসব হয়।

দধিকুলের আগা, পাতা, ডাঁটা, মূলসহ বাটিয়া নাভিমূলে প্রলেপ দিলে সুপ্রসব হয়। দধিকুলাকে দৈকল বা দৈকুলাও বলা হয়।

ছোলঙ্গ লেবুর মূল ও যষ্টিমধু মধুদ্বারা পেষণ করিয়া ঘৃত সহযোগে উপযুক্ত পরিমাণে পান করিলে সুখে প্রসব হয়।

শিমুলের নূতন বীজ ১ এক তোলা, শীতল জল ৮ আট তোলা একত্র পিষিয়া গর্ভিণীকে পান করাইলে শীঘ্র প্রসব হয়।

মনসা সিজের দুগ্ধ (কস) আট তোলা লইয়া গর্ভিণীর মস্তকে লেপন করিয়া রাখিলে বহুকালাবধি মূঢ়গর্ভেদুঃখিতা রমণীও শীঘ্র প্রসব করে।

গর্ভস্থ সন্তান মৃত বলিয়া বুঝিতে পারিলে গর্ভিণীর তালুতে অল্পমাত্রায় সিজের আঠা দিবেন ; উহাতে মৃতসন্তান সহজে প্রসব হয়।

সু—ঠাকুদ্দা, গর্ভশূল রক্তস্রাবের ঔষধ বলিতে পার কি ? অকালে বেদনা হইয়া অনেক সময়ই গর্ভপাত হইতে দেখা যায়, তাহার প্রতিষেধক ২।১টা ঔষধ বল না ?

হ—ধনিয়ার চাউল দুই তোলা, চাউল ধোয়া জল আট তোলা,—উক্ত জল দ্বারা ধনিয়ার চাউল উত্তমরূপে বাটিয়া পান করাইলে গর্ভশূল ও রক্তস্রাব তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায় ; অকাল বেদনা হইতে গর্ভপাত রক্ষার ইহাই একমাত্র উত্তম ঔষধ। তিন দিন মাত্র প্রাতে সেবন করাইতে হয়।

সু—প্রসবের পরেই প্রসূতার ফুল (অমরানাড়ী) নির্গত করিবার চেষ্টাও একটী প্রধান কর্ত্তব্য বিষয়। কারণ উহা বাহির না হওয়ার দরুণ অনেক প্রসূতীকে অকালে অশেষ কষ্টভোগের পর মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে দেখা যায়। এখন উহার ঔষধ কিছু বল।

হ—প্রসব হওয়া মাত্রই প্রসূতীর স্বীয় কেশগুচ্ছ উহার মুখগহ্বরে প্রবেশ করাইয়া দিতে হয় ; উহার ফলে প্রসূতীর ঘন ২ বমনোদ্রেক হইতে থাকে এবং অত্যল্প কাল মধ্যেই ফুল বাহির হইয়া যায়।

অঙ্গুলীতে কেশ জড়াইয়া বা বস্ত্র বেষ্টন করিয়া সেই অঙ্গুলী দ্বারা প্রসূতীর কণ্ঠদেশ ঘর্ষণ করিলে ফুল বাহির হইয়া পড়ে।

লাঙ্গলী বিষের মূল পেষণ করিয়া প্রসূতীর হস্তে, পদে লেপন করিলে অমরানাড়ী (ফুল) নির্ব্বিঘ্নে পতিত হয়।

শালি ধান্যের মূল দুই তোলা পরিমাণে গ্রহণ করিয়া কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া পান করাইলে সহজে ফুল পতিত হয়।

তিতলাউ, ঘোষাফল, সর্ষপ ও সাপের খোলস,—এই কয়টী দ্রব্য সমভাগে লইয়া সরিষার তৈল মাখাইয়া প্রদীপ্ত অঙ্গারে দিবেন। তাহা হইতে যে ধূম নির্গত হইবে, সেই ধূম ২।১ দণ্ডকাল যোনিতে (স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ে) লাগাইলে নির্ব্বিঘ্নে ফুল পড়িয়া যায়।

সু—প্রসবান্তে প্রসূতীর যে বেদনা হয়, যাহাকে সাধারণ কথায় বলে 'আদলা ব্যথা', উহাও ত দেখি বড়ই কষ্টপ্রদ।

হ—প্রসবান্তে যদি রীতিমত রক্তস্রাব হইতে না পায়, তাহা হইলে ঐ বিকৃত রক্ত ক্রমে গর্ভিণীর বক্ষদেশে, পেটে ও মস্তকে আক্রমণ করিয়া শূল উপস্থাপিত করে। ইহাতে প্রসূতীর প্রাণনাশ হইতে পারে।

সু—এই 'আদলা ব্যথা'কেই বলে 'মক্কন্দ শূল।' উহার ঔষধ বল না?

হ—কিঞ্চিৎ উষ্ণজলে অর্দ্ধতোলা যবক্ষার চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে উক্ত শূল নিবারিত হইয়া থাকে

সু—ঔষধ পত্রত, ঠাকুদ্দা, অনেক বলিলে, এইবার প্রসবের মন্ত্রতন্ত্র ২।১টা বলিবে না?

হ—বলিব বই কি? এই শুনুন :—

"রক্তের ডোবে, রক্তের কুরিয়া।
দশমাস দশদিন আছিলা মায়ের কোল জুড়িয়া॥
মোর এই জলপড়া যা' শীঘ্র করিয়া,
অমুকীর ছাওয়াল ভূমিতে পড় আসিয়া।
সিদ্ধিগুরু শ্রীরামের আজ্ঞা, কালিকা চণ্ডীর বর॥"

নিয়ম :—কচু পাতায় বা অন্য কোন বৃক্ষপত্রে যে জল পড়ে উক্ত জল অথবা শিশির লইয়া মাটীতে না নামাইয়া উপরোক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া গর্ভিণীকে সেবন করিতে দিলে বিনাক্লেশে সন্তান প্রসব হয়।

"কৃষ্ণবিহারী বাসুদেব দ্বারী, সেতুবন্ধ রামেশ্বর।
অমুকীর গর্ভে রহুক পরমেশ্বর॥
সিদ্ধিগুরু শ্রীরামের আজ্ঞা।"

নিয়ম :—এক ঘটী জল উক্তমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া রোগীকে খাওয়াইলে প্রসব হয়।

"ওঁ মন্মথবাহিনী লম্বোদরং মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা।"

নিয়ম ঃ—উক্তমন্ত্রে উষ্ণ জল অভিমন্ত্রিত করিয়া সেই জল গর্ভিণীকে সেবন করাইলে সুখে প্রসব হয়।

"অং ওঁ হাং নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে।"

নিয়ম ঃ—সূতিকাগৃহে বসিয়া উক্ত মন্ত্র জপ করিলে গর্ভিণী সুখে প্রসব করিতে পারে।

"পানি পানি কখন পানি ভর জল, এই পানি ভর জল
এই পানি অমুকী খায়ে কাটা পোজা গর্ভিণী ছাওয়াল বাহির হইয়া যায়।
বিমুড়ি কাটা, সুমুড়ি করগ রক্তে পূজে তাহারি ধর্ম্মে দিলেন পরিয়া পানি
ঈশ্বর মহাদেব দিলেন বর, শতাশিব ছাড়িয়া ছাওয়াল ভূমিতে পড়।
সিদ্ধি গুরু কালীর আজ্ঞে।"

উক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া পাওয়াইতে হয়, ইহাতে প্রসব হয়।

প্রসব হইতে বিলম্ব হইলে নিম্নোক্ত ৩২ বত্রিশের ঘর পূরণ করিয়া দিবেন। উহা রোগিণী দর্শন বা ধারণ করিতে পারে।

বত্রিশের ঘর।

৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২
৩২	১	৮	৯	১৪	৩২
৩২	১১	১২	৩	৬	৩২
৩২	৭	২	১৫	৮	৩২
৩২	১৩	১০	৫	৪	৩২
৩২	৩২	৩২	৩২	৩২	৩২

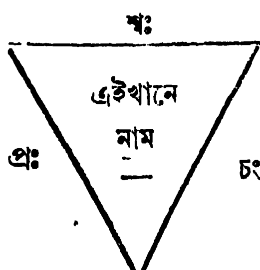
আর ঐ সঙ্গে নিম্নোক্ত মন্ত্র লিখিয়া দিয়া গর্ভিণীকে জম্বলা রাক্ষসীর নাম শুনাইতে হইবে।

"অস্তি গোদাবরী তীরে জম্বলা নাম রাক্ষসী।
তস্যাঃ স্মরণ মাত্রেণ বিশল্যা গর্ভিণী ভবেৎ॥"

হ—এইবার প্রসবের একটী কবচ লিখুন।

সু—আচ্ছা, বলিয়া যাও।

হ—



প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে সেই মুহূর্ত্তে লাল অক্ষরে ভোজপাতে উক্ত কবচ লিখিয়া গলদেশে ধারণ করাইলে তৎক্ষণাৎ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়।

হ—এখন তবে আসি।

সু—আজ পর্য্যন্তই তবে শেষ করিলে?

হ—হাঁ, আজ এই পর্য্যন্তই শেষ। আগামী কল্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিব।

(ক্রমশঃ) শ্রীগোপীনাথ দত্ত, শিক্ষক। পোঃ রাজাবাড়ী, ঢাকা।

যদুনাথের কবিরাজী।

সে আজ অনেক দিনের কথা; তখন এত সভ্যতার আলোকে দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত হয় নাই। চাকুরীর মোহে লোকে এত ছুটাছুটী করিত না; তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয় নাই, দেশ ধন ধান্য পূর্ণ ছিল—প্রতি ঘরেই চাষ আবাদের কার্য্য চলিত—নিতান্ত দরিদ্র ব্যক্তিরা জন খাটিয়া খাইত—অল্প পয়সায় যথেষ্ট আহার্য্য মিলিত—লোকের শক্তি সামর্থ্য—সাহসও তদনুরূপ ছিল। লাঠী খেলা, মালকুস্তি, চৌপাটী, দাণ্ডাগুলি খেলার আধিক্যে শস্যশ্যামলা ভারত ভূমিকে বীরপ্রসবিনীর ন্যায় দেখাইত। তখন ম্যালেরিয়ার আধিক্য এত বেশী ছিল না—এতপ্রকার জ্বরের নামও তখনকার লোকে শুনে নাই; তখন আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয় নাই। যাহারা কবিরাজী করিত, তাহাদের গৃহে হস্তলিখিত টোটকা ঔষধাদির পুস্তক ২।১ খানি পাওয়া যাইত। সেই সকল

টোট্‌কা পট্‌কায় তখন যেরূপ উপকার হইত, এখনকার পাঁচন মুষ্টিযোগাদিতে তদ্রূপ হয় না; তাহার কারণ সেকালের হস্তলিপিগুলি কালের ভীষণ আবর্ত্তে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে কে জানে? এখনকার মুষ্টিযোগ সংগ্রহাদি কতকটা দ্রব্যগুণের সম্মিলনে—কতকটা কল্পনার সাহায্যে গঠিত বলিয়াই মনে হয়। সেই সকল অমূল্য রত্নরাজী যাঁহার গৃহে বিরাজমান, তাঁহাকে ধন্বন্তরী সদৃশ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

যাউক সে কথা; যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের অধীন আসান নগরে 'যদুনাথ' নামে জনৈক কবিরাজ বাস করিতেন; তাঁহার উপাধি আমাদের জানা নাই, তবে "যদুনাথ কবিরাজ" বলিলে তখন সকলেই চিনিত। যে রোগীকে যদুনাথ জবাব দিতেন, শিব সাক্ষাৎ হইলেও সে রোগী বাঁচিবে না লোকের মনে ইহাই বিশ্বাস ছিল। যদুনাথের নাড়ীজ্ঞান অসাধারণ দেখিয়া অনেক ধনী ব্যক্তি তাঁহার গুণগ্রাহী ছিলেন। যদুনাথের সংসারে এক-মাত্র স্ত্রী—সন্তানাদি কিছুই হয় নাই। লোক পরম্পরায় শুনা যায় যদুনাথ বিবাহ করিলেও ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিয়া চলিতেন; কেহ কেহ বলিয়া থাকে, তিনি ইচ্ছা করিয়াই ঔষধাদির গুণে তাঁহার প্রাণসমা সহধর্ম্মিণীকে প্রসব বিপদ হইতে দূরে রাখিয়াছিলেন—ইহাই কতকটা সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

এহেন যদুনাথের চিকিৎসা পদ্ধতি শুনিলে আধুনিক কবিরাজ মহাশয়েরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না। শতরোগীর স্থান সঙ্কুলান হয় এমন একখানি বৃহৎ আটচালা নির্ম্মাণ করাইয়া যদুনাথ তথায় রোগীগণের চিকিৎসা করিতেন। যে কেহ রোগমুক্ত হইতে আসিত, তাহাকে একখানি খাটিয়া ও শয্যাদ্রব্যাদি লইয়া আসিতে হইত। যে আপত্তি করিত, তাহাকে "জাহান্নমে যা" বলিয়া বিতাড়িত করিতেন। ভূমিশয্যা যদুনাথের চক্ষুঃশূল ছিল—তিনি বলিতেন, মৃতব্যক্তিই ভূমিশয্যা করুক। ঔষধ লইয়া কোনও রোগীর স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার রীতি ছিল না; যদুনাথ সেই রোগীকে খাটিয়ায় শয়ান রাখিয়া নিয়মিত ঔষধ ও পথ্যাদি প্রদান করিতেন। ভিন্ন ২ রোগীর জন্য ভিন্ন ২ খাটিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল—২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় সকল রোগীই আরাম হইয়া যাইত। যদুনাথ জানিতেন তিক্তরস জ্বরের মহৌষধ—তাই বলিয়া তিনি কখনও অন্যায় বা অতিরিক্ত মাত্রায় উগ্রতিক্ত রস প্রয়োগ করিতেন না। প্রথমে জ্বর

রোগীকে উপবাস দেওয়াইয়া করলা, নিম্ব প্রভৃতির সুক্ত সহযোগে ভাতের মাড় বা 'ফেণ' খাওয়াইতেন; রোগিগণ অন্নাহার করিতে পাইত না—ক্ষুধার উদ্রেক না হইলে কিছুই খাইবার নিয়ম ছিল না; যদুনাথ রোগীগণকে লইয়া অবস্থা বিবেচনায় ভাঁটা গড়াগড়ি, তাস, পাশা, দৌড়াদৌড়ি প্রভৃতি আমোদ-জনক খেলায় প্রবৃত্ত হইতেন; তাহাতে রোগীগণ একদিকে যেমন রোগের যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইত, অন্যদিকে শারীরিক ব্যায়ামে ক্ষুধাযুক্ত হইয়া নানারস সমন্বিত ফেণ পান করিয়া অত্যল্প কালমধ্যে রোগমুক্ত হইত; কেহ লবণসংযুক্ত, কেহ লবণ বিহীন, কেহ হরিদ্রা চূর্ণসহ, কেহ ঘোলের সহিত, কেহ বা কাঁচ-কলার ঝোলের সহিত অপূর্ব্ব রসযুক্ত ফেণ ঔষধাদির ন্যায় গলাধঃকরণ করিত; যদুনাথ বলিতেন, ভাতের ফেণ উৎকৃষ্ট বলকারক পথ্য—তৎসহ বিবেচনাপূর্ব্বক নবরসের মধ্যে কোনও একটী দুইটী বা তিনটী রস সংযুক্ত করিয়া দিলে তৎ-সেবনে রোগী নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিবে। এই রসজ্ঞান ছিল বলিয়াই যদুনাথ মহাপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

অজীর্ণ রোগীকে লবণ ও যোয়ান খাওয়াইয়া এমনভাবে গাঢ় নিদ্রাভিভূত করিয়া রাখিতেন যে নিদ্রান্তে রোগী উঠিয়া ক্ষুধায় আকুল হইত। কথিত আছে একবার কোনও জমীদার যদুনাথের নিকট আসিয়া বলিয়াছিলেন যে তিনি কোষ্ঠবদ্ধ রোগে অতিশয় কষ্ট পাইতেছেন। যদুনাথ নানাবিধ বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করাইয়াও কোনও ফললাভ করিতে না পারিয়া জমীদারটীকে কহিলেন —মহাশয়, আপনি কি ব্যায়াম করেন। জমীদার উত্তর দিলেন—আমার আবার ব্যায়াম কি? আহারান্তে নিদ্রা, নিদ্রান্তে বয়স্যাদি সহ তাশ পাশা খেলা প্রভৃতিতেই সময় অতিবাহিত হয়। যদুনাথ তাহা শুনিয়া কহিলেন, চলুন আজ খানিকটা ভ্রমণ করিয়া আসি। এই বলিয়া জমীদারটীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে জমীদারটী ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া যদুনাথকে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য অনুরোধ করিলেন। যদুনাথ হাসিয়া তৎক্ষণাৎ একটী সুপক্ক পেঁপে এবং চারিটী উৎকৃষ্ট কদলী বাহির করিয়া তাঁহাকে আহার করাইলেন। জমীদারটী জলপানে সুস্থ হইয়া আরও কিছুদূর অতিক্রম করিবার পরে উদরে বেদনা অনুভব করিলেন—শৌচের বেগ হওয়ায় যদুনাথকে কহিলেন,—কবিরাজ মহাশয়, যেরূপ আমার শৌচের বেগ

হইতেছে তাহাতে আর ভ্রমণেও শক্তি নাই এবং গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেও বিলম্ব সহিবে না, এক্ষণে উপায় কি ? যদুনাথ নানাপ্রকার অছিলায় তাহাকে আরও আধ ঘণ্টা বিলম্ব করাইয়া উপযুক্ত স্থান অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাঁহার উদর-বস্তির কতিপয় স্থান এমনভাবে নড়াইয়া দিলেন যে জমীদারটী শৌচকার্য্য সমাপনান্তে তাঁহার গলার বহুমূল্য হাড়ছড়াটী তাঁহাকে প্রদান করিলেন। যদুনাথ কালক্রমে সুবৃহৎ ভৈষজ্য-উদ্যান, বাগান বাটী প্রভৃতি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাঁহার কিছুরই অভাব ছিল না। রোগমুক্ত হইয়া রোগিগণ যথাশক্তি দক্ষিণা প্রদান করিত, কেহ ২ তাঁহার শিষ্যসেবক শ্রেণীভুক্ত হইয়া থাকিত। লোকবল, অর্থবলে বলীয়ান যদুনাথ বহুকাল সুখভোগের পরে যে বৎসর বিখ্যাত ডাকাইত বৈদ্যনাথ ও বিশ্বনাথ ধৃত হয়, সেই বৎসরে মানবলীলা সম্বরণ করেন। এখন সেই সকল বিষয়াদি পালবাবুদের হস্তগত হইয়াছে—যদুনাথের স্ত্রী যদুনাথের পরে কয়েক বৎসরমাত্র জীবিতা থাকিয়া কালগ্রাসে নিপতিতা হন। লোকমুখে যতটুকু শুনিয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম। রোগীকে নিজগৃহে রাখিয়া ঔষধ পথ্যদ্বারা রোগমুক্ত করাইয়া পরিশেষে দক্ষিণা গ্রহণ করেন এরূপ কবিরাজ এখন কোথাও আছেন কি ?

শ্রীআশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায়—কলিকাতা।

আয়ুর্ব্বেদে ধর্ম্মভাব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(১) সুশ্রুত সংহিতা।

৬। আয়ুর্ব্বর্দ্ধক সন্নীতি।

সন্নীতির উপদেশ সুশ্রুতে অনেক আছে, এস্থলে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা গেল ;——

"ন দেব-ব্রাহ্মণ-পি[illegible]পরিবাদাংশ্চ ; নরেন্দ্রদ্বিষ্টোন্মত্ত-পতিত-ক্ষুদ্র-নীচাচারানুপাসীত।"

[illegible] গণের নিন্দা করিতে নাই। রাজার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন, [illegible], [illegible]দের সদাচার হইতে পরিভ্রষ্ট, জাতিতে হীন বা অসৎকর্ম্মসমাসক্ত [illegible]দের সঙ্গে কখনও মিলিত হওয়া উচিত নহে।

"দেব-গো-ব্রাহ্মণ-চৈত্য-ধ্বজ-রোগি-পতিত-পাপকারিণাম্ ছায়াং নাক্রমেত্।"

দেবতা, গো, ব্রাহ্মণ, শ্মশানবৃক্ষ, পতাকা, রোগী বা পাপানুষ্ঠান-পরায়ণ ব্যক্তির ছায়া অতিক্রম করিতে নাই।

"নিত্যং শাস্ত্রাধ্যয়নং বাদঃ পরতন্ত্রাবলোকনম্।
তদ্বিদ্যাচার্য্যসেবা চ বুদ্ধিমেধাকরো গণঃ॥
আয়ুষ্যং ভোজনং জীর্ণে বেগানাঞ্চাবিধারণম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ সাহসানাঞ্চ বর্জ্জনম্॥"

নিরন্তর সৎশাস্ত্রের অধ্যয়ন, বাদ (পরমতের খণ্ডন পূর্ব্বক নিজের ন্যায়ানুমোদিত মতসংস্থাপন) ; ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, বেদান্ত ও ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রান্তরের অনুশীলন এবং তত্তদ্বিদ্যাভিজ্ঞ আচার্য্যগণের সহবাস ;—এই সমুদয় বুদ্ধি ও মেধাবর্দ্ধক সদ্গুণ। অধিকন্তু ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইবার পরে আয়ুর্ব্বর্দ্ধক দ্রব্য ভোজন করা ; মল ও মূত্রাদির বেগ ধারণ না করা ; ইন্দ্রিয়সংযম, অহিংসা এবং নিজের দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিয়া বলবানের সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত না হওয়া ;—এই সকল বিধির সম্যক পরিপালনে আয়ুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

৭। দৈবব্যপাশ্রয় চিকিৎসা।

ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ঔষধ ব্যবহারের বিধানও আয়ুর্ব্বেদে প্রদত্ত হইয়াছে। এস্থলে কিছু উল্লেখ করা গেল।

তৈল বিশেষ বক্ষ্যমাণ মন্ত্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত করিয়া ব্যবহার প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে ;——

"মজ্জসার মহাবীর্য্য সর্ব্বান ধাতূন বিশোধয়।
শঙ্খ-চক্র-গদাপাণিস্ত্বামাজ্ঞাপয়তে হ্যচ্যুতঃ॥"

হে মজ্জসার মহাবীর্য্য তুবরক, তুমি এই পীড়িত ব্যক্তির রস ও রক্তাদি সকল ধাতুকে দোষ পরিশূন্য কর ;—শঙ্খ চক্র ও গদাপাণি অচ্যুত নারায়ণ তোমাকে এই আজ্ঞা করিতেছেন। অন্যত্র আয়ুষ্কামীরে দেখা যায় ;—

"মন্ত্রৌষধ সমাযুক্তং সংবৎসর ফলপ্রদম্।
বিল্বস্য চূর্ণং পুষ্যস্য তু হুতং বারান্ সহস্রশঃ॥
শ্রীসূক্তেন নরঃ কান্ত্যে ধনবর্ণং দিনে দিনে।
সর্পির্মধুযুতং লিহ্যাদলক্ষ্মীনাশনং পরম্॥"

মন্ত্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত যথোপযুক্ত ঔষধ সহ বিল্বচূর্ণ এক বৎসর পর্য্যন্ত সেবন করিবে। পুষ্যানক্ষত্রে ঋগ্বেদোক্ত শ্রীসূক্ত—

"হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং সুবর্ণ রজতস্রজাম্।
চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো মমাবহ॥"

ইত্যাদি দ্বারা সহস্রবার অভিপূত করিয়া, তদনন্তর স্বর্ণভস্ম সহ ঘৃত ও মধু সহযোগে সেই বিল্বচূর্ণ সেবনে অসুর্ব্বৃদ্ধি হইবে।

প্রসিদ্ধ সোমরসায়ন যোগের অভিমন্ত্রণে উক্ত হইয়াছে ;—

"মহেন্দ্র-রাম-কৃষ্ণানাং ব্রাহ্মণানাং গবামপি।
তপসা তেজসা বাপি প্রশাম্যধ্বং শিবায় বৈ॥"

মহেন্দ্র, রাম, কৃষ্ণ, ব্রাহ্মণগণ ও গোসকলের তপঃ ও তেজঃপ্রভাবে তোমরা মঙ্গলদায়ক হইয়া রোগমুক্ত কর।

অপস্মার রোগ আরোগ্য বিধানার্থ দেখিতে পাওয়া যায় ;—

"পূজাং রুদ্রস্য কুর্ব্বীত তদ্গণানাঞ্চ নিত্যশঃ।"

অপস্মার রোগ হইতে আরোগ্য লাভের জন্য প্রমথগণের সহিত রুদ্রের সতত অর্চ্চনা করিবে।

যে রোগে কোন মন্ত্রের সমুল্লেখ নাই, সেখানে কি করিতে হইবে ?—

"যত্র নোদীরিতো মন্ত্রো যোগেষ্বেতেষু সাধনে।
শস্তিতা তত্র সর্ব্বত্র গায়ত্রী ত্রিপদী ভবেৎ॥"

যেখানে যোগবিশেষে কোন মন্ত্রের পৃথক্ভাবে উল্লেখ নাই, তাহার সর্ব্বত্রই "ত্রিপদী গায়ত্রী" দ্বারা ঔষধকে অনুপ্রাণিত করিয়া, তৎপরে ব্যবহার করিতে হইবে।

৮। গ্রহোৎপত্তি।

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতেই শিশুগণের যে সকল ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা প্রায়শঃ গ্রহগণের নিপীড়ন বশতঃই ঘটিয়া থাকে, প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এইরূপ কথিত হইয়াছে। কিরূপে সেই গ্রহগণের উৎপত্তি হইয়াছিল ?—

"এতে গুহস্য রক্ষার্থং কৃত্তিকোমাগ্নি শূলিভিঃ।
সৃষ্টাঃ শরবনস্থস্য রক্ষিতস্যাত্মতেজসা॥"

প্রসিদ্ধি আছে, কার্ত্তিকের শরবনে নিজের তেজঃপ্রভাবে রক্ষিত হইলেও কৃত্তিকা, অগ্নি, উমা ও মহেশ্বর ইহাঁরা সকলেই স্নেহবশতঃ তাঁহার রক্ষার জন্য

স্কন্দ প্রভৃতি গ্রহগণের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যখন বয়োবৃদ্ধির সহিত আর কুমারের রক্ষাবিধানের কোন প্রয়োজন রহিল না, তখন কার্ত্তিকেয় কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া মহাদেব স্কন্দ প্রভৃতি গ্রহগণকে তাঁহাদের বক্ষ্যমাণ জীবিকার উপায় বলিয়া দিয়াছিলেন ;——

"কুলেষু যেষু নেজ্যন্তে দেবাঃ পিতর এব চ।
ব্রাহ্মণাঃ সাধবশ্চৈব গুরবো হতিথয়স্তথা ॥ * * *
গৃহেষু তেষু যে বালাস্তান্ গৃহ্নীধ্বমশঙ্কিতাঃ।
তত্র বো বিপুলা বৃত্তিঃ পূজা চৈব ভবিষ্যতি ॥"

হে গ্রহগণ, যাহারা দেবতা, পিতৃপুরুষ, ব্রাহ্মণ, সাধুব্যক্তি, গুরুজন ও অতিথিবর্গের সমুচিত সৎকারে পরাঙ্মুখ, তাহাদের সন্তানগণ তোমাদিগের কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবে এবং তন্নিবন্ধন সেই ব্যক্তিগণের পূজা লাভ করিয়া তোমরা জীবিকা প্রাপ্ত হইবে।

৯। সৎপুত্র।

ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় আয়ুর্ব্বেদেও "সৎপুত্র" উৎপাদনে যেরূপ নিয়ম অবশ্য প্রতিপাল্য, তাহার যথোচিত উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এইজন্য সুশ্রুত বলিতেছেন ;——

পুংসবন। "ততো বিধানংপুত্রীয়মুপাধ্যায়ঃ সমাচরেৎ।"

শুদ্ধসত্ত্বগুণসম্পন্ন সৎপুত্রলাভের জন্য, স্ত্রীর ঋতু দর্শনের পরে আচার্য্য শাস্ত্রোক্ত পুংসবন বিধান যথানির্দ্দেশ সম্পন্ন করিবেন। পুংসবন ক্রিয়াতে যেরূপ শাস্ত্র অনুশাসনে ক্রিয়াক্রম বিহিত হইয়াছে, তদনুরূপ সেই ক্রিয়া অনুষ্ঠান সময়ে লক্ষ্মণা প্রভৃতি ঔষধসমূহ প্রয়োগও যথারীতি করিবার বিধান আয়ুর্ব্বেদে আছে।

সৎপুত্র। শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট উপরি উক্ত ক্রিয়ার পরিণামে কি ইষ্ট লাভ হইয়া থাকে ?——

"এবং জাতা রূপবন্তো মহাসত্ত্বাশ্চিরায়ুষঃ।
ভবন্তি ঋণমোক্তারঃ সৎপুত্রাঃ পুত্রিণে হিতাঃ ॥"

বিধিপূর্ব্বক গর্ভোৎপাদন ফলে, সন্তান লোচনপ্রীতিকর অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পন্ন, রজো ও তমোগুণ বিরহিত শুদ্ধসত্ত্বগুণান্বিত, দীর্ঘ আয়ুঃ সমন্বিত ও পিতৃপুরুষ-

গণের ঋণমোক্তা ;—সুতরাং প্রকৃত "সৎপুত্র" পদবাচ্য হইয়া থাকে। সংসারে এইরূপ পুত্রই মানবের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণবিধায়ক হইয়া থাকে।

কুপুত্র। পিতা ও মাতা যথেচ্ছাচার সম্পন্ন হইলে ত কোন কথাই নাই, কিন্তু স্থলবিশেষে শান্ত স্বভাব দম্পতির পুত্রও বিকৃতিপ্রাপ্ত হয় কেন ?

"আহারাচারচেষ্টাভি র্যাদৃশীভিঃ সমন্বিতৌ।
স্ত্রীপুংসৌ সমুপেয়াতাং তয়োঃ পুত্রোঽপি তাদৃশঃ।"

গর্ভাধান কালে পিতা ও মাতা যেরূপ আহার, আচার ও কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের সন্তানও ঠিক সেইরূপ প্রকৃতি সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই জন্যই পিতা ও মাতার সংযত ও শুদ্ধাচার অবলম্বন করিতে ধর্ম্ম ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের এত অনুশাসন। তাই সুশ্রুত আরও বলিতেছেন,—

"দেবতাব্রাহ্মণ পরাঃ শৌচাচার হিতে রতাঃ।
মহাগুণান্ প্রসূয়ন্তে বিপরীতাস্তু নির্গুণান্॥"

যাঁহাদের দেবতা ও ব্রাহ্মণে ভক্তি আছে এবং যাঁহারা কায়শুদ্ধি, মনঃশুদ্ধি, সদাচার ও পরহিত ব্রতে অনুরক্ত, তাঁহাদের সন্তান মহাগুণসম্পন্ন হইয়া থাকে; আর ইহার অন্যথা ঘটিলেই নির্গুণ দুঃশীল পুত্রের জন্ম হয়।

জন্মান্তর। জীবপ্রবাহ যে অনাদি তাহাও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে ;—

"কর্ম্মণা নোদিতো যেন তদাপ্নোতি পুনর্ভবে।
অভ্যস্তাঃ পূর্ব্বদেহে যে তানেব ভজতে গুণান্॥"

জীব স্বীয় পূর্ব্ব ২ কর্ম্মের বিধান অনুসারে পুনর্জ্জন্মে অন্ধ, কুব্জ, খঞ্জ, মূক, পণ্ডিত, মূর্খ বা জাতিস্মর প্রভৃতি হইয়া থাকে। ফলতঃ পূর্ব্বজন্মে প্রাণী যে যে প্রকৃতির অনুশীলন করিয়া আসিয়াছে, পরজন্মেও সেই সকল গুণই তাহাকে আশ্রয় করে। এই জন্যই মনুষ্যের প্রতি সদনুষ্ঠান করিতে ও সদা সাধু সঙ্গে নিরত থাকিতে, আর্য্য শাস্ত্রের এত উপদেশ।

দৌহৃদ। দৌহৃদকে প্রচলিত কথায় দোহদ বা সাধ বলে। যখন চতুর্থ মাস গর্ভের বয়ঃক্রম হয়; তখনই তাহার চেতনার সঞ্চার [illegible] ক। অচিন্তনীয় ঐশ্বরিক শক্তিপ্রভাবে গর্ভস্থ ভ্রূণের অভিপ্রায় অনুস[illegible] এই সময়ে গর্ভিণীর নানাবিষয়ক অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহাই দৌহৃদ

বা দোহদ। দৌহৃদ পূর্ণ না হইলে কি হয় ?——

"সা প্রাপ্তদৌহৃদা পুত্রং প্রজায়েত গুণান্বিতম্।
অলব্ধ দৌহৃদা গর্ভে লভেতাত্মনি বা ভয়ম্॥"

গর্ভিণীর দৌহৃদ পূর্ণ হইলে সন্তান পরিপূর্ণাঙ্গ ও সদ্গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে, আর তাহার অন্যথায় সন্তানের কোন অঙ্গের বা স্বভাবের বিকৃতি অথবা গর্ভিণীর নিজেরও ঐরূপ বিকার বিশেষ সংঘটিত হইতে পারে। এই জন্যই গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণকরার বিধান বিহিত হইয়াছে। যদি রাজদর্শনে গর্ভিণীর অভিলাষ হয়, তাহা হইলে ভাগ্যবান্ ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন নৃপতি সদৃশ পুত্রের জন্ম হইয়া থাকে। এইরূপ গর্ভাবস্থায় রমণীর বস্ত্রালঙ্কারে ইচ্ছা হইলে, বস্ত্র ও অলঙ্কারপ্রিয়, তাপসাশ্রম দর্শনেচ্ছু হইলে ধর্ম্মশীল ও শান্ত স্বভাব এবং ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর দর্শনে ইচ্ছা হইলে হিংসা ও ক্রূরাচারপরায়ণ পুত্র জন্মিয়া থাকে।

সূতিকাগৃহে প্রবেশ। গর্ভিণীকে কখন সূতিকাগৃহে প্রবেশ করাইতে হইবে ?—

"নবমে মাসি সূতিকাগার মেনাং প্রাবেশয়েৎ প্রশস্তে তিথ্যাদৌ।"

তিথি ও নক্ষত্র প্রভৃতি শুভশংসী দেখিয়া নবম মাসে গর্ভিণীকে সূতিকাগৃহে প্রবেশ করাইতে হইবে।

নামকরণ। ভূমিষ্ঠ হইবার পরে বালকের নামকরণ বিধানে সুশ্রুত বলেন ;—

"ততো দশমে হহনি মাতাপিতরৌ কৃতমঙ্গলকৌতুকৌ স্বস্তিবাচনং কৃত্বা নাম কুর্য্যাতাং যদভিপ্রেতং নক্ষত্র নাম বা।"

শিশু যখন দশদিনের হইবে, পিতা ও মাতা বংশানুক্রম বিধান অনুসারে যথাবিধি মঙ্গল আচারের অনুষ্ঠান করিয়া স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক আপনাদিগের অভিপ্রায় অনুসারে অথবা জন্মনক্ষত্রের নির্দ্দেশে জ্যোতিঃশাস্ত্রের বিধানে শিশুর নামকরণ ক্রিয়া সম্পন্ন করাইবেন।

বিদ্যাশিক্ষা। ক্রমে ক্রমে বালক যখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকিবে, তখন পিতা কি করিবেন ?——

"শক্তি মন্তশ্চৈনং জ্ঞাত্বা যথাবর্ণং বিদ্যাং গ্রাহয়েৎ।"

বালক যখন ক্রমে কোন বিষয়ের অভ্যাস করণে সমর্থ হইবে, সেই সময়ে (অর্থাৎ জন্মসময় হইতে শিশুর পঞ্চম বর্ষে) পিতা তাহাকে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিধানে বিদ্যাশিক্ষায় প্রবৃত্ত করাইবেন।

বিবাহ।　বিদ্যাভ্যাস পরিসমাপ্তি হইলে পুত্র যখন ক্রমে যুবক ও শক্তিসম্পন্ন হইবে, তখন ;—

"অথাস্মৈ পঞ্চবিংশতিবর্ষায় দ্বাদশবার্ষিকীং পত্নীমাবহেৎ পিত্র্যধর্ম্মার্থকামপ্রজাঃ প্রাপ্স্যতীতি।"

বিদ্যাশিক্ষার পরে পিতা যখন দেখিবেন, পুত্রের পঞ্চবিংশতিতম বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে, তখন তাহার সহিত দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকার বিবাহ দিবেন; কারণ এই বয়সেই সন্তান স্বীয় পিতৃঋণ, ধর্ম্মানুষ্ঠান, অর্থোপার্জ্জন, বিষয়সুখ ভোগের অভিলাষ ও সন্তান উৎপাদনে সমর্থ হইয়া থাকে।

১০। সুশ্রুত প্রণেতা কি ছিলেন ?

আমরা এই প্রবন্ধে সুশ্রুত গ্রন্থে ধর্ম্মভাবের যে বিকাশ আছে, অতি সংক্ষেপে তাহা দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছি, তবে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে এবিষয়ে কতদূর সফলতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। "সুশ্রুত প্রণেতা কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন", বর্ত্তমানে কেহ কেহ তাহাতে একরূপ স্থির নিশ্চয় হইয়াছেন যে,—প্রসিদ্ধ বৌদ্ধদার্শনিক আচার্য্য নাগার্জ্জুনই * বর্ত্তমান সুশ্রুতের সংস্কর্ত্তা বা প্রণেতা। সুশ্রুতের প্রসিদ্ধ টীকাকার ডল্লনাচার্য্য প্রাচীন কিংবদন্তীর শ্রুতিতে সন্দেহপ্রায়—বলিয়া গিয়াছেন, নাগার্জ্জুন সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা, তাহাতেই এই অভিমতের উদ্ভব হইয়াছে। বিশেষতঃ বর্ত্তমান সুশ্রুতের একস্থানে "সুভূতি গৌতম" সম্বোধিত হইয়াছেন, সুতরাং এই প্রমাণ বলে নাগার্জ্জুনই সুশ্রুতের প্রণেতা নিশ্চিত হইবেন, ইহাই কাহারও কাহারও

* আয়ুর্ব্বেদের উত্তর কালীন সংগ্রহকার বৃন্দ ও চক্রপাণি প্রভৃতি আচার্য্য "নাগার্জ্জুন" রসায়নবেত্তা ছিলেন, উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহারা নাগার্জ্জুনকে "মুনীন্দ্র" নামেও অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। নাগার্জ্জুন বহু গ্রন্থের প্রণেতা; কিন্তু রসায়নবেত্তা নাগার্জ্জুন ও বৌদ্ধ দার্শনিক, নাগার্জ্জুন এক ব্যক্তি কি না, তাহারই বা নিশ্চায়ক প্রমাণ কি ? আমরা নাগার্জ্জুন নামধেয় গ্রন্থকার প্রণীত "যোগসার" নামক গ্রন্থে মাধব কর, চক্রপাণি (চক্র) ও বঙ্গসেনের প্রমাণ সংগ্রহ দেখিতে পাইয়াছি, কেহ কি বলিতে পারেন, ইনি আবার কোন "নাগার্জ্জুন" ?

অভিমত। ওদিকে কিন্তু সুশ্রুতের যে প্রতিসংস্কর্ত্তা অন্য কেহ ছিলেন না, প্রাচীন টীকাকারদিগের মধ্যেও যে এইরূপ অভিমত ছিল, ডল্লন নিজেই তাহাও স্বকীয় গ্রন্থে উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই।

মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণি দত্ত সুশ্রুত সংহিতার অন্যতম টীকাকার, তিনিও সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা বাস্তবিক কেহ ছিলেন কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহই করিয়া গিয়াছেন। সংহিতাগ্রন্থে চারিপ্রকার সূত্র থাকে, ডল্লনের আত্মমত পোষণের ইহাই প্রমাণ যাঁহারা মনে করেন, চক্রপাণি দত্ত জতূকর্ণ কৃত সংহিতার ও পুস্তকান্তরের প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক কেবল উক্ত প্রমাণই যে এবিষয়ে স্থির নিশ্চায়ক নহে, তাহাও সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। চক্রপাণি, জতূকর্ণ প্রভৃতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমানে দুর্লভপ্রায় ভেলকৃত সংহিতা দেখিবার সুবিধা পাইয়া, তাহাতেও আমরা চক্রপাণির পরিপোষক প্রমাণই দেখিতে সমর্থ হইয়াছি। অথচ জতূকর্ণ বা ভেলের গ্রন্থ যে প্রতিসংস্কৃত হয় নাই, বরং তাহা বিলুপ্তই হইয়া গিয়াছে, একথা সকলেই জ্ঞাত আছেন। অধিকন্তু অগ্নিবেশ কৃত সংহিতার "চরক" ও চরক সংহিতার অংশ বিশেষের "দৃঢ় বল" প্রতিসংস্কর্ত্তা, চরক গ্রন্থেই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুশ্রুতের ঐরূপ কোন প্রতিসংস্কর্ত্তা থাকিলে, গ্রন্থমধ্যে তাহার উল্লেখ নিশ্চয়ই থাকিত।

"সুভূতি গৌতম" নাম দেখিয়া ভগবান বুদ্ধদেবের শিষ্য সুভূতিই যে নিশ্চয় হইবেন, তাহার নিঃসন্দেহ প্রমাণের কি উপায় আছে? এইরূপ বলা ত অনুমান করা ভিন্ন আর কিছু নহে। এই বিপুল সংসারে নামের সাদৃশ্য হওয়ার কোন বৈচিত্র্যই নাই। বিশেষতঃ "গৌতম" নাম শুদ্ধোদন পুত্র শাক্যসিংহের অনেক পূর্ব্বেই এতদ্দেশে প্রসিদ্ধ ছিল।

প্রাচীন গ্রন্থমাত্রেই নানারূপ পাঠের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকে, উহা প্রধানতঃ অনবধান প্রসূত ভ্রমহেতুতেই ঘটিয়া থাকে। বৈদ্যক গ্রন্থসমূহে সুতরাং সুশ্রুত সংহিতাতেও সেইরূপ ব্যতিক্রম কিছু যে না ঘটিয়াছে, এরূপ নহে। আমরা সুশ্রুতের এইরূপ পাঠ পরিবর্ত্তনের দিঙ্মাত্র "সুশ্রুতের আদর্শ" * নামক প্রবন্ধে প্রকটিত করিয়াছি। যাহা হউক, ঐরূপ সামান্য পরিবর্ত্তন

* সাহিত্য সংহিতা, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩২২ সাল।

বশতঃই একেবারে অপরকে সংস্কর্ত্তা বা প্রণেতা বলিয়া গণ্য করা সমীচীন কি ?

অষ্টাঙ্গহৃদয় প্রণেতা বাগ্ ভট্টাচার্য্য, সুশ্রুত ও চরক সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, "আয়ুর্ব্বেদে আর্যগ্রন্থ ও ঋষিরহস্য" * নামক প্রবন্ধে আমরা তৎসম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি, বাহুল্য ভয়ে এস্থলে আর তাহা উল্লেখিত হইল না।

বুদ্ধদেব সূর্য্যবংশীয় রা[illegible]র পুত্র ছিলেন, তিনি জনানির্বিশেষে সকলকেই নির্ব্বাণ কামনায় বৈদিক [illegible]শ্রম আচারের বহির্দ্দেশে নিয়া গিয়াছিলেন, যাহাতে সকলেই একেবারে মুক্তি[illegible] গিয়া পুনরাবৃত্তির উচ্ছেদ সাধন করিতে সমর্থ হইতে পারে। কিন্তু সংসারের সকল প্রাণীই কি ভগবান বুদ্ধদেবের ন্যায় কামিনী ও কাঞ্চনের হেয়তা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতে পারিয়াছিল ? সুতরাং দুর্ব্বার কালস্রোতে পড়িয়াই অতঃপর বুদ্ধদেবের নির্ম্মল ধর্ম্মেও ঘুণ প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিল!

সুশ্রুত সংহিতার সর্ব্বত্রই আমরা সনাতন বৈদিক ধর্ম্মের অনুশাসনই দেখিতে পাইয়াছি, এই প্রবন্ধেও তাহা সম্যক প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পাইয়াছি। সুশ্রুতের কোথায়ও বুদ্ধদেবের ধর্ম্মের গন্ধও অনুভূত হয় না, সুতরাং সুশ্রুত-সংহিতা যে [illegible] বিশ্বামিত্রের পুত্র শ্রুতর্ষি সুশ্রুত কর্ত্তৃক প্রণীত, এই সুপ্রাচীন বৈদ্য অভিজ্ঞানের উচ্ছেদ কিরূপে সহজসাধ্য হইতে পারে ? অলমতি বিস্তরেণ।

কবিরাজ—শ্রীমথুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি।
১৭ নং লক্ষ্মী দত্তের লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

ধাতুদৌর্ব্বল্য ও তাহার প্রতীকার।

এই দুরন্ত কলিকালে মানব পশুভাবাক্রান্ত হইয়া পাশবিক অত্যাচারে শরীর ও মন [illegible] নষ্ট করিয়া অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হইতেছে, একথা [illegible] বলিলেও চলে। পথে, ঘাটে, রেলে, জাহাজে যেখানে যাও, [illegible] বদন, প্রফুল্ল চিত্তবিশিষ্ট ব্যক্তি অতি অল্পই দেখিতে পাইবে।

* [illegible]ভ, ২য় ভাগ, ১ম সংখ্যা, মাঘ ১৩২০ সাল।

সকলেরই যেন ভীতভাব, বিরস বদন, চক্ষু কোটরমগ্ন, কঙ্কালসার জীর্ণ শীর্ণ দীনদশা উপস্থিত। কাহারও খোস পাঁচড়া, কাহারও দক্র, কাহারও চুলকাণি লাগিয়াই আছে। আরও অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবে, প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তিই ধাতুদৌর্ব্বল্য রোগাক্রান্ত হইয়াছে। কেহ২ গোপনে যা তা ছাইভস্ম পেটেণ্ট ঔষধ সেবন করিতেছে, কেহ বা ধ্বজভঙ্গ হইবার আশঙ্কায় বিষম ভয়াকুলিত। সুযোগ বুঝিয়া অনেক ধূর্ত্ত এই অবসরে ধাতুদৌর্ব্বল্যের কতই মহৌষধ বাহির করিয়া বিলক্ষণ উপার্জ্জন করিয়া লইতেছে। সহরে, মফঃস্বলে সর্ব্বত্রই ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ দেখি আর মনে করি হায়রে! এ কুৎসিৎ রোগ কোথা হইতে আসিল? যৌবনের অদম্য উৎসাহে যাহারা প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আসিয়াছে, তাহারা এক্ষণে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করুক— আপনার পায় আপনি কুঠারাঘাত করিলে আপনাকেই তাহার যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে, সেজন্য আক্ষেপে ফল কি? রোগী মনে করে ঔষধ সেবনেই আবার পূর্ব্ব বল লাভ ঘটিবে, আবার পবিত্র পত্নীপ্রেমে আসক্ত হইয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে—সম্ভবতঃ এই মনে করিয়াই সর্ব্বস্ব খোয়াইয়াও ধাতুদৌর্ব্বল্যের ঔষধাদি সেবন করিয়া থাকে। কিন্তু শুধু ঔষধ সেবনে ফল হইবে কি? তৎসহ পুষ্টিকর আহার সংগ্রহ করা চাই। নিতান্ত ধনী ব্যক্তি না হইলে ঐ সকল রোগের উপযুক্ত পথ্যাদি গ্রহণ করিতে পারে না। প্রত্যহ ঘৃত, দুগ্ধ, হংস ডিম্ব, কপোত মাংসাদির সংস্থান করা কি সহজ? কাজেই দরিদ্রের ধাতুদৌর্ব্বল্যাদি ঘটিলে মনের আশা মনেই বিলীন রাখিতে হয়। উক্ত রোগের লক্ষণাদি অনেক কবিরাজী মূল্য-তালিকায় লিখিত আছে সুতরাং পু[illegible]থ নিষ্প্রয়োজন। রোগী সর্ব্বথাই দয়ার পাত্র—যাহারা পরদার নিরত—[illegible] চর, [illegible]লোঙ্গার, নরপশু, তাহাদের ঐ সকল রোগ হইলে মনে হয় তাহা[illegible]ক—যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল ভোগ করুক—কিন্তু দরিদ্র গৃহস্থ উ[illegible]ক্র[illegible] হইলে তাহার প্রতি ক্রোধের পরিবর্ত্তে করুণার উদ্রেক জন্মে। [illegible] যাহাতে সন্তানাদির মুখ দর্শনে সুখী হইতে পারে তাহার [illegible]চিত। এই সকল ভাবিয়া এই প্রবন্ধে উক্ত রোগের কতিপয় [illegible] লিপিবদ্ধ করিলাম। এস্থলে ইহাও বলা উচিত যে মুষ্টিযোগা[illegible] সপ্তাহ কাল সেবন করিতে হইবে এবং সেই সময়টুকু

স্ত্রীলোক দর্শন, স্পর্শন একেবারে নিষিদ্ধ। এক সপ্তাহে যদি সম্পূর্ণ আরাম না হয় তবে আর এক সপ্তাহ ঔষধাদি ব্যবহার করা উচিত। এক সপ্তাহেই যথেষ্ট ফললাভ ঘটিবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

১। দুই তোলা উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃতের সহিত দুই তোলা যষ্টিমধু চূর্ণ মিশাও। পরে তাহাতে দুই তোলা মধু দিয়া নাড়িতে থাক। প্রায় পাঁচ মিনিট নাড়িবার পরে উহার সহিত টাট্‌কা গরম গোদুগ্ধ আবশ্যক মত মিলাইয়া পান কর। আহারান্তে একবার এবং শয়নের পূর্ব্বে একবার—প্রত্যহ দুইবার সেব্য।

২। ঘৃতকুমারীর মূল—উপযুক্ত মাত্রায় দুগ্ধ সহ সেব্য। এই মুষ্টিযোগটী কামাখ্যাতন্ত্রে বাজীকরণ প্রকরণে লিখিত আছে। রোগিগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

৩। মরদা চড়াই পাখী প্রত্যহ দুই বেলা দুইটা গব্য ঘৃতে ভাজিয়া আহার করিবে। পাঁঠার অণ্ডকোষ, রোহিত মৎস্যের মস্তক, ডিম্ব প্রভৃতিও যথেষ্ট পরিমাণে খাইতে পারেন।

৪। মাসকলাই ঘৃতে ভাজিয়া তদ্দারা পায়স প্রস্তুত করিয়া খাইলে যথেষ্ট শক্তিশালী হওয়া যায়।

সুপক্ক কদলী শুক্রবর্দ্ধক। নিয়ম পূর্ব্বক সহমহ ইহা ব্যবহারেও যথেষ্ট ফল লাভ ঘটে। বলা বাহুল্য যাহাদের অন্য রোগ নাই কেবল ধাতুদৌর্ব্বল্যাদিতে ভুগিতেছেন, তাঁহারাই উপরোক্ত ঔষধ পথ্যাদি ব্যবহার করিবেন। অন্য রোগ থাকিলে প্রথমে সেই সকল রোগের প্রতিকার করিয়া পরে এই সকল ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে। তদন্যথায় পতন অবশ্যম্ভাবী। গ্রাহকবর্গের আগ্রহ দেখিলে এ সম্বন্ধে আরও লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
২২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মাংস।

(প্রাপ্ত)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

"চতুষ্পাদেষু লঘ্বী স্ত্রী বিহগেষু লঘু পুমান।"

চতুষ্পাদ জন্তুমধ্যে স্ত্রীজাতি লঘুগুণবিশিষ্টা এবং বিহঙ্গ জাতির মধ্যে পুরুষ লঘু। পরাশরও বলিয়াছেন—

"চতুঃপাৎসু স্ত্রিয়োগ্রাহ্যাঃ পুমাংসো বিহগেষুচ।"

চতুষ্পাদ জন্তুমধ্যে স্ত্রীজাতি এবং পক্ষীমধ্যে পুংজাতি গ্রহণ করিবে।

চক্রপাণিকৃত দ্রব্যগুণের টীকাকার মহামহোপাধ্যায় শিবদাস সেন স্বীয় টীকায় উক্ত সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—যক্তু ভাষিতং কাশিরাজেন ছাগমেব নপুংসকং। তদনার্ষং সর্ব্বতন্ত্র বিরোধাৎ।
অর্থাৎ কাশিরাজ বলিয়াছেন ছাগ নপুংসক দিবে, এই বচন ঋষিপ্রণীত নহে, সুতরাং পরবর্ত্তী কোন সাধারণ লোকের প্রক্ষিপ্ত। যে হেতু কোন তন্ত্রেই ঐরূপ বচন নাই, থাকা দূরে থাকুক সমস্ত তন্ত্রই ঐ বচনের বিরুদ্ধবাদী। তাই শিবদাস বলিলেন এই সব সর্ব্বতন্ত্র বিরোধী। শিবদাসের মতে "চতুঃপাৎসু স্ত্রিয়োগ্রাহ্যাঃ" পরাশরের এই বচন অনুসারে এবং "চতুষ্পাদেষু লঘ্বী স্ত্রী" হারীতের এই বচনানুসারে ছাগ স্ত্রীজাতি দেওয়াই উচিত। শিবদাস জতূকর্ণের বচন উদ্ধৃত করিয়া আরও স্পষ্টরূপে দেখাইয়াছেন—"বন্ধ্যা ছাগী প্রশস্তাস্যা-দভাবে বর্করী মতা"। অর্থাৎ ছাগজাতি মধ্যে বন্ধ্যা ছাগীই প্রশস্তা, বন্ধ্যা ছাগীর অভাব হইলে বর্করী (সাধারণ ছাগী) দিবে।

এই জতূকর্ণের মতের সহিত পূর্ব্বোক্ত হারীত ও পরাশরেরও সামঞ্জস্য আছে সুতরাং ঋষিপ্রণীত তিন খানি সংহিতারই একমত। নপুংসক কাশিরাজের অভিপ্রেত হইলে সুশ্রুতে অবশ্য সে কথা থাকিত। বর্ত্তমান সুশ্রুতে ঐরূপ কোনও বচন দেখিতে পাওয়া যায় না। চরকে কি বাগ্‌ভটেও নপুংসকের কথা নাই, শিবদাস পালবংশীয় রাজগণের সমকালবর্ত্তী লোক, তাহার সময়ে বহু আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ ভারতে প্রচলিত ছিল, তিনি তাহার কোনগ্রন্থেই নপুংসক ছাগের ব্যবস্থা দেখেন নাই, ছাগীর ব্যবস্থাই দেখিয়াছেন এবং তাহাই তিনি

প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। শিবদাসের সময় বৃদ্ধবৈদ্য ব্যবহার থাকিলেও অবশ্য তিনি সেকথা লিখিতেন, চরক ও চক্রদত্তাদির টীকায় তিনি বহুস্থলে শাস্ত্রমত লিখিয়া বৃদ্ধবৈদ্য ব্যবহারের কথাও লিখিয়াছেন। সুতরাং শিবদাসের সময়ে বৃদ্ধবৈদ্য মতে নপুংসকের ব্যবহারও ছিল না, সুতরাং পরবর্ত্তী কালে এই শাস্ত্রবিরোধী ব্যবহার বৈদ্যসমাজে প্রচলিত হইয়াছে। কোনও শাস্ত্রে নাই অথচ নানা শাস্ত্রজ্ঞ মহাপণ্ডিত শিবদাস বলেন ইহা সর্ব্বশাস্ত্র বিরুদ্ধ, তথাপি একজন সাধারণ লোকের সংগৃহীত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অর্ব্বাচীন একখানা পরিভাষার কথায় বিশ্বাস করিয়া কেন যে নপুংসক ছাগের ব্যবহার চলিতেছে তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর।

বিশেষতঃ গোবিন্দ সেনের সঙ্কলিত আজকালের মুদ্রিত পরিভাষা প্রদীপ নিতান্ত অসংলগ্ন। ইহার আবার একটী অনামিকা ঢাকাও আছে, টীকা অদ্ভুত রসে পরিপূর্ণ; প্রমাণ স্বরূপ একটী স্থানের টীকা দেখাইলেই শিক্ষিত পাঠকগণ বুঝিবেন যে টীকাকার কতদূর বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন।

ছাগ কিরূপ দিবে এ বিষয়ে পরিভাষায় উক্ত হইয়াছে—

বলিনঞ্চ বয়স্থঞ্চ সুবীর্য্যঞ্চ সুদেহিনং।
নবৃদ্ধঞ্চ নবালঞ্চ অবীর্য্যং স্রাবশোণিতম্॥

এই শ্লোকে সমস্ত পদই ছাগের বিশেষণ, অবীর্য্যং স্রাব শোণিতং এস্থলে প্রকৃত পাঠ "অস্রব দ্বীর্য্যংশোণিতং", অর্থাৎ যে ছাগের বীর্য্য ও শোণিত স্রুত (নির্গত না হয় এরূপ ছাগ দিবে। এই অস্রবদ্বীর্য্য শোণিতং স্থানে অবীর্য্যং স্রাব শোণিতং পাঠ করিয়া টীকাকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন নবীর্য্যং অবীর্য্যং কি অদ্ভুত অর্থ, নাই বটে বীর্য্য যার এইরূপ বহুব্রীহি সমাস করিলে বরং ছাগকে বুঝাইতে পারিত কিন্তু কর্ম্মধারয় সমাস করিলে বীর্য্যাভাব মাত্র বুঝায় কিছুতেই ছাগকে বুঝায় না এবং কোন অর্থই হয় না। ইহার পর স্রাবশোণিতং পদের টীকাকার যে অর্থ করিয়াছেন এবং যে ব্যাখ্যা খাটাইয়াছেন তাহা একেবারেই উন্মত্ত প্রলাপ বটে। টীকা দেখিলে বোধ হয় টীকাকারের ব্যাকরণের সহিত কখনও দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। আমরা এই অপ্রাসঙ্গিক কথায় সময় নষ্ট করিতে চাই না, শিক্ষিত পাঠকগণ পুস্তক ও টীকা দেখিলেই আমাদের কথার যাথার্থ্য অনুভব করিতে পারিবেন। এতাদৃক্ পুস্তকে নির্ভর করিয়া অথবা অশাস্ত্রীয় ব্যবহারের স্রোতে দেহ ভাসাইয়া শাস্ত্রোক্ত ছাগী ব্যবহার না করিয়া

কেন যে আমরা নপুংসক ব্যবহার করিতেছি তাহার কোনও প্রমাণ যুক্তিসহকারে সমুচিত সিদ্ধান্ত লিখিয়া আমাদিগকে কেহ বুঝাইয়া দিলে আমরা তাঁহার নিকট অনুগৃহীত ও পরমোপকৃত হইলাম মনে করিব। সমাজেরও সন্দেহ দূর হইবে।

শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন কবিরত্ন। ময়মনসিংহ।

প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা নিখিল ভারতায় বৈদ্যসম্মেলনের স্থায়ী সভা আয়ুর্ব্বেদ মহামণ্ডলের ষষ্ঠ-অষ্টম বার্ষিক বিবরণ (সম্বৎ ১৯৭১ বাং ১৩২১) অর্থাৎ "আয়ুর্ব্বেদ্কা বার্ষিক ইতিহাস" শীর্ষক সার্দ্ধ দ্বিশত পৃষ্ঠাব্যাপী হিন্দীভাষাবিরচিত গ্রন্থখানি যাহা কলিকাতা ষষ্ঠ বৈদ্যসম্মেলনে স্বীকৃত হইয়াছে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দের সহিত প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। পুস্তকখানা পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় আয়ুর্ব্বেদ মহামণ্ডল আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে কিরূপ তৎপরতার সহিত কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। এতৎপ্রসঙ্গে ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে মহামণ্ডল সম্পাদক পণ্ডিত জগন্নাথ প্রসাদ শুক্ল মহোদয় কি অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া স্বকর্ত্তব্য অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন। সুশৃঙ্খলার সহিত এরূপ বৃহৎ কলেবরের বার্ষিক বিবরণ বাহির করা কিরূপ আয়াস ও অনুসন্ধান সাপেক্ষ তাহা ইহার পাঠক মাত্রই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। প্রত্যেক আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ীর এই গ্রন্থখানি পাঠ করা একান্ত প্রয়োজন মনে করি। দুঃখের বিষয় পুস্তকখানি হিন্দীভাষাবিরচিত বলিয়া সর্ব্বশ্রেণীর বৈদ্যগণের পাঠের সুযোগ ঘটিবে না। মহামণ্ডল কর্ত্তৃপক্ষ ইহার এক বাঙ্গালা সংস্করণ বাহির করিবার জন্য অবহিত হইবেন। বঙ্গবাসী বৈদ্যগণের তেমন দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই বলিয়া সম্পাদক মহাশয় যে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, আমাদের বিশ্বাস বাঙ্গালীগণ ইহার কার্য্যবিবরণ যথাযথ বিদিত হইতে পারিলে অচিরেই তাঁহারা হিন্দুস্থানী সহযোগীগণের সহিত একপ্রাণে কার্য্য করিয়া ধন্য হইবে।

এই পুস্তকখানিতে প্রাধানতঃ সরকার ও আয়ুর্ব্বেদ,প্লেগ-ম্যালেরিয়া কমিশন। প্লেগবিষয়ক প্রশ্নাবলী। মিউনিসিপলিটিতে বৈদ্য, বিষোপবিষসমস্যা ও ইহাদের মূলতত্ত্বপ্রাপ্তি। পুস্তকসংগ্রহ ও পুস্তক প্রণয়ণ, বৈদ্যকপ্রেম ও সংঘশক্তি, সরকারী পরীক্ষাতে আয়ুর্ব্বেদ, আয়ুর্ব্বেদ প্রচার, ধূর্ত্ত চিকিৎসক, রসায়ন সন্দেহ, বসন্ত টীকা, আয়ুর্ব্বেদিক ফার্ম্মাকোপিয়া, আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়, বৈদ্যকডাইরেক্টরী, ভিন্ন ২ প্রান্তিক বিবরণ, ধর্ম্মার্থ ঔষধালয় প্রভৃতি নানা জ্ঞাতব্য কথায় পরিপূর্ণ। সময়ান্তরে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। এই পুস্তকখানি প্রয়াগ (এলাহাবাদ) মহামণ্ডল মন্ত্রীর নিকট প্রাপ্তব্য। পুস্তকের মূল্যাদি সম্বন্ধে কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

"প্রাণোবা অমৃতম্ ।" (শ্রুতিঃ)

আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ।

(স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন ও চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র)

"আয়ুঃকাময়মানেন ধর্ম্মার্থ সুখসাধনম্।
আয়ুর্ব্বেদোপদেশেষু বিধেয়ঃ পরমাদরঃ॥ বাগ্‌ভট।

৩য় বর্ষ } ফাল্গুন ১৩২২ { ১১শ সংখ্যা।

আয়ুর্ব্বেদীয় প্রবন্ধ।

৮। আয়ুর্ব্বেদোক্ত রোগবীজাণুতত্ত্ব—

রোগ-বীজাণু ও জীবাণু পৃথক্ কথা, কেহ কেহ কিন্তু ইহা একার্থেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। বীজাণু বলিতে রোগ মাত্রের বীজভূত সূক্ষ্ম উপাদান সকল বুঝা যায়, আর জীবাণু বলিতে—যে সকল রোগ অতি সূক্ষ্ম কীটাণু হইতে উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে বুঝায়। তবে একটা কথা এই, কোন ২ পণ্ডিত বলিয়া থাকেন যে,সমুদয় রোগই কোন না কোন কীটাণু বা বীজাণু হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাদের মতে জীবাণু ও কীটাণু একই ধরা যায়। কিন্তু একথা আজও সকলে স্বীকার করেন না। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে কোন কোন কীটাণুকে রোগোৎপাদক বলিয়া বলা হইয়াছে সত্য কিন্তু তাহা অধুনা প্রচলিত বীজাণু বা জীবাণু জাতীয় বলিয়া অনুমিত হয় না। যেমন এক জাতীর কীটাণু হইতে কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হয়, শাস্ত্রে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আবার আজকাল পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ যেমন কলেরা, বসন্ত, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতির কীটাণু আবিষ্কার করিয়াছেন প্রাচ্যগণ সেদিকে একরূপ নীরব ছিলেন অনুমান হয়। কোন ২ তন্ত্রাদিতে অবশ্য বীজাণু ও জীবাণু বিষয়ে অনেক কথা আছে কিন্তু সে সমুদয়ও

এই শ্রেণীর নহে। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাক্ষেত্রে জীবাণুর প্রয়োজনীয়তা কতটুকু ? চিকিৎসাই রোগ প্রতিকার। আয়ুর্ব্বেদজ্ঞগণ যক্ষ্মা ম্যালেরিয়া প্রভৃতি চিকিৎসায় নিতান্ত পশ্চাৎপদ নহেন কিন্তু তাঁহারা কীটাণু বিচার করিয়া কি চিকিৎসা করিয়া থাকেন ? বীজাণুতত্ত্বের একটা প্রধান আবশ্যক এই, রোগের বীজাণু আবিষ্কৃত হইলে অনেক রোগের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে। রোগ হইলে তৎপ্রতিকারে যে আবশ্যকতা, রোগ না আসিতে পারে সে জন্য সতর্কতা ততোধিক প্রয়োজনীয়। প্রত্যেক রোগের বীজাণু আবিষ্কার হইলে তাহার প্রতিকার অনেকটা সহজ হইয়া পড়ে, এজন্যই আধুনিক চিকিৎসকবর্গ জীবাণুতত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য এতটা মস্তিষ্ক চালনা করিয়া আসিতেছেন। আয়ুর্ব্বেদের দিক দিয়া এবিষয়টী বিচার করিতে গেলে প্রথমেই এক সমস্যা উপস্থিত হয়, তাহা এই—যদি জীবাণুই রোগোৎপত্তির কারণ হয় তবে বীজাণু বিধ্বংসনের ব্যবস্থা করাই কি সমীচীন নহে ? আয়ুর্ব্বেদ বলেন, দোষ (বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা) রোগের কারণ, দোষ নাশে রোগ নাশ। যদিও তাহারা অন্য কারণে সমুৎপন্ন ব্যাধিকে দোষানুবন্ধ কল্পনা করিয়া চিকিৎসা করিতে পারেন সত্য কিন্তু কীটানুবিদ্‌গণ যদি ইহা প্রতিপন্ন করিতে পারেন যে, এই এই কীটানু এই এই রোগোৎপাদক, আর এই এই ঔষধ তাহার বিনাশক, তখন আর শাস্ত্রীয় দোষ দূষ্যের বিচারের অবসর কোথায় ? যা'ক এখন দেখিতে হইবে বস্তুতঃ কীটাণুই রোগোৎপাদক কি না, আর কোন্ ২ রোগ কীটাণুজনিত অথবা সমুদয় আময়ই জীবাণুজাত কি না ? যে সকল রোগ (যেমন যক্ষ্মা ম্যালেরিয়া) বীজাণুঘটিত—বলিয়া স্বীকৃত, তাহাদের প্রতিকারের জন্য আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ নানা উপায় অবলম্বন করিতেছেন—পাশ্চাত্যগণ মধ্যেও এবিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট না হয় এমন নহে। কেহ ২ প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইতেছেন যে রোগ মাত্রই বীজাণুঘটীত সুতরাং উহা স্পর্শাক্রামক। যে কোন কারণেই হউক রোগবীজাণু দেহ হইতে দেহান্তরে সংক্রামিত হয় তবে যাহাদের শরীরে বীজাণুনাশক ক্ষমতা অধিক তাহাদের দেহ বীজাণু সংস্পৃষ্ট হইয়াও কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারেনা পরন্তু ধ্বংস [illegible] হইয়া যায়। আর যাহারা স্বভাবতঃ দুর্ব্বল অর্থাৎ রোগবীজাণু ধ্বংসকব [illegible] দের যত কম তাহারাই সেই পরিমাণে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

রোগমাত্রকেই বীজাণুঘটিত বলিতে গেলে রোগমাত্রই যে স্পর্শাক্রমক তাহা অনিবার্য্য হইয়া উঠে। রোগমাত্রই সংক্রামক একথা কি পাশ্চাত্য কি প্রাচ্য বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করেন না। সাধারণতঃ প্লেগ, বসন্ত, কলেরা, যক্ষ্মা, জ্বর, কুষ্ঠ প্রভৃতি কয়েকটি প্রধান ২ রোগকে প্রায় সকল শ্রেণীর চিকিৎসক এবং সর্ব্বসাধারণ সংক্রামক বলিয়া জানে, কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ এবিষয়েও একমত নহেন। যে বসন্ত রোগ স্পর্শাক্রমক বলিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে তৎসম্বন্ধেও অনেকে বিরুদ্ধ মত পোষণ করিতেছেন, ইঁহাদের যুক্তি যে একেবারে ভিত্তিহীন এমনও নহে!

আয়ুর্ব্বেদে কুষ্ঠ, জ্বর, শোষ বা যক্ষ্মা, নেত্রাভিষ্যন্দ ও বসন্ত প্রভৃতি ঔপসর্গিক কোন ২ রোগকে সংক্রামক বলা হইয়াছে। * এই সকল রোগ যে কি ভাবে সংক্রামিত হয়, তাহার কোন বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইহার প্রতিষেধেরও বিশেষ ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় না; কেবল রোগীর সহিত শয়ন, ভোজন, উপবেশন ও তাহার সংস্পৃষ্ট বস্ত্র মাল্যাদি সমুদয় বর্জ্জন করিবারই ব্যবস্থা দেখা যায়। উক্ত সকল রোগই যে কীটাণুঘটিত এমনও কোন প্রমাণ নাই তবে কুষ্ঠ রোগ একজাতীয় ক্রিমি বা কীটাণু হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া শাস্ত্রে দেখা যায়ঃ—

রক্তবাহী শিরাস্থান রক্তজা জন্তবোহণবঃ।
অপাদা বৃত্তাস্রাশ্চ সৌক্ষ্ম্যাৎ কেচিদদর্শনাঃ।

রক্তবাহী শিরাসমূহে একপ্রকার সূক্ষ্ম কীট জন্মে যাহারা কুষ্ঠরোগোৎপাদক। এই সকল ক্রিমি যে স্পর্শ দোষেই কেবল উৎপন্ন হয় এমন নহে পরন্তু কেবল মিথ্যা—বিরুদ্ধ আহার বিহার জনিত। সুশ্রুতে কুষ্ঠের নিদান প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে,—

"সর্ব্বাণি কুষ্ঠানি সবাতানি সপিত্তানি সশ্লেষ্মাণি সক্রিমীণি চোপদিশ্যন্তে।"

বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্ম ও ক্রিমিসকল কুষ্ঠের কারণ, অতএব দেখা যায় কেবল ক্রিমি বা কীটাণুজনিত নহে। যে সকল ক্রিমি কুষ্ঠোৎপাদক তাহাদের বিনাশ বা সেই ক্রিমির চিকিৎসা করিলে কু[illegible]ত না পারে, কিন্তু উহা কুষ্ঠ

* কুষ্ঠং জ্বরশ্চ শোষশ্চ নেত্রা[illegible]চ।
ঔপসর্গিক রোগাশ্চ সংক্রাম[illegible]নৃ। সুশ্রুত, কুষ্ঠনিদান।

উৎপাদন করিলে তখন সেই ক্রিমির চিকিৎসা করিলে আর কি ফল হইতে পারে? তখন কুষ্ঠেরই চিকিৎসা প্রধান ভাবে করিতে হইবে, তবে উহা ক্রিমিকে বর্জ্জন করিয়া নহে। যাহা কুষ্ঠনাশক তাহা অবশ্যই ক্রিমিনাশক হইবে। আয়ুর্ব্বেদে এজন্যই নিদান ধরিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা—"সংক্ষেপতঃ ক্রিয়াযোগো নিদান পরিবর্জ্জনম্" ক্রিমিজ কুষ্ঠে ক্রিমিকুষ্ঠেরই বিশেষ চিকিৎসা আবশ্যক, তখন কেবল বাত, পৈত্তিক বা শ্লৈষ্মিক ধরিয়া চিকিৎসা হইবে না।

জ্বর বিষয়ে সংক্রামকত্ব দেখা যায় কিন্তু উহার কোন কীটাণুবদ্ধত্ব দেখা যায় না। ম্যালেরিয়া জ্বরকে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ একপ্রকার কীটাণুজাত বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ম্যালেরিয়াগ্রস্তের রক্ত হইতে সেই বীজাণুও পরীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং উহার প্রতিষেধক কুনিয়ান প্রভৃতি আবিষ্কার হইয়াছে। এক জাতীয় মশাই নাকি ইহার সংক্রমণের প্রধান সহায়। এইরূপ যক্ষ্মা, কলেরা প্রভৃতিরও যে ভিন্ন ২ জীবাণু আছে, সে বিষয়েও পণ্ডিতগণ তথ্য নির্ণয়ে একান্ত তৎপর। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইতেছেন যে, সমুদয় রোগই বীজাণুঘটিত, বীজাণু আবিষ্কার হইলেই উহার প্রতিকার সহজ হইয়া উঠিবে। আয়ুর্ব্বেদকার কিন্তু এবিষয়ে অনেকটা উদাসীন। কোন কোন রোগের কোন ২ অবস্থায় প্রসঙ্গক্রমে কৃমি বা কীটাণুর কথা দৃষ্ট হয়; যেমন অর্কপ্রকাশ গ্রন্থে কফরোগে—

তক্রেদন্তা পলাশস্য বীজান্যর্কং সমাদিশেৎ।
তদর্কপানাৎ কফহৃৎ কৃমীণাং নাশনং ভবেৎ॥

ইহাতে বুঝা যায় কফে একপ্রকার কৃমি জন্মে তাই উহার নাশের ব্যবস্থা।

রক্তজ কৃমি রোগে——

রুধিরস্থেষু কৃমিষু গন্ধকার্কং পিবেদ্ যঃ।
রাত্রৌ চ জাগরং কুর্য্যাদ্রক্তকৃমিনিবৃত্তয়ে॥

কুষ্ঠকারক যে রক্তকৃমি জন্মে তাহার প্রতিষেধেরও এই ব্যবস্থা। যক্ষ্মা রোগ যেমন কফবিকার তেমন কুষ্ঠ রোগও রক্তবিকার ভিন্ন কিছু নহে এই দুইটি যে কৃমি জন্য তাহা বেশ বুঝা যায়। কফ বিকৃত হইয়া যেমন নানা রোগ উৎপন্ন হয় রক্ত বিকৃতিতেও অসংখ্য রোগের সৃষ্টি হইয়া থাকে তাহা অনেকেই জানেন। যাহাতে রক্ত বা কফ বিশুদ্ধ থাকে বা হয় তাহার ব্যবস্থা করা আর

কীটাণু হইতে নির্ম্মুক্ত থাকা একই কথা। এখন দেখিতে হইবে আয়ুর্ব্বেদের দিক দিয়া কীটাণুতত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা কতটা। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আয়ুর্ব্বেদজ্ঞগণ একটা কীটাণুতত্ত্ব সংগঠন করিয়া উঠিতে পারেন সত্য কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী ঋষিগণ রোগপ্রতিক্রিয়ার প্রতি কিরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন সেদিক লক্ষ্য করিয়া ইহার বিচার করিলে কি ভাল হয়না? রোগের নিদান, অভিব্যক্তি ও প্রশমনোপায় যতটা সহজ পন্থানুসরণে হয় তাহার জন্য অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকমাত্রেরই মনোনিবেশ করা একান্ত কর্ত্তব্য। দিন দিন রোগের যেরূপ প্রাবল্য তাহাতে কেবল প্রাচীন পন্থা নিয়াই কোণে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। সমুদয় রোগই সংক্রামক কি না এবং কীটাণু বা বীজাণুই উহাদের একমাত্র কারণ কি না বৈজ্ঞানিকগণ এবিষয়ে ধীরভাবে চিন্তা করিতেছেন ও করিবেন ইহা নিতান্তই আশার কথা। আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ চিকিৎসকগণেরও এদিকে উদাসীন থাকিলে চলিবে না। আমরা এসকল প্রসঙ্গ মাত্র করিয়া যাইতেছি এবং চিকিৎসকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। যথাবসর বিশদ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

বৈদ্যক গ্রন্থবিবরণী।

২৭। গদরাজরত্ন।

গদরাজরত্ন, পুরারিকরণের পুত্র শ্রীমৎস্য (?) করণ প্রণীত। ইহাতে রস, উপরস ও ধাতুপ্রভৃতির শোধন ও মারণ এবং জ্বরাদি রোগের চিকিৎসা বিধান নিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে হিন্দীভাষাতে প্রয়োগ সমূহের ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে। গদরাজরত্নে চক্র (দত্ত) ও রসপ্রদীপকারের উল্লেখ দেখা যায়।

২৮। ধন্বন্তরি নিঘণ্টু।

ইহা একখানি প্রসিদ্ধ বৈদ্যক দ্রব্যাভিধান। ইহাতে গুড়ূচ্যাদি, অহিচ্ছত্রা, অবাকপুষ্পী, চন্দনাদি, করবীরাদি, আম্রাদি, সুবর্ণাদি ও তৈলাদি স্নেহ প্রভৃতি বর্গ বা অধ্যায় আছে। "ধন্বন্তরি নিঘণ্টু" এই নাম দ্বারা প্রসিদ্ধ আদিদেব ধন্বন্তরি কর্ত্তৃক ইহা বিরচিত এইরূপ প্রতীতি হইতে পারে, কিন্তু গ্রন্থের লেখা

দেখিয়া স্পষ্টই জ্ঞান হয়, এই ধন্বন্তরি আদি আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য ধন্বন্তরি নহেন;—

"গুড়ূচ্যমৃতবল্লী চ ছিন্না ছিন্নরুহা স্মৃতা। * * * গিলোই নাম।"

"গিলোই" গুড়ূচীর এই প্রাদেশিক পর্য্যায়, ধন্বন্তরি কর্ত্তৃক লিখিত, ইহা কিছুতেই সম্ভাব্য নহে।

২৯।৩০। সিদ্ধমন্ত্র ও সিদ্ধমন্ত্র প্রকাশ।

সিদ্ধমন্ত্র গ্রন্থে, গ্রন্থকার এইরূপ আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন;——

"ভেজে জন্ম মহাদেবাদায়ুর্ব্বেদঞ্চ ভাস্করাৎ।
সম্মানং সিংহরাজাদ্ যঃ কেশবঃ কারকোঽত্র সঃ॥"

যিনি মহাদেব হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ভাস্কর হইতে যিনি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন আর সিংহ রাজা হইতে যিনি যথোচিত বিদ্যানুরূপ প্রকৃষ্ট সম্মান লাভ করিয়াছেন, সেই কেশব বৈদ্য, এই সিদ্ধমন্ত্র গ্রন্থের প্রণেতা।

সিদ্ধমন্ত্রের টীকা সিদ্ধমন্ত্র প্রকাশ। ইহার গ্রন্থকার আত্মপ্রকাশার্থ বলিতেছেন,——

"ধনেশাধ্যাপিতো যোঽভূদ্ধীমান্ স পিতৃকর্ত্তৃকং।
সিদ্ধমন্ত্রং বিবৃতবান্ বোপদেবঃ সতাং মুদে॥"

ধনেশ যাঁহার অধ্যাপক, সেই বোপদেব, নিজ পিতৃপ্রণীত এই সিদ্ধমন্ত্রের টীকা (সিদ্ধমন্ত্র প্রকাশ) সাধুদিগের সন্তোষার্থ রচনা করিয়াছেন।

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা প্রসিদ্ধ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বোপদেবই, পিতার কৃত "সিদ্ধমন্ত্র" গ্রন্থের "সিদ্ধমন্ত্র প্রকাশ" নামক টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই টীকাতে আমরা দেখিতে পাইতেছি, বোপদেবের পিতামহ কেশবের পিতা মহাদেব, মহারাষ্ট্র প্রদেশান্তর্ব্বর্ত্তী "বেদপদ" নগরের অধিবাসী এবং সিংহরাজা "দণ্ডক" রাষ্ট্রের অধিপতি ছিলেন।

গ্রন্থকার সমষ্টিতে ১৬৯টি শ্লোকদ্বারা যাবতীয় দ্রব্যনিচয়ের গুণাগুণ ব্যাখ্যা করিয়া নিজের অত্যদ্ভুত পাণ্ডিত্য ও ধীশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থের বিষয় নির্দ্দেশে গ্রন্থকার বলেন;——

"বাতে পিত্তে কফে বাতপিত্তে বাতকফে ক্রমাৎ।
কফপিত্তে ত্রিষু হিতো বর্গঃ সপ্তাহিতোঽষ্টমঃ॥"

সিদ্ধমন্ত্র গ্রন্থে বাত, পিত্ত, কফ, বাতপিত্ত, বাতকফ, কফপিত্ত এবং সন্নিপাতে

বাতপিত্ত কফের হিতকর দ্রব্যসমূহের বর্গ,—এই সাতবর্গ এবং অষ্টম অহিত দ্রব্যের বর্গ; মোট এই আট বর্গ আছে।

৩১। হৃদয়দীপক।

প্রসিদ্ধ বোপদেবই এই সংক্ষিপ্ত নিঘণ্টু অর্থাৎ বৈদ্যক দ্রব্যাভিধান প্রণেতা। এই গ্রন্থে প্রাদেশিক নামের উল্লেখও দেখা যায়।

"অথ মুহলেঠী নাম।

মধুযষ্টি যষ্টিমধু ক্লীতকং ক্ষৌদ্রসাহ্বয়ং।

যষ্ট্যাহ্বং মধুকং যষ্টী চান্যাম্ভোজা মধুলিকা॥"

এই গ্রন্থে গ্রন্থকারের আত্মপরিচয়ে শ্লোক ;——

"যো বৈদ্যবন্দ পদ কেশববৈদ্যসূনুর্বিদ্বজ্জনার্চ্চিত ধনেশ্বর হৃদ্যশিষ্যঃ।

স্ব স্বল্প চানদকৃতি প্রকাশঞ্চক্রে ? (স্ব স্বল্প বাগ্‌ভটকৃতী হৃদয় প্রকাশং)

চক্রে নিঘণ্টুমমলং দ্বিজবোপদেবঃ॥"

৩২। যোগসার সমুচ্চয় বা শতশ্লোকী।

এই গ্রন্থের প্রণেতাও প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক বোপদেব। এই গ্রন্থে সংক্ষেপে সকল রোগের চিকিৎসাবিধি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থকার নিম্নোক্ত শ্লোকদ্বারা আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন ;——

দেশানাং বরদাতটং বরমতঃ স্বার্থাভিধানঞ্চ মহা-

স্থানং বেদপদং সগ্রজগণাগ্রণ্যং (?) সহস্রং দ্বিজাঃ।

তত্রামীষু ধনেশকেশববিদৌ বৈদ্যৌ বরিষ্ঠৌ ক্রমাচ্চক্রে

শিষ্যসুতস্তয়ো কৃতিমিতি শ্রীবোপদেবঃ কবিঃ॥"

৩৩। কক্ষপুটতন্ত্র।

নাগার্জ্জুন মুনি কক্ষপুটতন্ত্র প্রণেতা। এই গ্রন্থে ইন্দ্রজাল বিদ্যা, মারণ, উচাটন ও বশীকরণ প্রভৃতি অত্যদ্ভুত বৃত্তান্ত পরিবর্ণিত হইয়াছে। উল্লিখিত বি সমূহ এই গ্রন্থে থাকিলেও যখন দ্রব্যসমূহের শক্তিনিবন্ধনই প্রক্রিয়ানুরূপ ব্যাপারসমূহ সংসিদ্ধ হইয়া থাকে এবং এই গ্রন্থের মধ্যেও নানা বাজীকরণ যোগ প্রভৃতি সমুদ্ধৃত হইয়াছে, তখন আমরা "কক্ষপুট"কে আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ না বলিব কেন ? নাগার্জ্জুন আচার্য্য একজন প্রসিদ্ধ সুপ্রাচীন রসায়ন শাস্ত্রবেত্তা ছিলেন।

চক্রপাণি দত্ত প্রভৃতি উত্তর কালীন গ্রন্থপ্রণেতৃগণ, নাগার্জ্জুন কৃত লোহঘটিত রসায়নবিধি স্ব স্ব গ্রন্থে উপনিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যথা——

"নাগার্জ্জুনো মুনীন্দ্রং শশাস যল্লোহশাস্ত্রমতিগহনম্।" ইত্যাদি।

এইরূপে চক্রপাণি দত্ত স্বকীয় সংগ্রহ গ্রন্থে নাগার্জ্জুনকে "মুনীন্দ্র" আখ্যায়ও উল্লেখিত করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধদিগের মধ্যেও একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থকার নাগার্জ্জুন ছিলেন, কিন্তু উভয় নাগার্জ্জুনই এক ব্যক্তি, তাহার অভ্রান্ত প্রমাণ কি ? "নাগার্জ্জুন" বৌদ্ধ ছিলেন, এইরূপ উপন্যাস প্রয়োগ শ্রুত হইলেও নাগার্জ্জুন যাহাই থাকুন না কেন, সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও চক্রপাণি দত্ত প্রভৃতি যখন তাঁহাকে 'মুনীন্দ্র' আখ্যায় সম্ভূষিত করিয়া গিয়াছেন এবং স্বকীয় গ্রন্থারম্ভেও নাগার্জ্জুন, "পরমশিব" ও "বাগ্দেবতা"র স্মরণ করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে আর্য্যধর্ম্মে অনাস্থাবান্ কি প্রকারে বলিতে পারা যায় ?

নাগার্জ্জুন আরও বলিয়া গিয়াছেন ;——

"যেষাং বক্ত্রাচ্চ্যুতং কিঞ্চি মণিমন্ত্রৌষধাদিকং।
তত্তৎ কর্ম্মাণি পূর্ব্বঞ্চ প্রণমামি মহাত্মনঃ॥"

এইরূপে গ্রন্থকার মণি, মন্ত্র ও ঔষধ প্রভৃতি প্রকাশক মহাত্মগণের প্রণাম করিতেও বিস্মৃত হয়েন নাই। সুতরাং তিনি যে "আস্তিক" ছিলেন, এপরিচয় অধিক প্রদান করা বৃথা।

আমরা আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের পরিচয়ে অন্য একজন নাগার্জ্জুনের সমুল্লেখও প্রাপ্ত হইয়াছি। ইঁহার গ্রন্থে চক্রদত্তের প্রমাণ পরিগৃহীত হইয়াছে। বারান্তরে তাঁহার গ্রন্থের কথা উল্লেখ করিতে ইচ্ছা রহিল।

শাম্ভব, যামল, শাক্ত, মূল, কৌলেয়, ডামর, স্বাচ্ছন্দ, লাকুল, শৈব, রাজ, অমৃতেশ্বর, উড্ডীশ, বাতুল, উচ্ছিষ্ট, সিদ্ধশাবর, কিঙ্কিনী, মেরু, কালচণ্ডীশ্বর, শাকিনী, ডাকিনী, রৌদ্র, গ্রহনিগ্রহ, কৌতুক, শিল্প, ক্রিয়াকালগুণোত্তর, হরমেখলক, ইন্দ্রজাল, রসার্ণব, আথর্ব্বণ, মহাদেব, চার্ব্বাক ও গারুড় প্রভৃতি তন্ত্র হইতে সার সংগ্রহ পূর্ব্বক কক্ষপুটতন্ত্র বিরচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থমধ্যে মোট ১৮ পটল বা অধ্যায় আছে।

কবিরাজ—শ্রীমথুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থ। কলিকাতা।

উপনিষদের প্রাণ-বিজ্ঞান।

পরলোকতত্ত্ব।

যম নচিকেতার নশ্বর বিষয়ে নিস্পৃহত্ব ও একান্ত শ্রেয়োবিষয়ে একাগ্রতা দর্শনে প্রশংসার্হ বোধ করিয়া বলিলেন,—হে নচিকেতঃ, পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত দুইটি বিষয়েই সমাসক্ত হইয়া থাকে, উহার একটী শ্রেয়ঃ একটি প্রেয়ঃ। শ্রেয়ঃ পরিণাম মধুর এবং প্রেয়ঃ আপাত মধুর। শ্রেয়ো বিষয়ে সতত যাহাদের মতি থাকে তাহারাই প্রকৃত সাধু পদবাচ্য। আর যাহারা প্রেয়ঃ অবলম্বন করিয়া থাকে তাহারা কখনও উচ্চপদ লাভ করিতে পারে না। এতদুভয়ই মানুষকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান থাকে। ধীর-ব্যক্তি উভয়টীকে বিচার পূর্ব্বক প্রেয়ঃ বিষয় বর্জ্জন করিয়া শ্রেয়োমার্গই অবলম্বন করিয়া থাকেন। বিবেকহীন মূঢ়জনেরাই অচিরস্থায়ী প্রেয়ঃ অবলম্বন করিয়া থাকেন। হে নচিকেতঃ, তুমি মৎকর্ত্তৃক বিশিষ্টরূপে প্রলোভিত হইয়াও নশ্বর প্রেয়ঃ বিষয়সকল তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া পরিহার করিয়াছ। যে বিত্তময়ী মাল্য তোমাকে আমি দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, উহাতেই বহুতর মানব মোহিত হইয়া থাকে। তুমি ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছ তুমিই ধন্য! বিদ্যা এবং অবিদ্যা ইহারা পরস্পর অত্যন্ত দূরবর্ত্তিনী এবং বিরুদ্ধ ভাবাপন্না, বিশেষতঃ বিরুদ্ধ ফলের জনয়িত্রী। তুমি একমাত্র বিদ্যাকাঙ্ক্ষী। বহু কামনা তোমাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে নাই। অবিদ্যাগ্রস্ত মানবেরা নিজকে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান বলিয়া মনে করে। বস্তুতঃ এই কুটিল গতি মূঢ়েরা অন্ধ কর্ত্তৃক চালিত অন্ধের ন্যায় অভিষ্ট লাভ করিতে পারে না পরন্তু বিপথে দুঃখ ভোগই করিয়া থাকে। বিত্তাদি মোহে প্রমত্ত ব্যক্তি বালকের মত মনে করে, যাহা দেখিতেছি তদরিক্ত আর কিছু নাই। অর্থাৎ দৃশ্যমান ইহলোক ব্যতীত কোন পরলোক নাই বলিয়া ইহারা একান্ত গর্ব্বিত। এই সকল ব্যক্তিরাই পুনঃ২ আমার বশবর্ত্তী অর্থাৎ মৃত্যু যাতনা ভোগ করিয়া থাকে।

আত্মা বহু লোকেরই শ্রবণগোচর হয়না, শ্রবণ করিয়াও ইহা অনেকে বিদিত হইতে পারে না, যে হেতু আত্মার স্বরূপোপদেষ্টা যেমন দুর্লভ তেমন শ্রোতাও দুর্লভ। অজ্ঞানী ব্যক্তি দ্বারা আত্মা হীন ভাবেই কথিত হয়, কারণ বহু চিন্তা

দ্বারাও ইহা সুবিদিত হওয়া যায় না। বিশিষ্ট জ্ঞানী ব্যক্তি দ্বারা কথিত হইয়াও ইনি সুজ্ঞেয় নহেন, অজ্ঞ ব্যক্তির আর কথা কি? আত্মা অণু হইতেও অণু সুতরাং অপ্রত্যক্ষ ও তর্কের অবিষয়ীভূত। হে নচিকেতঃ! তুমি প্রকৃতই উপদেশের পাত্র, বৃথা তর্ক দ্বারা তোমাকে বিচলিত করা কর্ত্তব্য নহে। তোমার ন্যায় সত্য ও ধৃতিশীল ব্যক্তি কর্ত্তৃক আর কখনও আমি জিজ্ঞাসিত হই নাই।

নচিকেতঃ, এই যে দৃশ্যমান নিধিসকল, ইহাদের আমি অনিত্য বলিয়াই জানিতে পারিয়াছি। এই সকল অনিত্য বস্তু দ্বারা কখনও সেই নিত্য পদার্থকে (আত্মাকে) লাভ করা যায় না। এজন্যই আমি অনিত্য বস্তু সকল দ্বারা আত্মসাধনভূত অগ্নি সঞ্চয় করিয়া থাকি, সুতরাং নিত্য আত্মাকেও প্রাপ্ত হইয়াছি। হে নচিকেতঃ, তুমিও আমার ন্যায় কামনার যাহা উচ্চতম, জগতের প্রতিষ্ঠা, যজ্ঞের যেটি প্রধান, যদ্বস্তু ভীতিবিরহিত একমাত্র সত্য, আর যে প্রতিষ্ঠার উপর অন্য প্রতিষ্ঠা নাই, অর্থাৎ যিনি সর্ব্বোপরি বিরাজমান; এমন বস্তুকে চিন্তা করিয়াই বুদ্ধিমত্তা ও ধৈর্য্যসহকারে অনিত্য অথচ ঈদৃশ ফলবিরুদ্ধ বিষয়সমূহকে পরিত্যাগ করিয়াছ। যিনি দুর্দর্শ, অথচ গূঢ়ভাবে সর্ব্বত্রাবস্থিত, যিনি সকলের হৃদয়কন্দরে সংস্থিত, এমন কি প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ব্যাপ্ত, যিনি পুরাতন এমন ক্রীড়াশীল পরমদেবকে ধীরব্যক্তি অধ্যাত্মযোগাগম দ্বারা বিদিত হইয়া হর্ষ-শোক পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। এই অতি সূক্ষ্ম ধর্ম্মতত্ত্ব লাভ করিয়া মর্ত্ত্যগণ চিরানন্দ পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব হে নচিকেতঃ তোমার প্রতিও সেই সুখময় ধাম উন্মুক্ত রহিয়াছে, বলিতে পারি।

নচিকেতা বলিলেন, আমি প্রশংসা শ্রবণ করিতে পরাঙ্মুখ। আমার জিজ্ঞাস্য এই, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিরহিত, কার্য্যকারণ ও ভূত-ভবিষ্যৎ সমতীত যে বস্তু, তাহাই উপদেশ করুন।" সমুদয় বেদের প্রতিপাদ্য যিনি, তপস্যাদি যাঁহার জন্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, যাহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে, সেই মহত্তত্ত্ব তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি। ওঙ্কারকেই তৎস্বরূপ বলিয়া জানিবে। এই অক্ষর অবিনশ্বর ব্রহ্ম এবং ইহাই পরমাক্ষর। ইহাকে বিদিত হইয়া যিনি যাহা কামনা করেন, তাহাই প্রাপ্ত হন। ইহাই শ্রেষ্ঠ আলম্বন— পরমাশ্রয়। ইহাকে জ্ঞাত হইলেই ব্রহ্মলোকে গতি লাভ হয়। সেই জ্ঞানী ব্যক্তি আর জন্মগ্রহণ করেন না, মৃত্যুও তাঁহার নাই। তিনি অজ, নিত্য, পুরাণ,

সনাতন ব্রহ্মসাযুজ্য গুণ লাভ করিয়া থাকেন। শরীর বিনষ্ট হইলেও সেই আত্মার বিনাশ হয় না। যাহারা মনে করে—আমি হত হইলাম বা অপরকে বিনাশ করিলাম তাহারা জানে না যে আত্মা হত হয় না এবং অন্যকেও হনন করিতে পারে না। সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর এবং মহৎ হইতে মহত্তর যে আত্মা তিনি প্রাণিগণের হৃদয় কন্দরে সদা অবস্থান করেন। আত্মতত্বজ্ঞ সুতরাং শোকরহিত মহাত্মগণই বি—তার অনুগ্রহে সেই আত্মার মহিমা উপলব্ধি করিয়া থাকেন। যিনি একস্থানে অবস্থিত রহিয়াও দূর দুরান্তরে গমনে সমর্থ, যিনি শয়ান থাকিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে পারেন, সেই সুখদুঃখের কারণ স্বরূপ ভগবানকে আমি ভিন্ন আর কে জানিতে সমর্থ হইতে পারে? অশরীরী হইয়াও যিনি নশ্বর শরীরে অবিকারী ভাবে বিদ্যমান, সেই মহান্ আত্মাকেই সর্ব্বময় কর্ত্তা জানিয়া বুদ্ধিমানগণ শোক পরিহার করিয়া থাকেন। এই যে আত্মা তিনি প্রকৃষ্ট শাস্ত্রাধ্যয়নে দৃষ্ট হয়েন না, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি কিংবা বহু শ্রবণ দ্বারাও উপলব্ধ হয়েন না। ভগবান আত্মা যাহার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন তিনিই তাঁহাকে লাভ করিয়া স্বরূপ জ্ঞাত হইতে পারেন। কিন্তু সেজন্য দুরাচার, অশান্ত ও অসমাহিতচিত্ত দুর্ম্মনা ব্যক্তিসকল স্বকীয় প্রজ্ঞাবলে কখনই তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না। ব্রহ্মত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব যাঁহার অন্নস্বরূপ, মৃত্যু যাহার অনন্ত তৃপ্তি ব্যঞ্জন সদৃশ, সেই বিরাট বিশ্বম্ভরকে এইরূপে কে অবগত হইতে পারে?

(ক্রমশঃ)

উপদেশাবলী।

১। মুখে ভগবন্নাম উচ্চারণ না করিয়া প্রাতে গাত্রোত্থান করিবে না।

২। মুখ প্রক্ষালন, দন্তধাবন, জিহ্বা নির্লেখন, শৌচক্রিয়া—দেবদেবীর আরাধনা না করিয়া কোথাও যাত্রা করিবে না।

৩। তিথিবিশেষে যে সকল দ্রব্য নিষিদ্ধ, তাহা গায়ের জোরে সেই সেই তিথিতে [illegible] করিবে না।

[illegible] মঘা, বারদোষ প্রভৃতি নিষিদ্ধ সময়গুলি যথাসাধ্য মানিয়া [illegible] কার অবমাননা করিবে না। মনে জানিবে অনন্ত শক্তির নিকট [illegible] অতি তুচ্ছ।

অন্ধ, খঞ্জ, বধির প্রভৃতিকে দেখিয়া হাসিবে না বা উপহাস করিবে

না; মনে রাখিবে ঐরূপ অবস্থা তোমারও হইতে পারে।

৬। বাজারের দূষিত ও ভেজাল খাদ্য সাধ্য সত্বে গ্রহণ করিবে না। পিপাসার্ত্ত হইলে একখণ্ড মিছরী গালে ফেলিয়া জল পান করিবে অথবা ইক্ষু রসাদি পানে পরিতৃপ্ত হইবে।

৭। গুরুনিন্দা, পরগ্লানি—গৃহকলহ সর্ব্বদা অশুভ।

৮। একটু ক্ষুধা রাখিয়া আহার করিবে—অজীর্ণ অম্লাদি পীড়া হইবে না।

৯। গাত্রত্বক্ সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবে। মাথার কেশগুলি যেন রুক্ষ বা বিশৃঙ্খল ভাবে না থাকে।

১০। মন সর্ব্বদা শুচি ও সংযত রাখিবে। হিংসা দ্বেষাদি বর্জ্জিত হইলে দীর্ঘজীবী হওয়া যায়।

১১। প্রবৃত্তি অনুসারে ভোজন করিবে।

১২। দিবারাত্রি মধ্যে অন্ততঃ ৩।৪ ঘণ্টা আমোদপ্রমোদে যোগদান করিবে, দুই ঘণ্টা ব্যায়াম করিবে। কোনও রূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে না।

১৩। শৌচে বসিয়া বা আহারের সময় কথা কহিবে না, যেখানে সেখানে থুথু ফেলিবে না।

১৪। বর্ত্তমান অবস্থায় সদা সন্তুষ্ট থাকিবে। মনে রাখিবে জগদীশ্বর যাহা তোমাকে দিয়াছেন, তাহাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট।

১৫। মাথা ধরিলে ঠাণ্ডা বাতাস লাগাইবে—দুই রগে তেজপাতা বাটিয়া বা নেকড়ার জলপটী বাঁধিবে।

১৬। গৃহচ্ছিদ্র কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। যে তোমার গুপ্তকথা শুনিতে অধিক আগ্রহবান, তাহা হইতে দূরে থাকিবে—প্রবাদ বচনে আছে:—

"হেসে হেসে কথা কয়—কাছে ঘেঁসে বসে।
কথা দিয়ে কথা নিয়ে প্রাণ বধে শেষে॥"

১৭। ডাক্তার বৈদ্যের নিকট নিজ চিকিৎসার অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বাহাদুরী দেখাইবার চেষ্টা করিও না; কারণ তোমা অপেক্ষা অনেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ জগতে বিদ্যমান।

১৮। কোনও কারণে প্রাণ ব্যাকুল হইলে বা মনে শঙ্কা জন্মিলে মাত্র জগদীশ্বরকে ডাকিবে। এক মনে ডাকা চাই।

১৯। প্রত্যেকেরই একটী করিয়া নির্জ্জন গৃহ থাকা চাই। অবকাশ কালে অন্ততঃ এক ঘণ্টাও বিশ্বপতি্র চিন্তা করা উচিত।

২০। "হায় আমি মরিয়া যাইব" এরূপ ভাবনা মনে আনিও না তাহাতে অল্পায়ু হইতে হয়।

২১। জগতের কার্য্য কারণ প্রণালী যখনই সময় পাইবে, তখনই ভাবিয়া দেখিবে—ইহাতে অভিজ্ঞতা জন্মে।

২২। পর্য্যুষিত অন্ন—পচা তরকারী কখনও খাইবে না, কারণ নানা কারণে উহারা বিষাক্ত হইতে পারে।

২৩। চিকিৎসকের উপর ষোল আনা বিশ্বাস না থাকিলে কখনও আত্ম-সমর্পণ করিবে না। চিকিৎসকের অপযশ ঘোষণা কদাচ করিবে না।

২৪। কোনও অসম্ভব বিষয় দর্শন করিলেও তাহা অন্যের নিকট প্রকাশ করিবে না।

২৫। চিকিৎসককে পিতৃতুল্য জ্ঞান করিয়া রোগবিবরণ প্রকাশ করিবে।

শ্রীমতী হীরাপ্রভা দেবী। কলিকাতা।

(প্রেরিত)

দ্বিতীয় প্রতিবাদ।



মাননীয় শ্রীযুক্ত আয়ুর্ব্বেদ-বিকাশ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয় !

গত পৌষ মাসে প্রকাশিত আয়ুর্ব্বেদ-বিকাশে শ্রীযুক্ত আশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় স্বয়ংই যে আমার প্রতিবাদের কৈফিয়ৎ দিতে অবতরণ করিয়াছেন ইহা অবশ্য সুখের বিষয় বটে, কিন্তু আমার ভাগ্যদোষেই হউক আর তাঁহার মিতভাষিতার গুণেই হউক ঐ কৈফিয়ৎ আমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই।

আশুতোষ বাবু রঘুবংশের কথম্ভূতী টীকার ন্যায় প্রশ্নের আম্রেড়ন পূর্ব্বক স্বমুখোদগীর্ণ নিগূঢ় কথাটার অর্থপ্রকটনে প্রভূত প্রয়াস পাইয়াছেন। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এবিষয়ে এতটা পণ্ডপরিশ্রম না করিলেই ভাল হইত। তিনি

মন্তব্য মহাবাক্যাংশটীর যেরূপ মহাভাষ্য করিয়াছেন বলা বাহুল্য, তাহা পঞ্চম বর্ষীয় অন্ধবিশ্বাসী বালকের নিকট তিন রাজপুত্রের অদ্ভুত গল্প কথনের মত কূপদর্শী লোকের নিকটই শোভা পায়।

তাঁহার মতে আয়ুর্ব্বেদ চতুর্ব্বেদের অন্তর্ভুক্ত নহে। তিনি এই মনত অবলীলা ক্রমে বুঝাইতেছেন "আচ্ছা চতুর্ব্বেদ কি কি ? সাম, ঋক্, যজু, অথর্ব্ব। কই এর মধ্যে কি আয়ুর্ব্বেদের নাম গন্ধ আছে ? ইত্যাদি" আমার প্রশ্নের কিঞ্চিন্মাত্রও যোগ্যত্ব ও গুরুত্ব নাই ভাবিয়া আশুতোষ বাবু হেলায় উহার একটা উত্তরাভাষ দিয়া স্বয়ং সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণে ও মদীয় প্রশ্নের অযোগ্যতা প্রতিপাদনে উদ্যুক্ত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয়, তিনি যে ভাবে কথাটা বুঝাইয়া দিয়াছেন স্থূল দৃষ্টিতে তাহাতে কোনও জিজ্ঞাস্য বিষয় নাই বটে, কিন্তু উহার ভিতর আমার প্রশ্নের কারণ দেদীপ্যমান।

"আয়ুর্ব্বেদ চতুর্ব্বেদের অন্তর্ভুক্ত কি না ইহা লইয়াই ভোলানাথ বাবু আকুল হইয়াছেন—মল্লিখিত বাক্যটীর ভাবার্থও ভাবিবার অবকাশ ঘটে নাই" এই বলিয়া আশু বাবু যে আক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা বড় মিথ্যা নহে। তিনি যখন আয়ুর্ব্বেদকে চতুর্ব্বেদ হইতে বহিষ্কৃত করিতে উদ্যত হইয়াছেন তখন তাহা লইয়া অন্ততঃ একজন আয়ুর্ব্বেদ সর্ব্বস্বও যদি আকুল না হয় তাহা হইলে এই দুর্দিনে যে সনাতন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র একবারে নিরাকুল ও নিরালম্ব হইয়া উঠে ? আয়ুর্ব্বেদাশ্রিত সুবিজ্ঞ বৈদ্যধুরন্ধরগণ আশু বাবুর এই অভূতপূর্ব্ব-অদ্ভুত কথাতে অদ্যাপি যে ব্যাকুল হইয়া উঠেন নাই ইহাই দুঃখের বিষয়। তবে তাঁহার ঐ মহাবাক্যটীর আবার গূঢ় ভাবার্থটী যে কি তাহা ভাবগ্রাহী অন্তর্য্যামী জনার্দ্দনই জানেন। উহা মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য।

বেদ চারিখান। ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব। ইহা কে না জানে ? বাল্য কালে পাঠশালাতে যখন সংখ্যা গণনাপ্রণালী শিক্ষা দেওয়া হয় তখন হইতেই 'একে চন্দ্র' 'দুয়ে পক্ষ' 'তিনে নেত্র' 'চারে বেদ' ইত্যাদি বলিয়া এ সংবাদ অল্প বয়স্ক শিশুর হৃদয়েও নিগূঢ়রূপে সন্নিবেশিত হইয়া থাকে। তবে ইহার মধ্যে আয়ুর্ব্বেদের নাম নাই সত্য, কিন্তু গন্ধ জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। আশুবাবু একটু ধীরভাবে স্থির চিত্তে প্রণিধান করিয়া অনুসন্ধান করিলেই প্রজ্ঞানাসিকার দ্বারা অবশ্যই ইহার উপলব্ধি করিতে পারিতেন।

অথর্ব্ববেদ যে চতুর্ব্বেদের অন্তর্ভুক্ত ইহাতে বোধ হয় কেহই শিরঃ সঞ্চালন করিবেন না এবং গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। এখন দেখা যাউক আয়ুর্ব্বেদ কোনও বেদের অন্তর্ভুক্ত কি না অর্থাৎ অবয়ব বটে কি না। আয়ুর্ব্বেদ যে অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গরূপে অবয়ব ইহা আমি পূর্ব্ববারের প্রতিবাদ পত্রে প্রমাণিত করিয়াছি। এ বিষয়ে আয়ুর্ব্বেদে আরও প্রমাণ আছে যথা—"ব্রহ্মা বেদাঙ্গমষ্টাঙ্গমায়ুর্ব্বেদ মভাষত। পুরোহিত মতে তস্মাদ্ বর্ত্তেত ভিষগাত্মবান্॥" বেদত্ব নিবন্ধন আয়ুর্ব্বেদও যে অপৌরুষেয় ও নিত্য ইহাও নিম্নোক্ত শ্লোকাংশ হইতে ব্যক্ত হয় "ব্রহ্মা স্মৃত্বায়ুষো বেদং প্রজাপতিমজিগ্রহৎ।" এখানে যে কৃত্বা প্রভৃতি পদ প্রয়োগ না করিয়া স্মৃত্বা ক্রিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে ইহাই ইহার মৌলিকবেদের ন্যায় নিত্যত্ব প্রতিপাদক। কারণ বেদের কেহ কর্ত্তা নাই, স্মর্ত্তা সকলেই হইতে পারেন। ইহাই শাস্ত্রের মত। উক্তং চ—"ন চ বেদস্য কর্ত্তারঃ স্মর্ত্তারঃ সর্ব্ব এব হি।" ইতি মীমাংসকাঃ। যা'ক এবিষয়ে আর অধিক প্রমাণের প্রয়োজন নাই।

চারি বেদের নামের মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে আয়ুর্ব্বেদের নামোল্লেখ নাই কাজেই উহা চতুর্ব্বেদের অন্তর্ভুক্ত নহে এই বুদ্ধিই আশু বাবুকে দিশাহারা করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু তাঁহার বুঝা উচিত ছিল যে, অথর্ব্ব বেদের শরীর যখন আয়ুর্ব্বেদাদি উপাঙ্গ প্রভৃতি অবয়ব দ্বারা পরিপুষ্ট তখন আয়ুর্ব্বেদাদিকে চারি বেদের অপাংক্তেয় করিলে চলিবে কেন? বট বৃক্ষ বলিলে বট বৃক্ষ শব্দ মাত্র বুঝা যায় কি বট বৃক্ষ শব্দার্থ—মূল কাণ্ড শাখা প্রশাখা পত্রাদির সমষ্টি স্বরূপ কোনও বৃক্ষ বিশেষকে বুঝা যায়? কেবল শব্দ দ্বারা কোনও বস্তুর বোধ জন্মে না। তাহার অর্থই বুদ্ধির বিষয়ীভূত। শব্দতে অর্থ নিত্য বিদ্যমান। "নিত্যঃ শব্দার্থসম্বন্ধঃ।" ইতি মীমাংসকমতম্। এই জন্য শব্দশ্রুতিমাত্রেই তাহার অর্থ গ্রহণ করিলে বিশেষ প্রতিপত্তি জন্মে। অতএব বটবৃক্ষ বলিলে তাহার উক্তরূপ অর্থ বিশেষই বুদ্ধির গ্রাহ্য বিষয় হইয়া থাকে। শুদ্ধ শব্দ গ্রাহ্য নহে। এইরূপ অথর্ব্ববেদ বলিলে কেবল (অর্থহীন) অথর্ব্ববেদ শব্দ বুদ্ধির গ্রাহ্য বস্তু হইতে পারে না। উহা যে যে উপাদানের সমষ্টিস্বরূপ তৎতদুপাদানই প্রতিপত্তির হেতু। সমুদায় গ্রহণ করিব, অবয়ব গ্রহণ করিব না ইহা উন্মত্তপ্রলাপ ভিন্ন কি হইতে পারে? কারণ অবয়ব লইয়াই সমুদায়। অবয়বকে সার্থক

করিলে সমুদায়ও অর্থবান্ হইবে এবং অবয়ব নিরর্থক হইলে সমুদায়ও নিরর্থক হইবে ইহা একটী সুপ্রসিদ্ধ লৌকিক ন্যায়। তথাচ—(১) "যেষাং সঙ্ঘাতা অর্থবন্তোঽবয়বা অপি তেষামর্থবন্ত" ইতি ন্যায়ঃ তদ্‌যথা—একশ্চক্ষুষ্মান্ দর্শনে সমর্থস্তৎসমুদায়শ্চ শতমপি সমর্থম্, একশ্চ তিল স্তৈলদানে সমর্থ-স্তৎসমুদায়শ্চ খারীশতমপি সমর্থম্॥ (২) "যেষাং পুনরবয়বা অনর্থকাঃ সমুদায়া অপি তেষা-মনর্থকা" ইতি ন্যায়ঃ। তদযথা—একোঽন্ধো দর্শনেঽসমর্থস্তৎসমুদায়শ্চ শতমপি দর্শনে অসমর্থম্, একা সিকতা তৈলদানে অসমর্থা তৎসমুদায়শ্চ খারীশতমপ্য-সমর্থম্। আর একটী ন্যায় এই যে—যে বস্তুর সমুদায় যে কার্য্যে ব্যাপৃত সেই বস্তুর যাবতীয় অবয়বও সেই কার্য্যে ব্যাপৃত। তথাচ—(৩) "অভ্যন্তরাশ্চ সমুদায়েঽবয়বা" ইতি ন্যায়ঃ যথা বৃক্ষঃ প্রচলন্ সহাবয়বৈঃ (শাখাপত্রাদিভিঃসহ) প্রচলতি তথা প্রকৃতেঽপিবোধ্যম্। আর একটী বাক্য উক্ত আছে যে—"সমুদায়েষু হি প্রবৃত্তাঃ শব্দা অবয়বেষ্বপি বর্ত্তন্তে" যথা ঘৃতং ভুক্তং তৈলং ভুক্ত-মিত্যাদি। অতএব অথর্ব্ব বেদ সমুদায়ে যদি চতুর্ব্বেদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে তবে তাহার অবয়ব (উপাঙ্গ) আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতিও যে নিতরাং চতুর্ব্বেদের অন্তর্ভুক্ত ইহা কোন্ চেতস্বান্ ব্যক্তি একবাক্যে স্বীকার না করিবেন। ইহাতেও কি আশুতোষ বাবুর আশুতোষ লাভ হইবে না?

আশু বাবু অবয়বটা বাদ দিয়া কাহাকে লইয়া সমুদয়টা বজায় রাখিবেন? পেঁয়াজের খোসা বাদ দিতে গেলে শেষে যাহা লাভ হয় অথর্ব্ব বেদ হইতে আয়ুর্ব্বেদাদি বাদ দিতে গেলে (বাদ না দিলে পূর্ব্বোক্ত ন্যায়ানুসারে অবয়বত্ব বশতঃ আয়ুর্ব্বেদের চতুর্ব্বেদের অন্তর্ভুক্তত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য হইয়া পড়ে) কি সেই অবস্থায়ই দাঁড়ায় না।

কোনও বস্তু অবয়ব মাত্রে গ্রহণ করিলে সমুদায় গ্রহণ না করিতেও পারা যায়, কারণ অবয়বসমূহের মধ্যে কতকগুলি মাত্র লইলেও কতকগুলি না লইলেই সমুদায় গ্রহণের অভাব হয়। কিন্তু সমুদায়ে গ্রহণ করিলে অবশ্যই সমস্ত অবয়বও গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ যাবতীয় অবয়বসমষ্টিই সমুদায় পদবাচ্য। সমুদায়ে যে শক্তির আরোপ করা যাইবে অবয়বেও সেই শক্তি অংশাংশ ভাবে অবশ্যই বিদ্যমান থাকিবে! অথর্ব্ববেদ (সমুদায়) যদি চতুর্ব্বেদের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহা হইলে তাহার উপাঙ্গ (অবয়ব) আয়ুর্ব্বেদও কি দোষে চতুর্ব্বেদের

অন্তর্ভুক্ত না হইবে ?

তাহার পর তিনি আত্রেয় সংহিতার দোহাই দিয়া যে একটী গল্পের সমাহার করিয়াছেন—তাহা যে কোন্ যুগের আত্রেয় সংহিতায় আছে বুঝিলাম না। কারণ অত্রি মুনি প্রণীত সংহিতার আদ্যোপান্তে কোথাও এরূপ কাহিনী দেখিতে পাই না। অত্রি মুনির সংহিতা একখান স্মৃতি গ্রন্থ মাত্র। তাহাতে এই বা এইরূপ কোনও কাহিনীই স্থান পায় নাই। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় আত্রেয় সংহিতার নামমাত্রই শ্রবণ করিয়াছিলেন চক্ষে দেখা ঘটে নাই বলিয়াই মনে হয়। তবে তিনি এই আত্রেয় সংহিতা কথার **ভাবে** যদি অন্য আর কোনও গ্রন্থকে উদ্দেশ করিয়া থাকেন তবে ভাবগ্রাহী তিনিই জানেন। আমরা এভাবে বঞ্চিত। আয়ুর্ব্বেদ পঞ্চম বেদ বলিয়া কথিত হইয়াছে ইহাও বড় শুনা যায় না। চারি বর্ণ ব্যতীত যেমন পঞ্চম বর্ণ নাই সেইরূপ চারিবেদ ব্যতীত পঞ্চম বেদ নাই। তবে পূর্ব্বাচার্য্যগণ মহাভারতের প্রশংসার জন্যই "ভারতং পঞ্চমো-বেদঃ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে প্রকৃতপক্ষে মহাভারত একটী বেদ নহে। তবে তাহার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্যের অত্যন্ত সাদৃশ্য বশতঃই ঐরূপ উহার প্রশংসা প্রখ্যাপিত হইয়াছে মাত্র। আরও আয়ুর্ব্বেদ যদি পঞ্চম বেদ হয় তবে গন্ধর্ব্ববেদ কি ষষ্ঠ বেদ হইবে এবং ধনুর্ব্বেদ কি সপ্তম বেদের স্থান অধিকার করিবে ?

আয়ুর্ব্বেদ বেদের অন্তর্গত ইহা ঐ শব্দটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যায়। ইহা অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত। এইরূপ ধনুর্ব্বেদ গান্ধর্ব্ববেদও চতুর্থবেদ অথর্ব্ববেদের অবয়ব। বটবৃক্ষ যে বৃক্ষের অন্তর্ভুক্ত হইয়া 'বটবৃক্ষ' এই শব্দ শ্রুতিমাত্রই বালকেরও হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। কিন্তু আশু বাবু হয়ত বলিতে পারেন যে "বটবৃক্ষ বৃক্ষান্তর্ভুক্ত না হইলেও উহা আমাদেরই আদরের বস্তু ইত্যাদি।" এই কথা তিনি অবশ্য গূঢ় (অন্যের অগোচর) ভাবার্থতায় করিয়াই প্রকাশ করিবেন ও প্রমাণের স্রোতও বহাইয়া দিতে পারিবেন ; সে শক্তি আমাদের নাই।

এক্ষণে বিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছেন যে আশু বাবু যে অদ্ভুত কথাটা লিখিয়া ফেলিয়াছেন তাহার রক্ষণার্থে যে যুক্তি বা অর্থ দেখাইয়া-ছেন,তাহা কেবল কুশকাশাবলম্বন ন্যায়ের দৃষ্টান্ত মাত্র হইয়া পড়িয়াছে। তিনি

শাক দিয়া মাছ ঢাকাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। যাহা হউক তিনি এখন প্রবাসী। সঙ্গে পুঁথী পত্র কিছুই নাই। তাই যথাযথ উত্তর দিতে অসমর্থ। দেশে ফিরিয়া পুঁথী পত্র মন্থন করিয়া সঠিক তত্ত্ব দিবেন লিখিয়াছেন। অপিচ ইহা তাঁহার পহেলা নম্বরের কৈফিয়ৎ মাত্র। এজন্য এখন তাঁহাকে এবিষয়ের জন্য আর বেশী বিরক্ত করিতে ইচ্ছা করি না। তবে নিরপেক্ষ সুধীসমাজে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমার এইবারের প্রতিবাদে যে সকল যুক্তি ও প্রমাণ দেখান হইল তাহা যুক্তিযুক্ত বটে কি না তাহার বিচার করিবেন এবং লেখক মহাশয়কেও সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে,—তিনি যেন বাদিনিরাসক বাক্যাবলী মাত্র প্রয়োগ না করিয়া মদীয় এই সকল প্রমাণ প্রয়োগের যথাযথ প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া স্বীয় মত রক্ষায় যত্নবান্ হয়েন। কোনও বিষয়েই অযথা জিদ ভাল নহে। চির প্রসিদ্ধ সনাতন বাক্যের অন্যথা করাও বিশেষজ্ঞের উচিত নহে। *

আশ্রব—শ্রীভোলানাথ দাশ গুপ্তঃ।
পোঃ বিষ্ণুপুর, জেলা বাঁকুড়া।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধসমূহ অধিকতর সুলভ করিবার উপায়। (প্রেরিত)

(ষষ্ঠ বৈদ্যসম্মেলনের জন্য লিখিত)

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধসমূহ অধিকতর সুলভ করিতে হইলে, পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় যৌথ কারখানা স্থাপন করিয়া ঔষধ প্রস্তুত করা উচিত। যৌথ কারখানা স্থাপন করিতে হইলে, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকেরা ঐ কারখানার অংশ ক্রয় করিবেন। এইরূপে অংশীদারগণের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থ দ্বারা কারখানার কার্য্য পরিচালন ও ঔষধ প্রস্তুত হইবে। ইহাতে এক দিকে চিকিৎ-

* ভোলানাথ বাবু যখন আশু বাবুর 'কৈফিয়ত' পক্ষান্তরে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, আর আশু বাবুও যখন আয়ুর্ব্বেদের বেদাঙ্গত্বে সন্দিহান নহেন, পরন্তু ভক্তিমান সুতরাং এবিষয়ে আর কোন বাদ-প্রতিবাদ প্রকাশ করা অভি-প্রেত নহে। আঃ বিঃ সং।

সকেরা ঔষধ প্রস্তুতের দায় হইতে মুক্ত হইবেন অপর দিকে তাঁহারা কারখানার প্রস্তুত ঔষধ পাইকারি দরে প্রাপ্ত হইবেন এবং কারবারের যিনি যেরূপ অংশ গ্রহণ করিবেন, তিনি তদ্রূপ লভ্যাংশ পাইবেন, পক্ষান্তরে ঔষধ প্রস্তুত করিতে চিকিৎসকদিগের যে যে সময় নষ্ট হয়, সেই সময় তাঁহারা চিকিৎসা-কার্য্যে নিয়োজিত করিতে পারিবেন। এইরূপ যৌথকারখানা স্থাপন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের জন্য সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য সদ্যঃফলপ্রদ ঔষধ সমূহের নির্ব্বাচন করা উচিত, যেন সকল আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকই আগ্রহ সহকারে ঐসকল ঔষধ ব্যবহার করেন। আয়ুর্ব্বেদ-সভা প্রথমতঃ এইরূপ ফলপ্রদ ঔষধসমূহের নির্ব্বাচন করিয়া পরে সেই সকল ঔষধ কারখানায় প্রস্তুত করাইবেন। ফলতঃ আয়ুর্ব্বেদ সভা সমগ্র ভারতবর্ষের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের একমাত্র পরামর্শ দাতা হইবেন। ঐ সভার নির্দ্ধারণ মতে ঔষধ প্রস্তুত হইবে এবং সেই সকল ঔষধের গুণ উক্ত সভা হইতে প্রকাশিত পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়া চিকিৎসকগণের মধ্যে প্রচারিত হইবে।

কবিরাজ—শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ।
১৭ নং কাশী দত্ত ষ্ট্রীট, নিমতলা, কলিকাতা।

সংবাদ সংগ্রহ।

কৃত্রিম দুগ্ধ।—কোন্সবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রিগলার সাহেব এক অভিনব দুগ্ধের কল আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার একদিকে ভূষি,খৈল ইত্যাদি দিয়া কল চালাইলে কলের মুখ দিয়া শুভ্রতরল দুগ্ধবৎ পদার্থ বাহির হয়। রাসায়ণিক বিশ্লেষণে প্রকাশ পাইয়াছে, এই কৃত্রিম দুগ্ধ খাঁটী গোদুগ্ধের ন্যায় শুভ্র ও পুষ্টিকর। কোন কোন শ্রেণীর গোদুগ্ধে একরূপ 'বোট্‌কা' গন্ধ থাকে। এ দুগ্ধে তাহা নাই। অধিকন্তু ইহা কেবল উদ্ভিদ উপাদানে তৈয়ারী বলিয়া, ইহা পূরামাত্রায় "সাত্ত্বিক" আহারীয় পদার্থের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। অষ্ট্রীয়ার হাঙ্গেরিয়া হাসপাতালের রোগীদিগকে নাকি এই কৃত্রিম দুগ্ধ সেবন করাইয়া ইহার পরীক্ষা চলিতেছে। স্যার উইলিয়ম ক্রুক্‌স প্রমুখ বিলাতের বড় বড় বৈজ্ঞানিকগণ এই দুগ্ধ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে ইহা প্রকৃত গোদুগ্ধের ন্যায় উপকারী।

ইংলণ্ডের "ল্যান্সেট" নামক সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসাবিষয়ক পত্রিকায় প্রকাশ যে, সমগ্র ইউরোপে প্রায় এক লক্ষ পরীক্ষোত্তীর্ণ উপাধিধারী চিকিৎসক আছেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশ অনুসারে হিসাব করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইংলণ্ডেই চিকিৎসকের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইংলণ্ডে ২৮ হাজার চিকিৎসক অর্থাৎ প্রতি এক সহস্র অধিবাসীর জন্য প্রায় আট জন চিকিৎসক আছেন। বুলগেরিয়াতে লোকসংখ্যার অনুপাতে চিকিৎসকের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প, দুই হাজার জন অধিবাসীর মধ্যে একজন চিকিৎসকও সকল সময় পাওয়া যায় না। জার্ম্মেণির চিকিৎসক সংখ্যা মোট ২২ হাজার অর্থাৎ প্রতি দুই সহস্র অধিবাসীর চিকিৎসার জন্য ১১ জন করিয়া চিকিৎসক আছেন। ফ্রান্সে ১৯ হাজার ৮ শত জন চিকিৎসক আছেন, তথায় প্রতি এক হাজার অধিবাসীর জন্য ৫ জন করিয়া চিকিৎসক পাওয়া যায়। ইটালীতে চিকিৎসকের সংখ্যা ১৮ হাজার ২৭০, ইটালীতে জার্ম্মাণির ন্যায় ১১ জন চিকিৎসক গড়পড়তায় দুই হাজার লোকের চিকিৎসায় নিযুক্ত আছেন।

তূলা হইতে ময়দা।—সম্প্রতি তূলার বীজ হইতে প্রস্তুত ময়দার পরীক্ষা হইয়াছে। পরীক্ষায় জানা গিয়াছে, এই ময়দা সকলেরই আহারোপযোগী। এমন কি ইহা মাংসের পরিবর্ত্তেও ব্যবহার করা যাইতে পারে কারণ মাংসের পুষ্টিকারিতা গুণ ইহাতে বিদ্যমান, অথচ মূল্য সুলভ। মাংসের যাহা প্রাণ—সেই প্রোটীন ইহাতে প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। ইহা সহজেই পরিপাক হয়। অপরদিকে ইহার আস্বাদ বেশ ভাল এবং খাইলে তৃপ্তিও হয়।

তূলার বীজ হইতে তৈল বাহির করিয়া লইলে যে খোলা অবশিষ্ট থাকে, এই ময়দা তাহা হইতেই তৈয়ারী হয়। গমের ময়দা বা ডাইল কড়াই প্রভৃতির পরিবর্ত্তে ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে না, কারণ ইহাতে পুষ্টিকর পদার্থ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে আছে বলিয়া ইহা নিরাপদে ব্যবহার করা অসম্ভব। প্রোটীন যাহাতে অধিক মাত্রায় থাকে তাহা খাইলে মানুষের দেহের ক্ষতি হয়। প্রোটীনের অল্পতাতেও যেমন ক্ষতি প্রোটীনের আধিক্যেও তেমনই দেহের ক্ষতি হয়। ইহার সহিত ৩।৪ ভাগ গমের ময়দা মিশাইয়া রুটী তৈয়ারী হইয়া থাকে।



AYURVED-BIKASH.

(স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন ও চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র)

"আয়ুঃকাময়মানেন ধর্ম্মার্থ সুখসাধনম্।
আয়ুর্ব্বেদোপদেশেষু বিধেয়ঃ পরমাদরঃ॥

কবিরাজ শ্রীসুধাংশুভূষণ সেন কাব্যতীর্থ, বাচস্পতি-
সম্পাদিত।

প্রকাশক—শ্রীকামিনীকুমার সেন, এম, এ, বি, এল।

"আর্য্যভৈষজ্য নিকেতন" ঢাকা।

তৃতীয় বর্ষ

১৩২২।

আয়ুর্ব্বেদ-বিকাশকার্য্যালয়—পাটুয়াটুলি, ঢাকা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা।

আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ।

তৃতীয় বর্ষের বর্ণানুক্রমিক সূচী।

১৩২৮ সাল।

"প্রাণোবা অমৃতম্ ।" (শ্রুতিঃ)

আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ।

(স্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন ও চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র)

"আয়ুঃকাময়মানেন ধর্ম্মার্থ সুখসাধনম্।
আয়ুর্ব্বেদোপদেশেষু বিধেয়ঃ পরমাদরঃ ॥ বাগ্ভট।

৩য় বর্ষ } চৈত্র ১৩২২ { ১২শ সংখ্যা।

বিদেশীয় চিকিৎসা তত্ত্ব।

লংঘন-চিকিৎসা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমরা এবার কেবল লংঘন দ্বারা উৎকট ব্যাধিমুক্ত কতিপয় বিদেশীয় রোগীর বিবরণ পাঠকবর্গকে উপহার প্রদান করিতেছি। প্রকৃত বৃত্তান্ত ব্যতীত কোনও অভিনব প্রণালীতে সাধারণতঃ লোকে আস্থাবান্ হয় না; তাই এই সংগ্রহ বিবৃত হইতেছে। There is nothing so conslusive as facts, প্রকৃত বৃত্তান্তের মত বিশ্বাসজনক আর কিছুই নাই—একথাটী যেমন প্রাচীন তেমনই সত্য।

নিম্নে যে কয়টী রোগীর বিবরণ দেওয়া যাইতেছে, তাহা আমেরিকার বিখ্যাত লংঘন-চিকিৎসক ডাক্তার ক্যারিংটন স্বয়ং পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লিপি-বদ্ধ করিয়াছেন। ইহাতে একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই পরিলক্ষিত হইবে যে বহুবিধ পীড়ার একই লংঘন দ্বারা প্রতীকার হইয়াছে।

১। George E. Davis. বয়স ৬১ বৎসর; ৫০ দিন অভুক্ত থাকিয়া দুরারোগ্য বাতব্যাধির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। নিম্নে তাঁহার স্বহস্তলিখিত চিঠির চুম্বক প্রদান করা যাইতেছে:—

১৫ই জানুয়ারী, ১৯০৩ সাল।

"১৯০১ সনের ১লা জুলাই আমার শরীরের দক্ষিণাঙ্গ অবশ হইয়া যায়। তার পর বৎসরও এক ভাবেই কাটিয়া গেল। এ সময় সামান্য একটু পরিশ্রম করিলেই খুব ক্লান্তি ও অত্যন্ত নিদ্রালস্য বোধ হইত। আমি এ সময় ৩০ হইতে ৩৬ ঘণ্টা পর্য্যন্তও অবাধে নিদ্রামগ্ন থাকিতাম। আমার বুদ্ধিবৃত্তি, দৃক্ ও বাক্শক্তির যথেষ্ট হানি হইয়াছিল। আমার দক্ষিণ হস্ত ও বাহু অকর্ম্মণ্য ছিল। ১৫ই আগষ্ট হইতে আমি একটু একটু করিয়া লংঘন আরম্ভ করিলাম। প্রথমতঃ দিনে দুইবার পরে ক্রমে একবার মাত্র লঘু ভোজন করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতাম। তারপর ২০শে আগষ্ট হইতে ২৯শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত একেবারে চল্লিশ দিন অনাহারে ছিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমার উপবাসের তৃতীয় দিন হইতে চত্বারিংশ দিন পর্য্যন্ত আমার ক্ষুধার উদ্রেকই হয় নাই। এসময় আমি কোনও খাদ্য পানীয় কি কোন তরল অথবা ঘন ঔষধ সেবন করি নাই। এই দীর্ঘ লংঘনকালে শরীরের সমস্তগুলি দ্বার দিয়াই শরীরস্থিত মল নিঃসারিত হইত। উদরে এত বদ্ধমল ছিল যে আমি দেখিয়া বিস্মৃত হইতাম যে এই পরিমাণ বদ্ধমল কি করিয়া এতকাল সঞ্চিত ছিল। উপবাসের সময় আমার মুখে অতিশয় দুর্গন্ধ হইত। আমার বাতব্যাধি ৫০ দিনের লংঘনে একেবারে সারিয়া গিয়াছে। আমার বুদ্ধিবৃত্তি, দৃক্ ও বাক্শক্তি আবার স্বাভাবিক হইয়াছে,আমার বাহুতে বল ফিরিয়াছে; আর সুদীর্ঘ নিদ্রার প্রয়োজন হয় না ; শরীরে এক অপূর্ব্ব লঘুতা আসিয়াছে ; আমি যেন পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি যে স্থানে কাজ করি তাহা হইতে আমার বাটীতে যাতায়াতে ১০ মাইল দৈনিক হাটিতে হয়। যাঁহারা আমার মত এই ব্যাধিগ্রস্ত তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া এই চিঠিখানি পড়িবেন।"

"উপবাসের সময় মুখে অতিশয় দুর্গন্ধ হইত" ইহা প্রত্যেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। এতদ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে,—প্রকৃতি যে কোনও পথ দিয়াই হউক না কেন,অতি ভোজনের গুরুভার হইতে বিশ্রামের অবসর পাইলে শরীরস্থিত বদ্ধ সঞ্চিত মলরাশি নিষ্কাসিত করিয়া দিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত।

২। Ms. I. Mathews :—বয়স ৪৫ বৎসর। ইনি দীর্ঘকাল পুরাতন কফরোগে ভুগিতেছিলেন। চিরদিন ইহার যেন সর্দ্দি লাগিয়াই ছিল। বহু

কাল উপশমের কোন চিহ্ন লক্ষিত হয় নাই। পরিশেষে ইনি ২২ দিন লংঘন দিয়াছিলেন। উপবাস আরম্ভের সময় দেহের ওজন ছিল ১০০ পৌণ্ড্ অর্থাৎ প্রায় ১ মণ ৩৫ সের লংঘন শেষে তাহা ১ মণ ১২ সেরে পরিণত হয়। উপবাসের দশম দিনের পর হইতেই তাঁহার অবস্থা ভাল হইতে থাকে। দীর্ঘ লংঘনের পর পুরাতন কফ সম্পূর্ণ সারিয়াছে এবং যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে তাহাতে এ ব্যাধি পুনরাবর্ত্তন করে নাই।

৩। Rev. N. J. Lohre. বয়স ৩৫ বৎসর।

ইনি ক্রমাগত কোষ্ঠকাঠিন্য ও উদরাময় রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন এবং প্রায় ১ বৎসর কাল সুনিদ্রা লাভ করিতে পারেন নাই। কত "ঔষধ" খাইয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা ছিল না। ইনি ১০ দিন অভুক্ত ছিলেন। এই সময় রীতিমত ব্যায়ামাদি এবং নিয়মিত দৈনিক কার্য্য করিতেন। উপবাসে তাঁহার দেহের ওজন প্রায় ৬॥ সের কমিয়া গিয়াছিল। ফলে, তিনি সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়েন; তাঁহার স্বাভাবিক সুনিদ্রা ফিরিয়া আসিয়াছিল। ইহার কয়েক মাস পরও তিনি ডাঃ ক্যারিংটনকে বলিয়াছিলেন যে—তাঁহার পুরাতন শত্রু আর তাঁহাকে আক্রমণ করে নাই।

৪। Prof. F. W. Vocal instructor in Minnea polis. বয়স ৪৬ বৎসর। ইনি বহুমূত্র ও পুরাতন কফে ভুগিতেছিলেন। ইহার স্বর ভঙ্গ হওয়াতে, ইনি গির্জ্জায় সঙ্গীত শিক্ষকের কার্য্য করিতেন তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। মূত্র পরীক্ষা করাইয়া দেখিলেন যে তাহাতে মধুমেহ ও বহুমূত্র (Diabetes, Mellitus) রোগের স্পষ্ট লক্ষণসকল বিদ্যমান আছে। ইনি লংঘন চিকিৎসায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তথাপি বিশ দিন উপবাস করিয়াছিলেন। প্রথম ৫ দিনের পরই আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হইল। কফ অদৃশ্য হইয়া গেল। বুদ্ধি, বৃত্তি, বাক্ ও শ্রুতিশক্তি প্রখর হইল। সপ্তদশ দিবসে রোগী বলিলেন—তিনি এত ভাল বোধ করিতেছেন যে দীর্ঘকাল এরূপ অনুভব করেন নাই। যে সামান্য একটু জড়তা অবশিষ্ট ছিল তাহাও বিংশ দিনে চলিয়া গেল। একটা আশ্চর্য্য ঘটনা এই যে, দশম দিবসে ইনি আবার মূত্র পরীক্ষা করান তখন ইহার পূর্ব্ব মূত্র পরীক্ষক ডাক্তার বলিয়াছিলেন এই উভয় মূত্র এক ব্যক্তির হইতে পারে না! কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন! এই খল রোগের কবল হইতে

নিষ্কৃতি পাওয়ার এমন সহজ উপায় আমাদের সকলেরই সাধ্যায়ত্ত, অথচ প্রতি বৎসর এই ব্যাধিতে কত গুণী, জ্ঞানী, ধনী, সম্মানী লোক ইহ জীবন হইতে অপসৃত হইতেছেন। এই অমোঘ প্রতীকারের বহু প্রচলন হউক, দেশের স্বাস্থ্য আবার ফিরিয়া আসুক ইহাই সকলের সর্ব্বান্তঃকরণে করণীয় ও প্রার্থনীয় নহে কি ?

(ক্রমশঃ)

শ্রীকামিনীকুমার সেন।

উপনিষদের প্রাণ-বিজ্ঞান।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যম সেই পরমাত্মা পরম পুরুষের স্বরূপ ও অবস্থান বলিতেছেন,—তিনি সুকৃতের সর্ব্বোত্তম ফল ভোগ করিয়া থাকেন এবং জগতের পরম গুহ্য হৃদয়ের পবিত্র কন্দরে প্রবিষ্ট আছেন। ছায়া এবং আতপের যে রূপ তিনিও সেই প্রকার। যিনি সাত্ত্বিকগণের সেতু, পরম ব্রহ্মাক্ষর এবং সংসারার্ণবতরণাভিলাষী জনগণের যিনি অভয়প্রদ পার স্বরূপ তাঁহার বিষয়ই আজ তোমার সমক্ষে উপস্থিত করিব। দেখ, আত্মাকে রথী এবং শরীরকে রথ এবং বুদ্ধিকে সারথি এবং মনকে তাহার রশ্মি (বন্ধনরজ্জু) স্বরূপ বিদিত হইবে। ইন্দ্রিয়সকল সেই রথের অশ্ব, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়সকল তাহার বিচরণ স্থান। এইরূপ আত্মা ইন্দ্রিয় মনোযুক্ত যে দেহ তিনিই সুখ দুঃখাদি ফলভাগী। অর্থাৎ আত্মাই একমাত্র কর্ত্তা। যে ব্যক্তি অসমাহিত চিত্ত ও বিজ্ঞানবিহীন হয়, তাহার ইন্দ্রিয়সকল দুষ্টাশ্বের ন্যায় অদম্য হইয়া উঠে। আর যিনি বিজ্ঞানবান এবং সুমনা তাহারই ইন্দ্রিয়সকল উত্তমাশ্বের ন্যায় বশীভূত থাকে, পরন্তু কুপথগামী হয় না। যে বিবেক পরিশূন্য অসংযতমনা ও সদা শৌচাচার পরিভ্রষ্ট এমন ব্যক্তি কদাচ তাঁহাকে বুঝিতে পারে না পরন্তু পুনঃ ২ জন্মলাভ করিয়া থাকে। যিনি বিবেক বুদ্ধি পরায়ণ, মন যাহার বশীভূত ও সদা শৌচসম্পন্ন তিনিই সেই পরমাত্মাকে জ্ঞাত হইতে পারেন, পুনঃ ২ জন্মগ্রহণের ভয়ও থাকে না। সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইতে হইলে বিজ্ঞান বুদ্ধিকে সারথি ও মনকে অশ্ববন্ধন রজ্জুর আকারে পরিণত করিতে হয়।

ইন্দ্রিয় হইতে বিষয়সমূহ শ্রেষ্ঠ, বিষয় হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি এবং বুদ্ধি হইতে আত্মা শ্রেষ্ঠ। সেই মহান আত্মা হইতে জগতের কারণভূতা অব্যক্তা প্রকৃতি শ্রেষ্ঠা, আবার সেই অব্যক্ত হইতেও পুরুষ অর্থাৎ ভগবান শ্রেষ্ঠ, তিনিই সামান্ত, তিনি সর্ব্বোত্তমা গতি। সেই পুরুষ সর্ব্বভূতেই গূঢ়রূপে বিদ্যমান হেতু সকলের দৃষ্টিগোচরে আসে না, কেবল সূক্ষ্মদর্শী মহাত্মগণই সূক্ষ্মবুদ্ধিপ্রভাবে তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন।

বুদ্ধিমান ব্যক্তি বাক্যকে মনে, মনকে জ্ঞানে,জ্ঞানকে আত্মায় এবং আত্মাকে পরমাত্মায় নিয়ন্ত্রিত করিবেন।

সকলেরই জড়তা দূর করিয়া সর্ব্বদা উন্নতি মার্গে আরোহণ করিতে সচেষ্ট হইতে হইবে, কিন্তু উন্নতির সোপানগুলি ক্ষুরের ধারার অতি সুতীক্ষ্ণ অতএব দুস্তর এবং দুর্গম। তবে উপায় ? উপায় মাত্র বিজ্ঞজনের সদুপদেশ, তাহাতেই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। সেই আত্মা-পরমাত্মা শব্দও স্পর্শহীন তাঁহার কোন রূপ নাই কিন্তু ক্ষয়ও নাই, তাহাতে কোন রস বা গন্ধ নাই, তিনি অনাদি,অনন্ত. তাদৃশ মহান্ আর কিছু থাকিতে পারে না, এমন যে অব্যক্ত পুরুষ তাঁহার উপাসনা করিয়া সাধুগণ মৃত্যুমুখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
দুর্গং পথস্তৎকবয়ো বদান্ত ॥
অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥

ইন্দ্রিয়সকল স্বভাবতঃ বহির্ম্মুখী হইয়া সৃষ্ট হয়। তাহারা বাহ্য বিষয়ের অনুভব করিয়া থাকে অন্তরাত্মার বিষয় মাত্রই উপলব্ধি করিতে পারে না. অমৃতত্ব লাভে ইচ্ছা করিয়া কোন কোন জ্ঞানী ইন্দ্রিয় সকলকে বাহ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত ও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন করিয়া প্রত্যগাত্মার দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। বালক সদৃশ মূঢ় জনেরাই বাহ্য অসার ভোগে আকৃষ্ট হইয়া মৃত্যুপাশে বদ্ধ হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি অমৃতের সন্ধান পাইয়া অধ্রুব অসার বিষয়ে আকৃষ্ট হয়েন না।

রূপ ,রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ও মৈথুনাদি 'এই পরমাত্মপ্রসাদেই বোধ হইয়া থাকে, সুতরাং তাঁহাকে এই ভাবেই জানিতে হয়। নিদ্রা এবং জাগরণ

এতদুভয়ের মধ্যে যে মহাপুরুষকে সাক্ষাৎ করা যায়, তিনিই আত্মা এবং প্রভু ইহা চিন্তা করিয়াই নশ্বর দেহাদি বস্তুর জন্য জ্ঞানিগণ শোকাতুর হয়েন না। যিনি এই সুমধুর ও চির মঙ্গলসর্ব্বস্ব আত্মাকে জীবসমুদায়ে নিরীক্ষণ করেন, তিনি কথনও দুঃখভাগী হইতে পারেন না। যাহা হইতে সমুদয় চরাচর উৎপন্ন অথচ যাঁহার স্রষ্টা নাই, গুহামধ্যে যাঁহার অবস্থান অথচ সর্ব্বভূতের কারণ তিনিই প্রাণ-বায়ুরূপে জীবে প্রবিষ্ট। এই যে অগ্নিদেব যাহাকে মনুষ্যগণ নিয়ত উপাসনা করে, কাষ্ঠদ্বয়ে যাহার অবস্থিতি সেই জাতবেদা অগ্নিই তোমার জিজ্ঞাসিত বস্তু। এই যে সূর্য্যদেব একবার উদিত হয়েন, একবার অস্তাচলে গমন করেন, ইহাও সেই ভগবানের লীলা ; কেহ তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। এই দেহে যিনি আছেন, স্বর্লোকেও তিনিই আছেন এবং এক। যে ব্যক্তি ইহা ভিন্ন ভাবে দর্শন করে, সেই আমার আশ্রয়ে আসে অর্থাৎ মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।

তিনি অঙ্গুষ্ঠমাত্র, হৃদয় মধ্যে অবস্থান করেন। তিনিই সর্ব্বকাল সর্ব্বময় কর্ত্তা ও নির্ম্মল জ্যোতিবিশিষ্ট। বিশুদ্ধ জলমধ্যে যেমন বিশুদ্ধ জল মিশ্রিত হয়, আত্মাও সেইরূপ। এইপ্রকার আত্মাকে যাঁহারা পৃথকভাবে কল্পনা করেন, তাহারাই অধোমার্গে নিপতিত হয়। একাদশদ্বার সমন্বিত এই দেহই পরমাত্মার আশ্রয়। তিনি নির্দ্দোষ ও সারভূত। বায়ুতে, নিখিতে, অন্তরীক্ষে, সর্ব্বেন্দ্রিয়ে, বেদিতে, অতিথিস্বরূপে, সোমরসে, মানবে, বেদে, প্রকৃতি সমূহে, জলজাত দ্রব্যে, স্থানে, ক্ষিতিজ দ্রব্যে, অদ্রিজ দ্রব্যে, তেজে ও দেবসমূহে বিদ্যমান আছেন। তিনিই সত্য ও মহান্।

অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ হৃদয় মধ্যে সমাসীন থাকিয়া প্রাণ বায়ুকে উর্দ্ধে ও অপান বায়ুকে অধোদিকে চালনা করেন, সমুদয় দেবগণ এই বামন পুরুষকেই উপাসনা করিয়া থাকেন। স্থূল দেহ নষ্ট হইয়া গেলেও আত্মা কখনও বিনষ্ট হয় না। আরও দেখ কেহই মুখ্য প্রাণস্বরূপ প্রাণ বায়ু ও অপান বায়ু দ্বারা জীবিত থাকিতে পারে না কিন্তু এই প্রাণও অপান বায়ুর প্রেরক যিনি তৎপ্রসাদেই সকলে বাচিয়া থাকে।

মৃত্যুর পর আত্মা কি হয় এখন সেই পরমগুহ্য আত্ম (ব্রহ্ম) তত্ত্ব বর্ণন করিব। জ্ঞান ও কর্ম্মানুসারে আত্মা মনুষ্যাদি শরীর পরিগ্রহ করে, আর কেহ কেহ স্থাবর দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যিনি সুপ্তাবস্থায়ও জাগরিত থাকিয়া

নিজ নিজ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন, তিনিই বীজভূত, আত্মা-ব্রহ্ম এবং অমৃত, জগৎ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই রহিয়াছে। এক অগ্নি যেমন জগতের ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতিবিম্বিত হয়েন, তেমন সর্ব্বভূতান্তরাত্মা এক হইয়াও বাহ্যতঃ স্বতন্ত্ররূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। বায়ুর দৃষ্টান্ত ও ইহাই প্রমাণ করিতেছে। সূর্য্য লোক সমূহের চক্ষুস্বরূপ হইয়াও যেমন লোকসমূহের বাহ্য চক্ষু দোষে দূষিত হয়েন না, সেরূপ এক সর্ব্বভূতান্তরাত্মা আত্মা নামে অভিহিত হইয়াও তিনি লৌকিক দুঃখে লিপ্ত হয়েন না। তিনি কেবল বাহ্যাত্মার নিয়ন্তা। সর্ব্বভূতান্তরাত্মা এক হইয়াও বহুরূপ করিয়া থাকেন, যাঁহারা আত্মস্থ ইহাকে দর্শন করিতে পারেন তাহাদেরই নিত্য সুখ লাভ হয়। নিত্য বস্তুর মধ্যে নিত্য, চেতন সমূহের মধ্যে চেতন এবং এক হইয়াও যিনি সকলের কামনা পূর্ণ করেন, এমন আত্মস্থ পুরুষকে বিদিত হইতে পারিলেই পরমা শান্তি লাভ করা যায়। অন্যের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। তিনি কি ভাবে প্রকাশ হয়েন অথবা হয়েন না তাহা আমরা জানি না, জ্ঞানিগণ যদিও তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই, তথাপি তিনি যে পরম সুখাশ্রয় তাহা নিঃসংশয়। সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ কেহ তাহাকে প্রকাশ করিতে পারেন না অগ্নি আর সেখানে কি করিবে? তাহার প্রভা লইয়াই ইহারা প্রকাশিত হয়েন।

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভবন্তি কুতোহয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্ত মনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।
ভয়াদস্যাগ্নি স্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যু র্ধাবতি পঞ্চম।

ইন্দ্রিয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি, শ্রেষ্ঠা বুদ্ধি হইতে মহানাত্মা এবং আত্মা হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ। অব্যক্তের পর যে পুরুষ তিনি ব্যাপক ও অলিঙ্গ ইহাকে জানিতে পারিলেই প্রাণিগণ অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে।

হৃদয়ে একশত একটি নাড়ী বিদ্যমান। তন্মধ্যে এক সুষুম্না নাড়ী মস্তকে গমন করিয়াছে। সেই নাড়ী দ্বারা মানুষ, উর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হইয়া অমৃতত্ব বা মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অন্য যে শতসংখ্যক নাড়ী তাহারা মৃত্যু বা লোকান্তরের হেতু। অতএব অমৃতত্ব লাভ করিতে হইলে সুষুম্না নাড়ীকেই

প্র... করিলেন। অন্তরাত্মা পুরুষ অঙ্গুষ্ঠমাত্র তিনি সকলের হৃদয়েই সন্নিবিষ্ট আছেন, তিনি মুঞ্জরাশির মধ্যগত ইষীকাখ্য তৃণের মত শরীর হইতে পৃথক, তিনি সদা শুদ্ধ-নিষ্পাপ-অমৃতস্বরূপ।

নচিকেতা যমের নিকট এই বিদ্যা (ব্রহ্মবিদ্যা বা আত্মতত্ত্ব) এবং সমুদয় যোগবিধি প্রাপ্ত হইয়া, সর্ব্বদোষরহিত, মৃত্যুবিহীন ও অমৃতত্ব লাভ করিয়াছিলেন। অন্যেও এইরূপ অমৃতত্ব লাভ করিতে পারেন। ইতি কঠোপনিষৎ।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেণ।
তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি ॥

বৈদ্যক গ্রন্থ-বিবরণী—৩৪। মাধব সংহিতা।

গ্রন্থমধ্যে "মাধব বিরচিতা সংহিতা" গ্রন্থকারের এই মাত্র পরিচয়ই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাতে প্রথমে রোগের লক্ষণ ও তৎপরে তাহার চিকিৎসা-পদ্ধতি লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় রোগের লক্ষণসমূহে ইহা মাধব কর বিরচিত প্রসিদ্ধ "রুগ্‌বিনিশ্চয়" (নিদান) গ্রন্থেরই একমাত্র প্রতিলিপি মাত্র। গ্রন্থকারের নাম "মাধব" এবং গ্রন্থেরও নাম "মাধব সংহিতা" ইহা কি পরম বিস্ময়কর নহে? মাধব করের নিদানের প্রারম্ভে :—

"প্রণম্য জগদুৎপত্তি ... ...
... ... নিবদ্ধতে রোগবিনিশ্চয়ো হয়ং ॥"

ইত্যাদি যেমন যেমন আছে, ইহাতেও অবিকল তেমনটিই দেখিতে পাওয়া যায়। মাধব করের নিদান গ্রন্থের অন্তে রোগসমূহের যে "নাম সূচী" উল্লেখ করা হইয়াছে, এই গ্রন্থে গ্রন্থকার তাহাও ঠিক গ্রন্থের প্রথম ভাগেই সন্নিবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। তবে মাধব করের গ্রন্থ হইতে এই গ্রন্থে রোগের লক্ষণ কচিৎ কচিৎ কিছু অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

এই গ্রন্থে মাধব করের নিদান গ্রন্থোক্তক্রম অনুসারে জ্বর হইতে বিষ পর্য্যন্ত রোগসমূহের অগ্রে নিদান ও তৎপশ্চাৎ চিকিৎসাবিধি উপনিবদ্ধ হইয়াছে। তদনন্তর রসায়ন, বাজীকরণ, বমনাদি পঞ্চকর্ম্ম ও পরিভাষাও বর্ণিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ) শ্রীমথুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থ।

পল্লী-চিকিৎসক।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সুরেন—আজ **একশিরা রোগের** ঔষধ বল ঠাকুর্দ্দা।

হরি—আচ্ছা, শুনুন।

আফুলা চালিতা গাছের দক্ষিণ দিগস্থ শিকড় তুলিয়া মাদুলীর ভিতরে ভরিয়া কটীতে ধারণ করিলে উক্ত রোগ আরোগ্য হয়।

দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করিয়া—তৎক্ষণাৎ তদ্দারা হাঁচি দিয়া মুখ ধুইয়া ফেলিলেও একশিরা রোগ আরোগ্য হয়। ভোজনান্তে এরূপ করিতে হয়।

একশিরার বেদনাস্থানে নিশাদলের জলপট্টি দিলে বেদনা দূর হয়।

আমড়া বীজ বা জলপাই বীজের দুই দিক ঘসিয়া ছিদ্র করতঃ উক্ত ছিদ্রে সূতা প্রবেশ করাইয়া কোমরে ধারণ করিলে একশিরা রোগ সারে।

আফুলা শিমুল বৃক্ষের কাঁটা তুলিয়া মুখ কাটিয়া ছুড়িকাদ্বারা ছিদ্র করিতে হয়। উক্ত ছিদ্রপথে সূতা প্রবেশ করাইয়া কোমরে ধারণ করিলেও রোগ আরোগ্য হয়।

টিকটিকির লেজ তাবিজে করিয়া কোমরে ধারণ করিলে উক্ত রোগ দূর হয়।

সু—টিকটিকির লেজের কতটুকু ব্যবহার করিতে হয়?

হ—যেটুকু সামান্য আঘাতেই খসিয়া পড়ে। শনি কি মঙ্গলবারেই তাবিজ ধারণ করা বিধেয়।

দোক্তা তামাকের পাতা কদম্বপত্র রোগের সূত্রপাতে কোষে জড়াইয়া কাপড় দিয়া আটিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়; ইহাতে রোগ-যন্ত্রণা প্রশমিত হয় এবং ক্রমে সারিয়া যায়।

সু—কোনও বিশেষ নিয়ম পালন করিতে হয় কি?

হ—দিবসে অন্ন ভোজনকালে জলপান নিষিদ্ধ; অধিক পথ হাটিতে নাই। রাত্রিতে এবং অমাবস্যা কিম্বা পূর্ণিমা ও একাদশীতে অন্ন ভোজন উচিত নহে।

চৌময়না পড়া ব্যবহার করিলেও সহজে আরোগ্য হওয়া যায়।

সু—চৌময়না কি?

হ—ময়না গাছে সাধারণতঃ ডালা ভেদ করিয়া এক একটী গাঁইটে দুই বা তিনটী কাঁটা থাকে। কিন্তু কোন কোনও বৃক্ষের কশ্চিৎ ২।১ খানা ডালে একই গাঁইটের চারিদিকে ৪ চারটী করিয়া কাঁটা থাকে। এই ডালের একটী গাঁইট সংগ্রহ করিয়া কাটা কয়টী চাঁচিয়া ফেলিতে হয় এবং মজ্জার (মাইজের) ভিতর দিয়া একটী ছিদ্র করিতে হয়। শনি কিম্বা মঙ্গলবার ভাটীবেলায় পূর্ব্বমুখে বসিয়া একখানা দা'য়ের পিঠে থুথু দিয়া গাঁইটটীর একধার ঘসিতে হয় ও নিম্নোক্ত মন্ত্র পড়িতে হয় এবং সঙ্গে ২ বাম হস্ত স্বীয় শিরদাড়ার (কোমরের দিকের) উপর নাড়াচাড়া করিতে হয়। মন্ত্র একবার শেষ হইলে দা'য়ের অপর ধারে গাঁইটের অপর ধার পূর্ব্বোক্তরূপ করিতে হয় এবং তদনন্তর দা'য়ের মুখে গাঁইটের (পেটের অংশে) মধ্যবর্ত্তী ভাগ আস্তে আস্তে ঘষিতে হয়। এইরূপে "গাঁইট"টী অভিমন্ত্রিত হইয়া গেলে উহা কোমরে সূতাদ্বারা বাধিয়া ধারণ করিতে হয়। দৈব ঔষধ; বহু লোক উহার সাহায্যে আরোগ্য হইয়াছে।

সু—বিশেষ কোনও নিয়ম আছে কি ?

হ—আছে; রোগী পূর্ব্বদিক হইয়া নিরাসনে বসিয়া "কামেক্ষ্যার" নামে কিছু মানত করতঃ (/৫ পাঁচ পয়সার কম না হয়) স্বীয় কপালে ছোয়াইয়া ভক্তিভরে রোগস্থানে বুলাইয়া কোমরে ধারণ করিবেন। উক্ত প্রক্রিয়ার পূর্ব্বে উক্ত দ্রব্যটী শ্বেতচন্দন ঘষা ও সর্ষপ তৈল মিশ্রণে কিয়ৎকাল ভিজাইয়া রাখিতে হয়। কোমরে ধারণান্তে এই মিশ্র দ্রব্য বেদনাস্থানে ক্রমশঃ মালিশ করিতে হয়। অমাবশ্যা-পূর্ণিমা উপলক্ষে কয়েক মাস কাল ঐরূপ মিশ্র প্রস্তুত করতঃ মালিশ করিলে রোগ নির্ম্মূল হইয়া যায়।

সু—মন্ত্রটা ত এখনও বলিলে না দেখি ?

হ—মন্ত্রটা বিশেষ কিছু নয়। এক হইতে বিশ পর্য্যন্ত গণিয়া পুনঃ ২০ বিশ হইতে উল্টাভাবে এক পর্য্যন্ত গণিয়া আনিতে হয় মাত্র।

সু—আরোগ্যান্তে মানত আদায়ের উপায় কি ?

হ—লুটও দেওয়া যায় অথবা সুবিধা পাইলে স্থানেও পাঠান যায়।

হ—আফিং গুলিয়া তদ্দ্বারা কোষোপরি প্রলেপ দিলে কোষের জলদোষ সারিয়া যায়।

সু—এইরূপ **কোরণ্ডের** (চলিত কথায় "কুরন্ন" বলে) ঔষধ বল দেখি।

হ—কালজীরা বাটা ও রক্তচন্দন ঘসা সমভাগে লইয়া উহাতে কিঞ্চিৎ আফিং মিশাইয়া ধুতুরা কিম্বা মনসা সিজের পাতার রস দ্বারা গুলিয়া নূতন মেটে ভাণ্ডে গরম করতঃ প্রলেপ দিলে কোরণ্ড নিশ্চয় আরোগ্য হয়।

মনসা সিজের পাতার রস দ্বারা আতপ চাউল বাটিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে ভাল হয়।

আকন্দ মূলের ছাল কাঁজিসহ কিম্বা বচ ও সর্ষপ, জলের সহিত একত্র পেষণ করিয়া অণ্ডকোষে প্রলেপ দিলে ভাল হয়।

হরিতকী চূর্ণ এরণ্ড তৈলে ভাজিয়া পিপুল চূর্ণ ও সৈন্ধব চূর্ণ সহ পান করিলেও উক্ত রোগ সারে।

কোরণ্ড রোগ দূরীকরণ মানসে কেহ কেহবা কাণে ছিদ্র করিয়া দেয়।

সু—এইবার **অন্ত্রবৃদ্ধির** ঔষধ বলত দাদা।

হ—অন্ত্রবৃদ্ধি বড়ই ভয়ঙ্কর রোগ; সাধারণতঃ উহাকে 'আতার' ব্যারাম বলিয়া থাকে। অন্ত্র বৃদ্ধি পাইলে কোষমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে যে দিকের কোষ বর্দ্ধিত হয়, তাহার বিপরীত দিকের হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি মধ্যস্থ চর্ম্ম ভেদ করিয়া শলাকা দ্বারা পোড়াইয়া দিলে রোগের কথঞ্চিৎ শান্তি হয়। কোষের মধ্যে অন্ত্র প্রবিষ্ট হইয়া যদি কোষ বৃদ্ধি করে, তবে উহার প্রায়ই শান্তি হয় না।

দূর্ব্বাঘাসের শিকড় ২॥ আড়াইটা গোলমরিচ দিয়া জলসহ বাটিয়া ভক্ষণ করিলে অন্ত্রবৃদ্ধি ভাল হয়।

বেড়েলা (বাইর কলি) সহযোগে দুধ পাক করিয়া পরিমাণ মত এরণ্ড তৈল মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শূলযুক্ত অন্ত্রবৃদ্ধি দূর হয়।

আফুলা অলাবুর (লাউয়ের) শিকড় লাল সূতাদ্বারা দক্ষিণ হস্তে বান্ধিয়া দিলে কখনও এই পীড়া হয় না, রোগীর রোগও সহজেই সারিয়া থাকে।

গরম দুধ ।/০ এক ছটাক ও রেড়ির তৈল দুই তোলা একত্রে সেবন করিলে রোগ সারে।

চম্পক ফুলের ঘ্রাণ লইলে উক্ত রোগে বিশেষ উপকার দর্শে। ফুলের ভিতর ক্ষুদ্র ২ কৃমি (পোকা) থাকে, সাবধান উহা যেন নাকে ঢুকিতে না পায়।

এক টুক্‌রা চিতার মূল কোমরে ধারণ করিলে উক্ত রোগ একেবারে আরোগ্য হয়।

শুন্টের রস, গিমার রস ও ভেরেণ্ডার রস একত্র এক ঝিনুক পরিমাণে সেবন করিলে রোগ দূর হয়। প্রত্যহ প্রাতে সেব্য। দৈব ঔষধ।

সু—গ্রন্থির বিচি ফুলিলে কি করিতে হয় ?

হ—কর্ণমূলে, গলদেশে বা বাহুমূলের বিচি ফুলিলে দুই তোলা কালজিরা মনসা সিজের পাতার রসে বাটিয়া কিছু রক্তচন্দন ঘষা ও দুই আনা ওজনের আফিং উহাতে গুলিয়া দিয়া একটী নূতন মৃৎপাত্রে গরম করিয়া ফুলা স্থানে দিতে হয়। একবার ব্যবহারে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। ইহাতে পুরুষদের কুরণ্ড, একশিরা, এমন কি রস নামিয়া রমণীদের স্তনস্থান ফুলিয়া উঠিলেও উহা আরোগ্য হয়।

গোয়ালিয়া লতার পাতা ও কৃষ্ণ তিল একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে বেদনা যুক্ত গ্রন্থিবিবর্দ্ধন আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য হয়।

সু—ঠাকুদ্দা, এইবার **গলগণ্ড** রোগের ঔষধ বলত।

হ—উক্ত রোগের সাধারণ চল্‌তি নাম "গরগল"।

শুন্য লতার ডগা ৫ গোট, কচি বেউন্না পাতা ৫টী, পানিয়া লতার ডগা ১টী লইয়া একত্র উত্তমরূপে বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে গলগণ্ড ভাল হয়।

নিশিন্দার মূল জলদ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিলেও সারে।

বামনহাটীর মূল চাউলের জলসহ বাটিয়া অথবা রাখাল শশা কিম্বা শ্বেত অপরাজিতার মূল গোমূত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে গলগণ্ড আরোগ্য হয়।

সোঁদালুর মূল তণ্ডুলোদকসহ বাটিয়া উহার নস্য লইলে উক্ত রোগ দূর হয়।

হস্তীকর্ণ পলাশের মূল আতপ চাউলের জল সহযোগে বাটিয়া প্রলেপ দিলে উক্ত রোগ আরোগ্য হয়।

গলগণ্ডের উর্দ্ধ, মধ্য ও নিম্নদেশে গলার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া দুধাকনের কস দিয়া তিনটী প্রশস্ত রেখা টানিবে। প্রত্যহ ২।৩ বার করিয়া ঐ রেখার উপর দিয়া রেখা দিতে হইবে। এরূপ তিন দিন করিতে হয়। লজ্জাবতী পাতা কচ্‌লাইয়া ন্যাকড়াতে পুট্‌লী করিয়া ৭ দিন পর্য্যন্ত মধ্যে ২ উহার শ্বাস গ্রহণ করিবে। প্রত্যহ পাতাগুলি বদ্‌লাইয়া নূতন পাতা লইতে পারিলেই ভাল হয়; অন্যথা ২।৩ দিন অন্তর নিশ্চয় বদ্‌লাইবে। সংগৃহীত আকন্দ-কস পাত্রে শুকাইয়া গেলে উহা চূণের জলদ্বারা গুলিয়া লইলেই চলিতে পারে।

সু—উক্ত ঔষধের কোনও বিশেষ বিধি আছে কি ?

হ—আছে ; লজ্জাবতীর পাতা তুলিতে যেন ঐ লতার কোনও শাখা ছিড়িয়া না যায়। ঔষধ ব্যবহারের প্রথম দিন দিবারাত্রি রোগী বা রোগিণী কোনও স্ত্রীলোককে স্পর্শ করিবে না। আঠার মাস পর্য্যন্ত কোনও গলগণ্ড রোগাক্রান্ত রোগীকে না ছুইলেই ভাল হয়। শনি কিম্বা মঙ্গলবার দিন প্রথম ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়। আজ তবে আসি।

সু—আচ্ছা, আইস। (ক্রমশঃ)

শ্রীগোপীনাথ দত্ত, রাজাবাড়ী, ঢাকা।

তক্র-ঘোল-দধি।

প্রাণ রক্ষার ব্যাপারে তক্রের গুণাগুণের আলোচনা যে অতীব প্রয়োজনীয় তাহার উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। তক্র বা ঘোলের উপাদান দধি এবং দধির উপাদান দুগ্ধ। জীবমাত্রের প্রাণ ধারণের এই প্রধান উপাদান স্ত্রীজাতি হইতেই সমুদ্ভূত ;—সুতরাং জগতের জরায়ুজ সমুদয় প্রাণীই দেহের সমুৎপত্তি বিষয়েও তৎপরে শরীরের পোষণ ব্যাপারে স্ত্রীজাতির নিকটেই অচ্ছেদ্য ঋণপাশে আবদ্ধ।

তক্রের উপাদান।

আমাদের নিত্যব্যবহার্য্য দুগ্ধ প্রধানতঃ গো, মহিষ ও ছাগ জাতি হইতেই লব্ধ হইয়া থাকে। এই সকলের মধ্যেও গোই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। গরুর মল, মূত্র, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ও নবনীত প্রভৃতি সকল বস্তুই মানববর্গের ঐহিক ও হিন্দুজাতির পক্ষে পারলৌকিক শ্রেয়ঃ সাধনে প্রতিনিয়তই নিযুক্ত আছে। এই জন্যই গোজাতি হিন্দুর নিকটে প্রধান দেবতা স্বরূপে পরিগণিত হইয়াছে।

তক্রের প্রশংসা। তক্রের গুণখ্যাতির পরিবর্ণনায় মুগ্ধ হইয়া রঘুনাথ স্বকৃত "ভোজন কুতূহল" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন ;——

"কৈলাসে যদি তক্রমস্তি গিরিশঃ কিং নীলকণ্ঠো ভবেৎ
বৈকুণ্ঠে যদি কৃষ্ণতা মনুভবেদদ্যাপি কিং কেশবঃ।
ইন্দ্রো দুর্ভাগতাং ক্ষয়ং দ্বিজপতির্লম্বোদরত্বং গণঃ
কুষ্ঠিত্বং চ কুবেরকো দহনতামগ্নিশ্চ কিংবিন্দতি॥"

তক্রের ন্যায় মহদুপকারক বস্তু স্বর্গে আছে কি না, তাহা নিতান্তই সন্দেহের বিষয়! কারণ স্বর্গে তক্র থাকিলে মহাদেব "নীলকণ্ঠ" হইয়া স্বীয় কণ্ঠে বিষ ধারণ করিতেন না! স্বয়ং নারায়ণ "কৃষ্ণ বর্ণ" হইতেন না! দেবরাজ ইন্দ্রের দেহ ঘৃণিত "ভগাঙ্ক" দ্বারা পরিলাঞ্ছিত হইত না! অমৃতের আধার হইয়াও চন্দ্রের রাজযক্ষ্মা রোগ জন্মিতে পারিত না! সকলের বিঘ্ননাশক দেব গণপতি নিজেই "লম্বোদর" হইয়া আইটাঁই ছাড়িতেন না! নিখিল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াও কুবের কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া কষ্টে কালযাপন করিতেন না! অগ্নিদেবও সর্ব্বভুক হইয়া অত্যগ্নি রোগে পরিপীড়িত হইতেন না!

রাজবৈদ্য সুষেণ স্বকৃত আয়ুর্ব্বেদ মহোদধি গ্রন্থে নৃপতিকে সম্বোধন পূর্ব্বক তক্রের গুণব্যাখ্যানে বলিতেছেন;——

"শশিকুন্দসমপ্রভশঙ্খনিভং যুবতীকরনির্ম্মল নির্ম্মথিতম্।
পরিপক্ক কপিত্থসুগন্ধিরসং পিব ভো নৃপ তক্রমনন্তগুণম্॥"

হে মহারাজ, আপনি পূর্ণ শশধর, কুন্দপুষ্প ও শঙ্খের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, লাবণ্যময়ী যুবতী রমণীর সুকোমল করপল্লব সঞ্চালনে সুমথিত ও নির্ম্মলীকৃত এবং সুপক্ক কপিত্থ ফলের শোভন গন্ধ দ্বারা সুবাসিত এই সুমধুর তক্র পান করুন, কারণ অনন্ত গুণ তক্রের তুলনীয় আর কোন পদার্থই পৃথিবীতে বর্ত্তমান নাই! তক্রে অম্ল, মধুর ও কষায় এই তিন রস প্রধান ভাবে বর্ত্তমান; সুতরাং——

"অম্লেন বাতং মধুরেণ পিত্তং কফং কষায়েন নিহন্তি সদ্যঃ।
যথা সুরাণামমৃতং হিতায় তথা নরাণামিহ তক্রমাহুঃ॥" (ইন্দ্রকোষ।)

অম্লরস বাতনাশক, অম্ল গুণ (মধুরও বটে) থাকাতে তক্র বাত নাশ করিয়া থাকে। মধুর রস পিত্তনিবারক, সুতরাং তক্র সেবনে পিত্তের উপশমও হইয়া থাকে। কষায় রস শ্লেষ্মার প্রতিদ্বন্দ্বী, এইজন্য তক্র ব্যবহারে কফেরও শান্তি হয়। সুতরাং স্বর্গে দেবতাদিগের যেমন অমৃত, এই মর্ত্ত্যধামেও সেইরূপ মানবের হিতার্থই তক্রের আবির্ভাব হইয়াছে।

তক্রের প্রকার ভেদ।

সুশ্রুত দুইপ্রকার ঘোলের কথা বলিয়াছেন; যথা————

"মন্থনাদি পৃথগ্‌ভূত স্নেহমর্দ্ধোদকস্তু যৎ।
নাতিসান্দ্রদ্রবং তক্রং স্বাদ্বম্লং তুবরং রসে॥
যত্তু সস্নেহ মজলং মথিতং ঘোলমুচ্যতে॥"

যাহা হইতে মন্থন পূর্ব্বক স্নেহ অংশ তুলিয়া লওয়া হয় এবং যাহাতে অর্দ্ধাংশ জল বর্ত্তমান থাকে, যাহা খুব ঘনও হয় না অথবা খুব পাতলাও হয় না এবং যাহাতে অম্ল, মধুর ও কষায় রস বর্ত্তমান থাকে, তাহাই "তক্র।"

যাহাতে স্নেহ অংশ বর্ত্তমান থাকে, উহা মন্থন পূর্ব্বক তুলিয়া লওয়া হয় না, তাহার নাম "ঘোল।"

সুশ্রুতের মতে তক্র ও ঘোল, তক্রের এই দুই প্রকার ভেদ পরিকল্পিত হইয়াছে। হারীত সংহিতায় দেখিতে পাইতেছি ;——

তক্র তিন প্রকার, রোগভেদে তাহার প্রয়োগবিধি কথিত হইতেছে।

সামান্যত তক্র লঘু, পথ্য ও ত্রিদোষনাশক। তক্রের বিশেষ গুণ এই যে পূর্ব্ব অপেক্ষা পরবর্ত্তী তক্র ক্রমে অধিক বৃষ্য হইয়া থাকে। যাহার স্নেহাংশ উত্তোলিত হইয়াছে,সেইরূপ তক্র লঘু সুতরাং পথ্যতম। এইরূপ তক্র,সংযোগজ বিষ, উদর, অর্শ, গ্রহণী, পাণ্ডু, জ্বর, মল ও মূত্ররোধ, প্লীহা রোগ ও প্রমেহ ব্যাধিতে ব্যবস্থেয়। অধিকন্তু ইহা প্রীতিজনক, বলবর্দ্ধক কিন্তু রক্তপিত্ত প্রকোপ কারক। প্রথম হইতে দ্বিতীয় প্রকার তক্রে স্নেহের ভাগ অর্দ্ধ পরিমাণে থাকে সুতরাং তাহা বৃষ্য ও গুরু, অতএব শ্লেষ্মাবর্দ্ধক। এই তক্র মধুর রসবিশিষ্ট অতএব ইহাতে রোগীর অবসাদ বিদূরীত হয় ;—কিন্তু ইহাও রক্তপিত্তপ্রকোপক।

যে তক্র হইতে স্নেহ সমুদ্ধৃত করা হয় নাই, তাহা ঘন ও গুরুপাক হইয়া থাকে, সুতরাং ইহা অত্যন্ত কফবর্দ্ধক। এই তক্র সেবনে দুর্ব্বল ব্যক্তির দেহে বল সঞ্চার হইয়া থাকে ; কিন্তু গুরুপাক বলিয়া ইহার সেবনে ব্যতিক্রম বশতঃ শরীরে আম সঞ্চিত হয়, শোথ রোগ জন্মে এবং অতীসার রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে হয়।

হারীতে তক্রের আরও প্রকার ভেদ দৃষ্ট হয়, যথা —যাহাতে স্নেহ থাকে কিন্তু জল মিশ্রিত করা হয় না, তাহাকে "ঘোল" ; যাহাতে স্নেহ থাকে না এবং জল মিশ্রিতও করা হয় না, তাহা "মথিত", যাহাতে অর্দ্ধ পরিমাণে জল মিশ্রিত করা হয়, তাহা "উদশ্বিৎ" এবং যাহাতে চতুর্থাংশ পরিমাণে জল মিশ্রিত করা হয়, তাহাই "তক্র"।

ডল্লনাচার্য্য স্বকৃত সুশ্রুতের টীকায় তন্ত্রান্তর হইতে প্রমাণ সমুদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন ;——

"রূক্ষমর্দ্ধোদ্ধৃতস্নেহং যন্ন স্যাদুদ্ধৃতং ঘৃতম্।
তক্রং দোষাগ্নিবলকৃত্ত্রিবিধং তৎপ্রয়োজয়েৎ ॥"

যাহা হইতে স্নেহের অংশ সম্পূর্ণরূপে উদ্ধৃত করিয়া লওয়া হয়, তাহাই "রূক্ষ" তক্র ; এইরূপ তক্র কফের বিনাশক। যাহা হইতে স্নেহের অর্দ্ধভাগ উত্তোলিত করা হয়, তাহা "অর্দ্ধোদ্ধৃত স্নেহ" তক্র ; এইরূপ তক্র বাতনাশক কিন্তু কফবর্দ্ধক। যে তক্র হইতে একেবারেই স্নেহ সমুদ্ধার করা হয় না, তাহা পিত্তের নাশক হইয়া থাকে। এই তিন প্রকার তক্র অবস্থাবিশেষে বাতাদি দোষের ও অগ্নিবলের বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

ভোজকৃত সংহিতাগ্রন্থের অস্তিত্ব বর্ত্তমানে দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু ভোজন কুতূহল গ্রন্থে ভোজের প্রমাণ সমুদ্ধৃত দেখিতে পাইতেছি। উহা পাঠে অবগত হওয়া যায়,ভোজ তক্রের দশ প্রকার ভেদ করিয়া,তাহাদের পৃথক পৃথক গুণেরও সমুল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এইস্থলে কেবলমাত্র নাম কয়েকটির সমুল্লেখ করা গেল ;——

"করমথিতমথিতোদশ্বিত্তক্রং দণ্ডাহতগৌড়কানি।
কালসেয়ক খাড়বক মিলিতাহমিলিতানি দশভবন্তি ॥ ইতি।"

করমথিত, মথিত, উদশ্বিৎ, তক্র, দণ্ডাহত, গৌড়ক, কালসেয়ক, খাড়বক, মিলিত ও অতিমিলিত—তক্রের এই দশবিধ ভেদ।

গ্রন্থকারগণ এইরূপে তক্রের বিভিন্ন নাম ও তাহাদের গুণের সমুল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কোন্ প্রকারের তক্র কোন্ দোষ নাশ করিয়া থাকে ?

ভোজন কুতূহল গ্রন্থে দেখিতে পাই ;——

"স্বাদু বৃষ্যং রুচিকরং শ্লেষ্মলং পিত্তনাশনম্।
অম্লং তক্রং পবনজিৎ পিত্তশ্লেষ্ম প্রকোপনম্ ॥"

স্বাদু তক্র,বৃষ্য ও রুচিকারক,ইহাতে কফবৃদ্ধি ও পিত্তের নাশ হইয়া থাকে। অম্ল তক্র বায়ুনাশক কিন্তু পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রকোপকারক।

সাধারণ গুণ।

চরক বলেন;——"শোথার্শোগ্রহণীদোষ মূত্রগ্রহোদরারুচৌ।
স্নেহব্যাপাদি পাণ্ডুত্বে তক্রং দদ্যাদ্ গরেষু চ ॥"

শোথ, অর্শ, গ্রহণী, মূত্রকৃচ্ছ্র, উদর, অরুচি, পাণ্ডু, কৃত্রিম বিষসংযোগ ও স্নেহের (ঘৃতাদির) অতিযোগ প্রভৃতি ঘটিলে তক্র ব্যবহার করিতে হইবে।

স্নেহব্যাপদের দৃষ্টান্তে চরক দেখাইতেছেন ;——

"তক্রসিদ্ধা যবাগূঃ স্যাদ্ ঘৃতব্যাপত্তিনাশনী।
তৈলব্যাপদি শস্তা স্যাত্তক্রপিণ্যাকসাধিতা॥"

ঘৃতপানের অতিযোগ ঘটিলে তক্রের সহিত এবং তৈল পানের অতিযোগ হইলে তক্র ও তিল কল্কের সহিত যবাগূ প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিলে, পীড়ার শান্তি হইবে।　　সুশ্রুত বলেন ;——

"শীতকালেঽগ্নিমান্দ্যে চ কফোত্থেষামযেষু চ।
মার্গাবরোধে দুষ্টে চ বায়ৌ তক্রং প্রশস্যতে॥"

শীতকালে অগ্নিমান্দ্য রোগে, শ্লেষ্মজ ব্যাধিতে, মল ও মূত্রাদির কাঠিন্যে এবং বায়ুর প্রকোপ ঘটিলে, তক্র ব্যবহার্য্য।

সুষেণ, আয়ুর্বেদমহোদধিতে বলিতেছেন ;-

"তক্রং স্বাদু কষায়মম্লকরসং রুচ্যং লঘূষ্ণং হিতং
গুল্মার্শঃপরিণাম শূল শমনং ছর্দ্দিপ্রসেকাপহম্।
তৃষ্ণারোচকশোফমেহ গরজিচ্ছ্বাসানিলঘ্নং পরং
সেব্যং মূত্রদোষাপহং জ্বরহরং স্নেহোত্থপীড়াপহম্॥"

তক্র মধুর, অম্ল ও কষায় রসবিশিষ্ট, রুচিকারক, লঘুপাক, উষ্ণবীর্য্য ও হিতজনক। গুল্ম, অর্শ, পরিণাম শূল, বমি, শ্লেষ্মানিষ্ঠিবন, তৃষ্ণা, অরুচি, শোথ, মেহ, সংযোগজ বিষদোষ, মূত্রদোষ, জ্বর, বাত, কফ এবং ঘৃত বা তৈলের অতিরিক্ত পানজাত পীড়ায় তক্রের প্রয়োগ হিতকর।　　অপি চ ;

"আমাতিসারে চ বিসূচিকায়াং বাতজ্বরে পাণ্ডুককামলায়াম্।
প্রমেহ গুল্মোদর বাতশূলে নিত্যং পিবেত্তক্রমরোচকে চ॥"

আমদোষে, বিসূচিকা রোগে, বাতজ্বরে, পাণ্ডু ও কামলারোগে, প্রমেহ, গুল্ম, উদর, বাতশূল ও অরুচি রোগে তক্র পান হিতকর।

এই জন্যই কথিত হইয়াছে ;——

**"ন তক্রসেবী ব্যথতে কদাচিন্ন তক্রদগ্ধাঃ প্রভবন্তি রোগাঃ।
যথা সুরাণামমৃতং সুখায় তথা নরাণাং ভুবি তক্রমাহুঃ॥"**

তক্র ব্যবহারকারী কখনও পীড়াগ্রস্ত হয় না, তক্রের প্রভাবে সকল রোগের বীজ বিহত হইয়া যায়। তক্র মনুষ্যগণের পক্ষে প্রকৃতই অমৃতের তুল্য।

তক্রের দোষ।

তক্র অমৃত তুল্য বটে, কিন্তু সর্ব্বত্রই কি তক্রের ব্যবহার অপ্রতিহত? কোথায়ও কি তক্র অব্যবহার্য্য নহে?

"তক্রং দদ্যান্ন ক্ষতে নোষ্ণকালে নো দৌর্ব্বল্যে নো তৃষামূর্চ্ছিতে চ।
নৈব ভ্রান্তে নৈব পিত্তাস্রদোষে নৈতদ্ দদ্যাৎ সূতিকায়াং বিশেষাৎ॥"

ক্ষতরোগে, গ্রীষ্ম ও শরৎকালে, দুর্ব্বলতায়, তৃষ্ণায়, মূর্চ্ছাতে, ভ্রমে, রক্তপিত্তে এবং বিশেষতঃ সূতিকারোগে কখনও তক্র ব্যবহার করিতে নাই।

তক্রের গুণ ও দোষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বোধগম্য হয়, মলাশয় বা পক্বাশয়গত রোগ নিবারণার্থই ইহা ব্যবহার্য্য; কিন্তু শরীরের উর্দ্ধভাগে পীড়া সঞ্জাত হইলে আম তক্র প্রয়োগ ইষ্টজনক নহে।

তাই ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুতে দেখিতে পাই;——

"লেখনং দীপনীয়ং চ রক্তপিত্ত প্রকোপনম্।
তক্রমামং কফং কোষ্ঠে হন্তি কণ্ঠে করোতি চ॥
পীনসশ্বাসকাসাদৌ সিদ্ধমেব প্রশস্যতে॥"

তক্র লেখন গুণ বিশিষ্ট অর্থাৎ শরীরে লীনতা প্রাপ্ত দোষের অপহারক ও অগ্নিদীপক কিন্তু ইহা রক্তপিত্তের প্রকোপ জন্মাইয়া থাকে। অপক্ব তক্র কোষ্ঠগত কফের শান্তি করে বটে, কিন্তু উহা সেবনে শরীরের উর্দ্ধদেশে শ্লেষ্মার সঞ্চয় হইয়া থাকে। এইজন্য নাসারোগ, শ্বাস ও কাস প্রভৃতি রোগে অপক্ব তক্র ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। ইন্দ্রকোষ বলেন;——

"তক্রং স্নেহান্বিতং তন্দ্রানিদ্রাজাড্যপ্রদং গুরু।
তক্রমামং কফং কোষ্ঠে হন্তি কণ্ঠে করোতি চ॥
আমংগ্রাহিতরং তক্রং তচ্ছ্রীকরমন্যথা।
পীনস শ্বাসকাসাদৌ পক্বমেব প্রশস্যতে॥"

যে তক্রে স্নেহ আছে,—অর্থাৎ যাহা হইতে নবনীত উদ্ধৃত করিয়া লওয়া হয় নাই, তাহা গুরুপাক, সুতরাং উহা সেবনে শ্লেষ্মার বৃদ্ধি হয় এবং তজ্জন্য শরীরে তন্দ্রা, নিদ্রা ও জড়তা উপস্থিত হইয়া থাকে। অপক্ব তক্র কোষ্ঠস্থ

শ্লেষ্মার নাশ করে কিন্তু কণ্ঠদেশে কফের সঞ্চয় করে। অপক্ক তক্র অতিশয় ধারক কিন্তু পক্ক তক্র তাহার বিপরীত অর্থাৎ সারক। এইজন্যই নাসা রোগে, শ্বাস ও কাস প্রভৃতি ব্যাধিতে পক্ক তক্র ব্যবহার্য্য।

মদনবিনোদ নিঘণ্টুতেও উক্ত হইয়াছে ;——

"সমুদ্ধৃতঘৃতং তক্রং পথ্যং লঘু বিশেষতঃ।
স্তোকোদ্ধৃতঘৃতং তস্মাদ্ বৃষ্যং গুরু কফাবহম্।
অনুদ্ধৃতঘৃতং শীতং গুরু পুষ্টি কফাবহম্॥"

যে তক্রের স্নেহভাগ উত্তোলিত হইয়াছে, তাহাই বিশেষ হিতকর ; কারণ স্নেহের অভাব বশতঃ উহা অতিশয় লঘুপাক হইয়া থাকে।

যাহার ঘৃতের ভাগ সম্যক্ উদ্ধৃত করা হয় নাই, তাহা বৃষ্য এবং গুরু ; সুতরাং শ্লেষ্মাবর্দ্ধক। যে তক্রের স্নেহ একেবারেই উদ্ধার করা হয় নাই, তাহা শীতবীর্য্য, গুরুপাক, পুষ্টিদায়ক এবং কফবর্দ্ধক হইয়া থাকে।

উপরে যাহা বিবৃত হইল, তাহা হইতে বোধগম্য হইবে, সকল অবস্থাতেই তক্রের একপ্রকার ব্যবহার ঠিক নহে। যদিও তক্র ত্রিদোষ (বাত, পিত্ত, কফ) নাশক, তথাপি অবস্থাবিশেষে দোষের প্রকোপ ও সঞ্চয় কারকও হইয়া থাকে।

দ্রব্যগুণের এই গূঢ় রহস্য বোধগম্য করিয়াই আয়ুর্ব্বেদ বলিয়াছেন ; —

"প্রাণাঃ প্রাণভৃতামন্নং তদযুক্ত্যা নিহন্ত্যসূন্।
বিষং প্রাণহরং তচ্চ যুক্তিযুক্তং রসায়নম্॥"

অন্ন প্রাণীমাত্রেরই প্রাণস্বরূপ বটে, কিন্তু সেই অন্নও অযথা নিয়মে ভুক্ত হইলে, প্রাণের হানি করিয়া থাকে। সেইরূপ বিষ প্রাণহারক বটে ; কিন্তু অবস্থাবিশেষে সেই প্রাণহন্তা বিষই প্রাণ রক্ষা করিয়া থাকে।

সুতরাং তক্রপ্রয়োগেও বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন পূর্ব্বক, তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

পুনর্ম্মথিত তক্র।

সুষেণ বলেন ;—"চিরমথিতং মথিতংপুনরুৎপত্তিকরং ন কস্য দোষস্য ?"

তক্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু ঐরূপ তক্র পুনর্ব্বার মন্থন পূর্ব্বক ব্যবহার করা হিতকর নহে ;—কারণ ঐরূপ পুনর্ম্মথিত তক্র হইতে সকল দোষেরই প্রকোপ হইয়া থাকে।

তক্র ও দধি।

সুষেণ বলেন ;—"দধিদোষগুণাস্তক্রেঽপি।"

দধির দোষ ও গুণ যেরূপ বর্ত্তমান থাকে, তক্রেও ঠিক সেইরূপ দোষ ও গুণ হইয়া থাকে। সুতরাং দধি সেবনের বিধিও নিষেধ তক্রেও অবশ্য পালনীয়। যথা ;—"জ্বরাসৃক্পিত্তবিসর্পকুষ্ঠপাণ্ড্বাময়ভ্রমান্।
প্রাপ্নুয়াৎ কামলাং চোগ্রাং বিধিংহিত্বা দধিপ্রিয়ঃ॥"

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া যখন তখন দধি ভক্ষণ করিলে, তাহার ফলে জ্বর, রক্তপিত্ত, বীসর্প, কুষ্ঠ, ভ্রম, পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে।

কখন দধি সেব্য নহে?

"শস্যতে ন দধি রাত্রৌ শস্তং চাম্বু ঘৃতান্বিতম্।
রক্তপিত্তকফোত্থেষু বিকারেষু তথাপি ন॥"

রাত্রিকালে কখনও দধির ব্যবহার হিতকর নহে। যদি নিতান্তই রাত্রিতে দধি খাইতে হয়, তবে তাহার সহিত জল ও ঘৃত যোগ করিয়া সেবন করিতে হইবে। কিন্তু রক্ত, পিত্ত ও কফের বিকার থাকিলে, কিছুতেই দধি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং ঘোলের ব্যবহার সময়েও এই নিয়মগুলি স্মরণ রাখা নিতান্তই আবশ্যক।

শ্রীমথুরানাথ মজুমদার কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি।
১৭নং লক্ষ্মীদত্তের লেন, কলিকাতা।

(প্রাপ্ত)

শ্রীমান মহোদয়! কৃপাপূর্ব্বক আপনার অমূল্য পত্রিকামধ্যে ইহা স্থান দিবেন ;

স্বর্ণপদক।

শিলাজতুর শোধন, ভিন্ন ভিন্ন রোগে তাহার ব্যবহার, অনুপান বিধি এবং শিলাজতু সম্বন্ধে যে কোন তথ্যের বিশদ বর্ণনা পূর্ব্বক নিবন্ধের সর্ব্বোত্তম লেখককে, শুদ্ধ শিলাজতু বিক্রেতা নন্দ প্রয়াগ-গড়বালের পণ্ডিত মহেশানন্দজী শর্ম্মা একটি স্বর্ণপদক প্রদান করিবেন। স্বর্ণপদকের যোগ্য কোন প্রবন্ধ বিবেচিত না হইলে দুই বা তিনটি প্রবন্ধের লেখককে রৌপ্যপদক প্রদান করা হইবে। লেখা কাগজের একপৃষ্ঠে স্পষ্টাক্ষরে বিশুদ্ধ সংস্কৃত, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাটী অথবা বাঙ্গালা ভাষায় লিখিয়া নিম্ন ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

জগন্নাথ প্রসাদ শুক্ল বৈদ্য।
সুধানিধি কার্য্যালয়, দারাগঞ্জ, প্রয়াগ।

মাঘ মেলা ও ধর্ম্মার্থ ঔষধালয়।

প্রয়াগের প্রসিদ্ধ মাঘ মেলাতে প্রতিবর্ষের ন্যায় এবৎসরও আয়ুর্বেদ মহামণ্ডল হইতে ২৯শে পৌষ (১৪ই জানুয়ারী) ধর্ম্মার্থ দাতব্য ঔষধালয় খোলা হইয়াছিল এবং ৮ই ফাল্গুন (২০শে ফেব্রুয়ারী) পর্য্যন্ত খোলা ছিল। এই সময় মধ্যে ১২৩৩ জন পুরুষ, ২২২ জন স্ত্রীলোক, ৩১টি বালক মোট ১৪৮৬ জন রোগীকে ঔষধ দেওয়া হইয়াছে। উক্ত কাল মধ্যে যে রোগে যতটি করিয়া রোগী আসিয়াছিল, তাহার তালিকা এইরূপ :—ধাতুদৌর্ব্বল্য, প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও উপদংশে ১৬১, রজোদোষ ও প্রদর ১৩৫, কাসরোগী ১৬০, বাতব্যাধি ১১৭ জ্বর ৮৫, ক্ষতরোগ, বিচর্চ্চিকা, দুষ্ট রস প্রভৃতি রক্তবিকার ২৯০, শিরোরোগ ১৫৮, কর্ণরোগ ৭৬, উদর ২০৬, নেত্ররোগ ১১০, দন্তরোগ ৫৩ এবং অর্শো রোগে ৩৯ জন।

মেলা কর্ত্তৃপক্ষ ঔষধালয়ের জন্য স্থান দানে যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে তিনি অবশ্যই ধন্যবাদের পাত্র। বৈদ্যরাজ বদ্রী নারায়ণজী শুক্ল সর্ব্বদা ঔষধালয়ে উপস্থিত থাকিয়া রোগীদিগকে ব্যবস্থা ও ঔষধ প্রদান করিয়াছেন, এবং বরা নিবাসী পণ্ডিত ধরণীধরজী বৈদ্যরাজ নিজ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়াও যে পর্য্যন্ত অধিক রোগীর ভিড় থাকে সে পর্য্যন্ত পরম উৎসাহের সহিত উপস্থিত থাকিয়া রোগী-পর্য্যবেক্ষণ এমন কি নিজ প্রস্তুত ঔষধ পর্য্যন্ত প্রদান করিয়াছেন ; এতদ্ব্যতীত যে সকল মহোদয় সাহায্য করিয়াছেন তাহাদের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

দাতা।	ঔষধ মূল্য।
চিকিৎসক চূড়ামণি পং ঠাকুরদাসজী শর্ম্ম বৈদ্য—দারাগঞ্জ।	১১০
বৈদ্যভূষণ পং ঠাকুর দত্ত শর্ম্মা—লাহোর।	৫
বাবু জয়কুমার জৈন বৈদ্য—প্রয়াগ।	৭
পং পুন্নুলাল চতুর্ব্বেদী—দারাগঞ্জ।	৫
মালিক শুদ্ধৌষধালয়—বড়নগর, মালবা।	৭
পং ধরণীধর শর্ম্মা বৈদ্য—বরা।	৫
” পং জগন্নাথজী বি, এ বৈদ্য—প্রয়াগ।	৫৬০
” পং জগন্নাথ প্রসাদ শুক্ল আয়ুর্ব্বেদপঞ্চানন—দারাগঞ্জ, প্রয়াগ	৬০
	৯৬

কামতা প্রসাদ ত্রিপাঠী।

প্রাপ্তিস্বীকার ও গ্রন্থ-পরিচয়।

১। গদনিগ্রহঃ।—আমরা বোম্বাইর সুপ্রসিদ্ধ লুপ্তপ্রায় গ্রন্থের প্রচারক বৈদ্য যাদবজী ত্রিকমজী আচার্য্য মহোদয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত "আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থমালা"র কোন ২ পুস্তকের পরিচয় ইতঃপূর্ব্বে পাঠকবর্গকে প্রদান করিয়াছি, অদ্য আর একখানী উপাদেয় পুস্তকের পরিচয় দিতেছি ঃ—পুস্তকের নাম গদনিগ্রহ, এই পুস্তক ইতঃপূর্ব্বে কখনও মুদ্রিত হয় নাই। গ্রন্থপ্রণেতা গুর্জ্জর দেশনিবাসী রায়কালবংশজ বৎসগোত্রোদ্ভব বৈদ্য নন্দন পুত্র সোঢ়লাগ্য ভিষক্। ইহা চক্রদত্ত বঙ্গসেন প্রভৃতির ন্যায় একখানি সংগ্রহ গ্রন্থ হইলেও ইহাতে সেই সমুদয় গ্রন্থাপেক্ষা বহু যোগ (ঔষধ) অধিক দেখা যায়। কোন ২ বিষয়ে এই গ্রন্থের উপযোগীতা অধিক বলিয়া মনে হয়। ইহাতে নিদান পূর্ব্বক সমুদয় রোগের চিকিৎসার বিস্তৃত বিবরণ প্রকটিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে প্রয়োগ, কায় চিকিৎসা, শালাক্য, শল্য, ভূতবিদ্যা, বালতন্ত্র, বিষতন্ত্র, রসায়ন, বাজীকরণ ও পঞ্চকর্ম্ম এই দশটি খণ্ড আছে। প্রয়োগ খণ্ডে ঘৃত, তৈল, চূর্ণ, গুটিকা, লেহ, আসব প্রভৃতি ছয়টী প্রকরণ। এই ছয় প্রকরণে ৫৮৫টি প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ,প্রসিদ্ধ ও নিত্য উপযোগী ঔষধসকল বর্ণিত হইয়াছে। লেহাধিকারে চরকোক্ত চ্যবনপ্রাশ ব্যতীতও অপর একটি লঘু চ্যবনপ্রাশের উল্লেখ আছে, নিম্নে তাহা উল্লেখ করা গেল। এইরূপ অনেক নূতন ২ যোগ সন্নিবিষ্ট দেখা যায়। শল্য ও শলাকা তন্ত্রের উল্লেখ থাকিলেও অস্ত্রাদির বর্ণনা নাই। ঔষধি চিকিৎসারই বাহুল্য,তবে নিতান্ত প্রয়োজন স্থলে শস্ত্র প্রয়োগের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে মাত্র। যেমন মূঢ়গর্ভে গর্ভ শল্য আহরণ। ইহাতে দ্রব্যগুণ কিংবা পরিভাষা নাই। চিকিৎসাক্ষেত্রে এই পুস্তকখানী চিকিৎসকের পক্ষে বড়ই উপযোগী আমরা বঙ্গদেশীয় চিকিৎসকদিগকে এই অভিনব পুস্তকখানি সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করি। সংস্কৃত মূলমাত্র, কোন টীকাটিপ্পনী বা অনুবাদ নাই। ছাপা ও কাগজ ও বাঁধা অত্যুত্তম। প্রয়োগ খণ্ড স্বতন্ত্র বাঁধাই, ডিমাই অষ্টাংশিত ২৪৪ পৃষ্ঠা, পরিশিষ্টে সম্পাদক কর্ত্তৃত ঘৃত তৈলাদির পরিভাষা যোজিত হইয়াছে। এই খণ্ডের মূল্য ১৷৹ টাকা। কায় চিকিৎসা হইতে নয়

খণ্ড একত্র সুন্দর বাঁধাই, ৭৬৭ পৃষ্ঠা, মূল্য ৪॥০ টাকা, কিন্তু সুবিধা এই প্রতি টাকায় চারি আনা কমিশন দেওয়া হয়। পুস্তক প্রাপ্তির ঠিকানা—বৈদ্য যাদবজী ত্রিকমজী আচার্য্য, ৩৭২ বড়বাজার ষ্ট্রীট, ফোর্ট, বোম্বাই।

আমরা গদনিগ্রহের প্রয়োগ খণ্ড অনেকদিন পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সম্প্রতি অবশিষ্ট নয় খণ্ড পাইয়া আনন্দ ও শ্রদ্ধার সহিত প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। সম্পাদক মহোদয় অত্যন্ত শ্রম ও অর্থব্যয়ে যে সকল অমূল্য গ্রন্থরাজি প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে তিনি দেশবাসী মাত্রেরই বিশেষতঃ চিকিৎসকবর্গের অশেষ ধন্যবাদের পাত্র। এই সকল গ্রন্থরাজী নিজগুণেই জগতে আদৃত ও গৃহীত হইবে সন্দেহ নাই। সময়ান্তরে অন্যান্য পুস্তকের পরিচয় দিতে প্রয়াস পাইব।

লঘু চ্যবনপ্রাশাবলেহঃ।

বিল্বাদি পঞ্চমূলাব্দ বলা পর্ণী চতুষ্টয়ম্।
ঋদ্ধি কৃষ্ণা শঠী পথ্যা জীবকর্ষভকামৃতাঃ॥
দ্রাক্ষা পুনর্ণবা মেদে জীবন্তী কাকনাসিকা।
উৎপলৈলাজশৃঙ্গ্যশ্চ কাকোলী বৃষচন্দনম্॥
বিদারী গোক্ষুর ব্যাঘ্রী পৌষ্করং চ পলোন্মিতম্।
শতানি পঞ্চ ধাত্র্যশ্চ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
পলদ্বাদশকে ভৃষ্ট্বা ধাত্রী স্তা স্তৈল সর্পিষোঃ।
সিতার্দ্ধতুলয়া যুক্তাঃ কাথং লৌহে পুনঃ পাচেৎ॥
দ্বে পিপ্পল্যা পলে বাংশ্যাশ্চত্বারঃ ষট্ চ মাক্ষিকাৎ।
চাতুর্জ্জাতপলংতস্মিন্ সিদ্ধ শীতে নিযোজয়েৎ॥
হৃদ্রোগ শ্বাসহৃৎকাস বাতরক্ত ক্ষয়ার্ত্তিজিৎ।
সেব্যোঽয়ং চ্যবনপ্রাশঃ স্বর্য্যো বৃষ্যো রসায়নঃ॥

২। সন্ধিবোধম্।

বাঁকুড়ান্তঃর্ব্বর্ত্তী বিষ্ণুপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দাশগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান,—"বাণী বিনোদিনী চতুষ্পাঠী" গ্রন্থকারের নিকট। মূল্য ।০ আনা। পুস্তকে ডিমাই দ্বাদশাংশিত ৯০ পৃষ্ঠা। সহজে সন্ধিজ্ঞানের এই অপূর্ব্ব পুস্তকখানা পাইয়া আমরা পরম পুলকিত হইয়াছি। গ্রন্থকার

বালক হইয়াও প্রথম শিক্ষার্থী বালকদের উপযোগী করিয়া পুস্তক রচনায় সমর্থ হইয়াছেন। প্রথম বাঙ্গালা পদ্যছন্দে সন্ধির সূত্রগুলি উল্লেখ করিয়া সরল সংস্কৃত শ্লোকে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। প্রথম শিক্ষার্থী বালকেরা অল্পায়াসেই ইহা দ্বারা ব্যাকরণের সন্ধিগুলি আয়ত্ত করিতে পারিবে। সন্ধিবোধ ব্যতীতও ইহার পরিশিষ্টে বিদ্যার্থীর অবশ্য জ্ঞাতব্য—ব্যাকরণ প্রশংসা, পাঠক গুণদোষ, অনধ্যায় কাল, পাণিনি-কাত্যায়ণ চরিত প্রভৃতি সংগ্রহ শ্লোক লিপিবদ্ধ হইয়াছে। স্তোত্রাবলীতে গ্রন্থকার কৃত ১২টি সুললিত স্তোত্র এবং ভোলানাথ সুভাষিতে স্বকৃত নানা ছন্দোময় শিক্ষাপ্রদ ১০০ শত শ্লোক উপনিবদ্ধ হইয়াছে, ইহাতে দ্ব্যর্থ, নানার্থ, কূট-সমস্যা কর্ত্তৃকর্ম্মাদি গুপ্তি, চিত্র, পদ্মবন্ধ (সচিত্র) প্রভৃতি নিপুণতর শ্লোকও আছে। শ্লোকসমূহ যেমনই মধুর তেমন প্রাঞ্জল। পড়িয়া মনে হয় ইহা বালককৃত নহে, পরন্তু প্রবীণ জনগ্রথিত। ভোলানাথ বালক হইলেও জ্ঞানে প্রবীণগন্ধী, সময়ে ইনি সুকবির আসন অলঙ্কৃত করিবেন, আশা করিতে পারি যদি অহমিকা বুদ্ধি ইহার উৎসাহে বাধা না দেয়। বালক বলিয়াই আমরা একথাটুকু বলিয়া রাখিলাম। স্থানাভাব বশতঃ কোন শ্লোক উদ্ধৃত করিবার সুযোগ হইল না। পুস্তকখানি সকলেরই আদরণীয় হইবে বলা যায়। মুদ্রণ ও পত্রসকল পরিপাটী। গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থকারের হাফটোন প্রতিকৃতিও আছে। আমরা ভগবানের নিকট নবীন কবির অনাময় দীর্ঘায়ু ও প্রতিষ্ঠা কামনা করি।

৩। হিন্দু সমাজের বিরাট মূর্ত্তিসন্দর্শন।—শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় লিখিত। 'ফুলস্কেপ' অষ্টাংশিত ২৬ পৃষ্ঠাত্মক পুস্তিকা, মূল্য ৵০ আনা, কাশী মহামণ্ডল প্রেসে প্রাপ্তব্য। এই পুস্তকে হিন্দুসমাজের অবস্থা অতি সুন্দররূপে দেখান হইয়াছে হিন্দুমাত্রেই এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে সমাজের নিগূঢ় রহস্য জ্ঞাত হইতে পারিবেন। রাজা শশিশেখরেশ্বর এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানীতেও গভীর জ্ঞান ও চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন।
